এক্ষণ

শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৫

নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

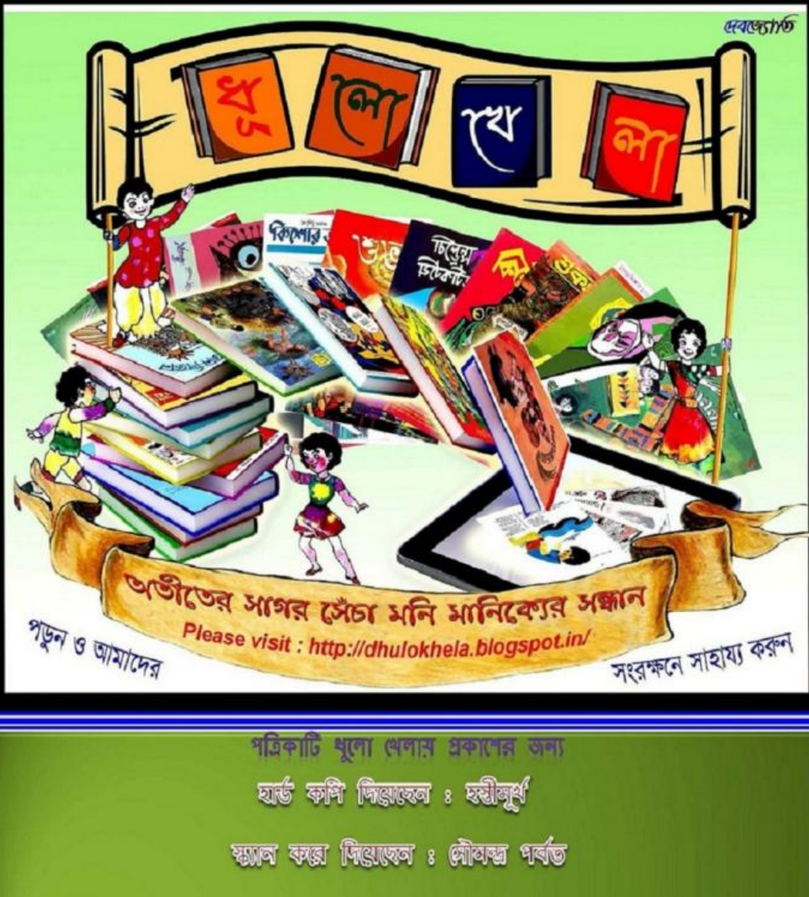

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : হস্তীমূর্খ

স্ক্যান করে দিয়েছেন : সৌমন্দ্র পর্বত

এডিট করেছেন : সৌমন্দ্র পর্বত ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরিক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

॥ সুবর্ণরেখা-র নতুন বই ॥

রেণুকা দেবী চৌধুরানী

রকমারি নিরামিষ রান্না

সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত রান্নার বইগুলির সঙ্গে এই বইখানির প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, এটি লেখিকার দশ-এগারো বছর বয়সে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের এক বিখ্যাত জমিদার পরিবারে বধূ হিসাবে আগমন থেকে তাঁর ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিগত রন্ধন-চর্চার অভিজ্ঞতার লিপিবদ্ধ দলিল। এই বই বাঙালীর লুপ্ত-প্রায় ও প্রচলিত উভয় ধারারই বহু নিরামিষ রান্নার পরিচয় তুলে ধরেছে নবীন কালের রাঁধুনি ও খাদ্যরসিকের জন্য। ৫০ টাকা

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ

বিনোদিনী দাসী

আমার কথা ও অন্যান্য রচনা

সম্পাদনা : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য

সহযোগী সম্পাদক : শঙ্কর ভট্টাচার্য

বহু চিত্র শোভিত। সত্যজিৎ রায়-কৃত প্রচ্ছদ। ৪০.০০

সুবর্ণরেখা ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯

এক্ষণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

অষ্টাদশ বর্ষ ॥ ৩-৪ সংখ্যা : শারদীয় ১৩৯১ ॥ সূচিপত্র

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও মোপাসাঁ ॥ ফ্রাঁস ভট্টাচার্য ১
কলকাতার পথ-নাম ॥ দেবাশিস বসু ২২
জাক দেরিদা বা দর্শনের আত্মহত্যা ॥ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪
বাংলা পরিভাষা ॥ অশোক মুখোপাধ্যায় ১০৫
সায়েন্স ফিকশন ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ ১১৯

বিভাগ

পরিপূরণ ॥ অশোক উপাধ্যায় ১৭৭

পুনর্মুদ্রণ

উপেন্দ্রকিশোর ॥ সুকুমার রায় ১৮৪
গুপী গাইন ॥ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯৩

ক্রোড়পত্র

গুপী গাইন বাঘা বাইন : সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য ॥ সত্যজিৎ রায় ১
পরিচালকের কথা ॥ সত্যজিৎ রায় ৬৯
প্রসঙ্গ : গুপী গাইন বাঘা বাইন ॥ দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ৭০
সাক্ষাৎকার ১ [পুনর্মুদ্রণ] ॥ করুণাশঙ্কর রায় ৮০
সাক্ষাৎকার ২ [পুনর্মুদ্রণ] ॥ গুরুদাস ভট্টাচার্য ৯১

স্কেচ

উপেন্দ্রকিশোর ॥ সত্যজিৎ রায় ১৮৩

প্রচ্ছদপট : সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক : নির্মাল্য আচার্য

কার্যালয় ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড ॥ কলকাতা ৯

এক্ষণ পত্রিকার কথা

শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৫ প্রকাশিত হল। এই সংখ্যাটিই একমাত্র নিয়মিত বেরোচ্ছে, আর সবই অনিয়ম। অর্থাৎ, পুরো একবছর পরে বর্তমান সংখ্যাটির প্রকাশ। আগামী ইংরেজি বছরের গোড়ায় একটি সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা আছে।

এ-বছর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্মের ১২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষেই নয়, চিত্রনাট্য প্রকাশের স্থায়ী পরিকল্পনার অন্তর্গত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটির চিত্রনাট্যের প্রকাশ। সেই সঙ্গে (সম্ভব-ক্ষেত্রে) মূল কাহিনী ছাপার কারণ শিল্প বিচারে সচেতন পাঠককে সহায়তা দেওয়া। প্রাসঙ্গিক পুরনো লেখাগুলিকে খুঁজে আনার উদ্দেশ্যও আজকের বিচারকে খতিয়ে দেখার সুযোগ নেওয়া। এই পত্রিকার নিয়মিত (ও সহিষ্ণু) পাঠকদের এ সবই জানা।

এ-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রত্যেকটি প্রবন্ধই নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীন, নজর করলে এক্ষণ-এর পাঠক তা সহজেই বুঝবেন। কেবল নতুন বিভাগ হিসাবে 'পরিপূরণ' অংশটি সম্পূর্ণ উপস্থাপিত হচ্ছে— এটি লেখক ও প্রকাশক ছাড়াও অগ্রসর পাঠকদের কাজে লাগবে, এমন একটা কথা ধরে নেওয়া হয়েছে।

শেষ দিকে অপ্রত্যাশিত বিদ্যুৎ সংকটের জন্য কয়েকটি নির্ধারিত রচনার (গ্রন্থসমীক্ষা ও পরিভাষা-পরিচয়সহ) প্রকাশ স্থগিত রাখতে হল। যদিও এ-সংখ্যায় কবিতা ও গল্প প্রকাশের কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

বর্তমান সংখ্যাটির প্রকাশে যাঁদের বিশেষ সহায়তা পেয়েছি : দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ ঘোষ, অশোক উপাধ্যায়, দেবব্রত ঘোষ, প্রবীর সেন, বিমান সিংহ এবং আরো অনেক সুহৃদ।

মুদ্রণে সহায়তা

জে. ডি. প্রেস / সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস ও ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাঃ লিঃ।

বাঁধাই

গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স / ৩৮এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৯

ফ্রাঁস ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ও মোপাসাঁ

ছোটগল্পের দুই জগৎ

সন্দেহ নেই, ছোটগল্পে মোপাসাঁ এক বিরাট নাম, জগতের মহত্তমদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের মূল খ্যাতি যদিও কবিত্বে, এই শ্রেণীর রচনায় এক দিকপাল হিসেবে তিনিও কম গণ্য নন। প্রথম লেখক দ্বিতীয়ের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেন না-করেন, সে-আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও বাঙালি কবির সঙ্গে যে মোপাসাঁর অন্তত কিছু গল্পের পরিচয় ছিল, সে-সত্য জ্ঞাত।[১] কী পদ্ধতি উভয়ে ব্যবহার করেন, কখনো-কখনো কী বিষয়বস্তু তাঁদের উপজীব্য হয়, তারই কিছু বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

মোপাসাঁর জন্ম ১৮৫০-এ, রবীন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র এগারো বছর আগে। তিনি মারা যান তাড়াতাড়ি, ১৮৯৩-এ—তাই তিনি পুরোপুরি উনবিংশ শতাব্দীরই। রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন ১৯৪১ পর্যন্ত, তাঁকে সে-কারণে বিংশ শতাব্দীর লেখক বলে ধরা চলে।

কয়েকখানি উপন্যাস ও প্রায় তিনশো ছোটগল্পের প্রণেতা মোপাসাঁ। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের রচিত গল্পের সংখ্যা একশো'র কাছাকাছি, কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তি অনেক বিপুলতর। তিনশো'র মধ্যে যেগুলিকে তাঁর মুখ্য গল্প হিসেবে ধরা হয়, মোপাসাঁ সেগুলি রচনা করেন অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের ব্যবধানে, ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ যখন গল্প লেখা শুরু করেন, অর্থাৎ ১৮৯১ নাগাদ, ততদিনে ফরাসি লেখক প্রায় থেমে এসেছেন, এবং তারপর তো রবীন্দ্রনাথের গল্প লেখা চলতে থাকে ১৯৪০ পর্যন্ত। অতএব বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক, উভয় দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয়তা বিকাশের যথেষ্ট অবকাশ পান। তবু লক্ষণীয় যা, তা হল, গল্পকার হিসেবে তাঁর সবচেয়ে সৃজনশীল সময় বিধৃত সাতটি বছরে, বাংলা সনের ১২৯৮ থেকে ১৩০৫ পর্যন্ত।

উভয়েই গল্প লেখেন সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশের জন্য—মোপাসাঁ লেখেন সংবাদপত্রে, রবীন্দ্রনাথ লেখেন সাহিত্যপত্রে। অনেকে বলেন, যে-স্বল্পভাষণের এত খ্যাতি মোপাসাঁর, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল দৈনিক কাগজের ক্ষীণ পরিসরের সেই অপরিহার্যতাই। সে-রকম কোনো সীমা রবীন্দ্রনাথকে বাঁধে নি।

একবার প্রকাশ হলে মোপাসাঁ তাঁর গল্পগুলিকে একত্র সংকলিত করতে সচেষ্ট হতেন। কোনো বিশেষ ঐক্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ সূচিত করতে চেয়ে কোনো-কোনো সংকলনের তিনি নতুন নাম দিতেন, যেমন Tales of Day and Night (দিনরাত্রির গল্প), যাতে অতিপ্রাকৃত ও বাস্তবানুগ কাহিনীর সূক্ষ্ম মিশ্রণ রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে Tales of the Becasse (বুনো মুরগির কাহিনী)-র গল্পগুলির বক্তা হলেন শিকারীদের পার্টিতে সমবেত কয়েকজন অতিথি। তবু প্রায় ক্ষেত্রেই সংকলনের প্রথম গল্পটির নামেই সংকলনের নাম, এবং সেই প্রথম গল্পটি সবসময়ই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক, যাতে বেশি লোক বই কিনতে উদ্বুদ্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে, এক 'তিন সঙ্গী' নামক বহু পরে রচিত সংকলনটি বাদ দিলে, অন্যান্য গল্পের সংকলনগুলি চিহ্নিত সাধারণ নামে, যে-নামে বিশেষ কোনো অর্থ বা ঐক্যের ইংগিত নেই, যেমন 'বিচিত্র গল্প', 'গল্পগুচ্ছ' ইত্যাদি। পর-পর যেভাবে গল্পগুলি লেখা হয়েছে, তাদের সাজানোও হয়েছে সেইভাবে।

মোপাসাঁ যখন লেখা শুরু করেন, তখন তাঁর সামনে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন অসামান্য পূর্বসূরি ছিলেন : বালজাক, উ্যগো, ভিইনি, সাঁ, গোতিএ, মুস্সে, স্তাঁদাল এবং মেরিমে। ভিলিএ দ্য লিল্-আদাম, গবিনো বা বার্বে দোরে-ভিলি-র নাম না-হয় নাই করলাম। কিন্তু তাঁর শিক্ষানবীশীর জন্য তিনি দ্বারস্থ হলেন বাস্তববাদীদের, যাঁদের চূড়ামণি ছিলেন ফ্লোবের, প্রকৃতিবাদী জোলা ও দোদে। এঁদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শেও তিনি আসেন। ফ্লোবের তাঁর একমাত্র গল্প-সংকলনটি প্রকাশ করেন ১৮৭৭ সালে। তার তিন বছর বাদেই প্রকাশিত হয় 'বুল্ দ্য স্থইফ' (Ball-of-Fat), যাতে ফ্লোবেরের প্রভাব স্পষ্ট।

এদিকে রবীন্দ্রনাথকে যা করতে হয়, তা বাংলায় ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত। পথ তাঁকে নিজেই কেটে নিতে হয়, তাঁর সাহিত্যিক ঐতিহ্যে অনুকরণ করার মতো কোনো আদর্শ সামনে ছিল না। এসব সত্ত্বেও ছোটগল্পকে যে-উচ্চতায় তিনি নিয়ে গেছেন, তা আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয় নি।

জীবনের সত্য প্রতিফলন ঘটতেই হবে ছোটগল্পে, এমনটিই চেয়েছিলেন প্রকৃতি-বাদীরা। আখ্যানবস্তু হয় হোক সাধারণ, তবু তাতে থাকতে হবে কোনো জোরালো নাটকীয় উন্মেষের সম্ভাবনা, তার তথ্যমূলক উপাদানগুলিতে থাকা চাই একটি একাগ্র অভিনিবেশ, এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান, এবং সে-গল্পের থাকবে এমন এক উপসংহার যা শুধু ত্বরান্বিতই হবে না, পারলে চমকপ্রদও হবে।

অতি বিশদভাবে, মোপাসাঁর গল্পগুলি এই কাঠামোর অনুসরণ করে। এক সমালোচক[২] গল্পগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : এক, যে-গল্পগুলির আখ্যানবস্তু নির্ভর করে কোনো 'ক্ষুদ্র কাহিনী'র উপর ; দুই, যাদের আখ্যান-বস্তুতে এক 'তাৎক্ষণিকে'র ছাপ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 'তাৎক্ষণিক' মানে কোনো ব্যক্তির জীবনে এমন এক মুহূর্ত যখন অর্থপূর্ণ কিছু উদ্ঘাটিত হয় তার কাছে,

এবং সে-উদ্‌ঘাটন এমনই যে তার ফলাফল হয় সুদূরস্পর্শী। অন্যদিকে 'ক্ষুদ্র কাহিনী' হল একটি মাত্র বৃত্তান্ত যাকে বাছা হয়েছে তার নাটকীয় তীব্রতার দরুণ। উভয়ের সঙ্গেই উপন্যাসের পার্থক্যটি স্পষ্ট : উপন্যাসে বহু বৃত্তান্তের সমাবেশ।

বাংলা সনের ১২৯৮ থেকে ১৩০২-এর মধ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের কিছু-কিছু গল্পে এই একই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় – কাহিনীকার হিসেবে তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বলতম বিকাশও ঘটে এই সময়টিতে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পরিণতির মুহূর্ত তখনই আসে যখন রতন বুঝতে পারে যে সে পোস্টমাস্টারের কেউ-ই নয়, কোনোদিন ছিলও না তা – নিজের সুবিধার জন্য পোস্টমাস্টার তাকে যা বুঝিয়ে থাকুক না কেন। উপলব্ধির দ্বিতীয় মুহূর্তটি আসে, যখন এক ঝলকে প্রেমাকাঙ্ক্ষায় কাতর সমগ্র মানবসমাজের প্রতি সহানুভূতিতে লোকটি নিজেই চঞ্চল বোধ করে। ক্ষণস্থায়ী হলেও এই উপলব্ধির তীব্রতা কম নয়। তা তাকে কর্মে প্ররোচিত করে না বটে, তবু এ উপলব্ধির কথাটা যে লোকটি সহজে ভুলবে না, এমন ধারণা জন্মায় পাঠকের মনে।

'একরাত্রি' গল্পটি সম পর্যায়ের। এখানে 'ঘটে' না তেমন কিছুই, শুধু এক-দিন এক প্রচণ্ড ঝড়ের কল্যাণে নায়ক হঠাৎ বুঝতে পারে শৈশবের যে-সঙ্গিনী থেকে সে একদা স্বেচ্ছায় সরে আসে, তার প্রতি তার ভালোবাসার গভীরতা ও ব্যাপ্তি কতখানি। উপলব্ধির সেই মুহূর্ত ছোঁয় শাশ্বতীকে, অর্থ দেয় তার জীবনকে। একই ভাবে, 'বিচারক' গল্পের বিচারক আবিষ্কার করে দীপ্যমানা দেবীর স্বর্ণময়ী প্রতিমা সে পতিতা নারীর মধ্যে যাকে সে শাস্তি দিতে উদ্যত। অন্যদিকে, যে-অপত্যস্নেহ সর্বজনীন, যা মানে না শিক্ষার বা অর্থের বা দেশের বা ধর্মের কোনো পার্থক্য, তারই অনুভূতি জাগে 'কাবুলি-ওয়ালা' গল্পের বক্তার মনে।

'ছুটি' গল্পটি 'ক্ষুদ্র কাহিনী'র এক উদাহরণ। এক শিশুর জীবনের একটি মাত্র ঘটনা এর আখ্যানবস্তু, তবু সে-ঘটনাটি এমন যে তা শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। 'উলুখড়ের বিপদ' অপেক্ষাকৃত পরে রচিত এক অতি সংক্ষিপ্ত গল্প। কোনো জমিদারের এক কর্মচারীর কামলিপ্সার পাত্রী এক দাসীকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে কী ক'রে এক ব্রাহ্মণের সর্বনাশ হয়, এ-গল্প তারই কাহিনী। 'শাস্তি' গল্পটি এমন এক নারীকে নিয়ে, যাকে একদিকে পর-পর কতকগুলি আকস্মিক ঘটনা ও অন্যদিকে একগুঁয়েমি ও আহত অনুভূতির হাতে মৃত্যু বরণ করায়। এই গল্পগুলি আকারে খুবই ছোট এবং অনাবশ্যক প্রসঙ্গ বর্জিত। অবশ্য সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, মোপাসাঁর গল্পগুলির চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি দীর্ঘতর, বিশেষত পরের রচনাগুলি, যেমন 'নষ্টনীড়', বা 'মাস্টার-মশায়', বা 'রাসমণির ছেলে' বা 'হালদার গোষ্ঠী'। আখ্যানবস্তুর সাংগঠনিক

দিক থেকে তারা ছোট উপন্যাসেরই সমীপবর্তী।

মোপাসাঁর গল্পগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় একটা সম্ভব ফল যা হয়, তা তাদের উজ্জ্বল ও চমক লাগানো উপসংহার। কখনো-কখনো তেমন উপসংহারে কোনো বিশেষ গল্পের উপলব্ধিটাই বদলে যায়, যেমন The Jewels (অলংকার) গল্পে, বা My Friend Patience (বন্ধু ধৈর্য) গল্পে। অন্যত্র, আখ্যানের উপাদানে নতুন কিছু যদি তা না-ও আনে, কোনো বিশেষ গল্পের অন্যান্য অংশের থেকে তা একটু আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে। যেমন Coco (কোকো) গল্পটিতে ক্ষুধার তাড়নায় মৃত ঘোড়ার কবর দেওয়ার বৃত্তান্তটি শেষ হয় অল্প কথায় এই নিষ্ঠুর ঘটনার বিবৃতিতে: 'এবং তার হতভাগ্য শরীরকে খোরাক ক'রে ঘাস বাড়তে থাকে ঘন, সবুজ, প্রবল হয়ে।'

এমন ফল অর্জনে রবীন্দ্রনাথকে কমই সচেষ্ট দেখা যায়। ঊর্ধ্ব হতে পতন বা অ্যান্টি-ক্লাইমাক্সের আঙ্গিক তিনি কদাচিৎই ব্যবহার করেছেন। তবে নাটকীয় পরিণতি আছে তাঁর অনেক গল্পেই, যেখানে শেষ নামে কোনো মৃত্যুতে, বা চিরকালের মতো কোনো চলে যাওয়ায়। এ-ধরনের কাহিনীর অন্যতম হল 'দেনাপাওনা', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'জীবিত ও মৃত', 'ছুটি', 'দানপ্রতিদান', ইত্যাদি। মহামায়া চোখের আড়াল হয় চিরকালের জন্য, 'স্বর্ণমৃগ' গল্পের নায়কও তাই করে। 'ত্যাগ' গল্পে স্বামী-স্ত্রী পৈতৃক ভিটে ছেড়ে চলে যায়।

সুখজনক সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথের প্রায় কোনো গল্পেই নেই। 'সম্পাদক' কোনো তিক্ততার ছাপ রাখে না এবং সেই একই কথা প্রযোজ্য 'সমাপ্তি'-র ক্ষেত্রেও। 'সমস্যাপূরণ' শেষ হয় ন্যায়সংগত অধিকারীর দাবিকে জয়যুক্ত ক'রে, কিন্তু সেখানেও উপসংহারের কয়েকটি লাইনে ফুটে ওঠে অন্যতম এক প্রধান চরিত্রের দীন মনোভাব।

চমকপ্রদ শেষের জন্য তিনটি গল্পের স্থান অতি বিশেষ: 'প্রায়শ্চিত্ত' কাহিনীর ছেদ নামে এক অসামান্য নাটকীয়তায়, এমন আকস্মিকতা ও শ্লেষের ব্যবহার মোপাসাঁকেও গর্বিত করতে পারত। 'শাস্তি'-র শেষ কথাটি ট্রাজিক দ্যোতনায় একটি উজ্জ্বল উক্তি—এবং এখানেও সারা গল্পটি, তার আখ্যানবস্তু বা চরিত্রেরা, তার বলার ভঙ্গি, এ-সবের সঙ্গে ফরাসি লেখকের কোনো-কোনো গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। যে-নিষ্ঠুর শ্লেষের সুরে শেষ হয় 'পুত্রযজ্ঞ', তারও ধ্বনি মিলবে মোপাসাঁর বহু গল্পে।

কাহিনীর উন্মোচনে কথকতার কিছু চিহ্নের সংরক্ষণ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ছোটগল্পের আরো একটি বৈশিষ্ট্য। এক প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তা তার কাহিনী বলছে শ্রোতাদের সামনে, সঙ্গে কোনো কিছু ঘটনায় তার নিজের প্রতিক্রিয়াটা জানাতেও সে উন্মুখ, যোগ করছে তার টীকা-টিপ্পনি। ইত্যবসরে শ্রোতাদের

মধ্যে কেউ হয়তো শুরু ক'রে দিল আরো একটি গল্প। মুখের কথায় বিবৃত গল্পের এই বৈশিষ্ট্যটি মিলবে মোপাসাঁর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাহিনীতে।[৩]

রবীন্দ্রনাথ এই ভঙ্গির ব্যবহার করেন নি তাঁর কোনো গল্প-সংকলনের উপস্থাপনে। কিন্তু প্রথম পুরুষে বর্ণিত তাঁরও বহু ভিন্ন-ভিন্ন গল্প একজনের মুখ দিয়ে অন্য আরেকজনকে কাহিনী শোনানোর একই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যেমন 'সম্পত্তি-সমর্পণ'-এর এক জায়গায় স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত বক্তা হঠাৎ শ্লেষের সুর নিয়ে গলায় হাজির হয় উত্তম পুরুষের রূপে: 'কিন্তু আমার বিশ্বাস ...'[৪]। তেমনই 'দান-প্রতিদান'-এর শেষেও, মুখ্যত অপ্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তা তার চরিত্রের আচরণের অর্থ বুঝতে সরাসরি হার মেনে বসে। 'তাহাতে কী বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।'[৫] 'সমাপ্তি'-তেও প্রথম পুরুষের বেশধারী বক্তা কোনো সময় না জানিয়ে পারে না: 'পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃণ্ময়ীর কৌতুক হাস্যধ্বনি···অপূর্বর · ক্লেশদায়ক হইয়াছিল।'[৬] লিখিত হলেও আসলে গল্প যে বলা হচ্ছে একজনের দ্বারা অন্যজনকে, এই সত্যই সূচিত হয় বক্তার এমন হঠাৎ-হঠাৎ মাথা-গলানোর মাধ্যমে।

কাহিনীর ভিতরে অন্য কাহিনী রয়েছে, কথকতার এই ভঙ্গিটির ব্যবহারে মোপাসাঁ তাঁর পক্ষপাতিত্ব দেখান কিছু উপরি ফল অর্জনের জন্য। বক্তার এমন সংখ্যাবৃদ্ধিতে শ্লেষের দ্যোতনারও বিস্তার কীভাবে ঘটে, তার উদাহরণ তাঁর Madam Husson's Rose-tree (মাদাম উ্যস্সঁর গোলাপ গাছ) গল্পটি। প্রথম প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তা মফঃস্বলের জীবনের একঘেয়েমি ও অসার দাম্ভিকতা নিয়ে ঠাট্টা করে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় যে-বক্তাটি, যে-ই প্রথম মাদাম উ্যস্সঁর অদ্ভুত গোলাপ গাছের কাহিনীটি শোনায়, তার কথার দ্বারাই সে প্রমাণ করে যে সেও কিছু কম বাক্যবিশারদ ও মূর্খ নয়, তার কাহিনীর চরিত্রদের মতো সেও ঘৃণার সমানই যোগ্য। লেখক মোপাসাঁ বা আমরা যারা পাঠক, তারা কেউই এসব চরিত্রদের কারো কথায় ভুলি না, বিশ্বাস করি না একদিকে যেমন সেই নাক-উঁচু প্যারিসবাসীটিকে যে কাহিনীর সূত্রপাত করে, তেমনি অন্যদিকে আত্মতুষ্টিতে গদগদ দ্বিতীয় বক্তাটিকে, এবং বিশ্বাস নিশ্চয় করি না ছোট শহরটির হাস্যকর বাসিন্দাদের।

খানিকটা একই ধরনের ফল রবীন্দ্রনাথও অর্জন করেন 'দুরাশা' গল্পটিতে। প্রথম প্রতিনিধি-স্থানীয় যে-বক্তাটি দ্বিতীয় বক্তার মাধ্যমে পাঠকের কাছে-কাহিনীর উন্মোচন ঘটায়, তার স্বরূপটি ফুটে ওঠে তার নিজেরই কথায়, বিশেষত সে যখন বলতে বসে শ্রুত বৃত্তান্তে তারকী প্রতিক্রিয়া হয়েছে না-হয়েছে — আসলে সে স্বয়ং হয়ে দাঁড়ায় রক্তমাংসের একটি চরিত্র বিশেষ। আমরা তাকে দেখি এক কলকাতাইয়া বাবু হিসেবে, নিজেকে নিয়ে যার কোনো সন্দেহ নেই, অনর্থক আনন্দ পাওয়ায় যার আর রুচি নেই, যার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত। তাকে

নিয়ে পাঠকের মনে যে-শ্লেষাত্মক প্রতিক্রিয়ার ভাব জাগে, তা কাহিনীটির নতুন দিগ্‌দর্শনে সহায়তা করে।

'কঙ্কাল'-ও খাড়া করে এক প্রথম প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তাকে, যার ব্যক্তিত্ব গল্পটিকে এক বিশেষ ব্যাপ্তি দেয়। 'কঙ্কাল' যদি ভুতুড়ে গল্পের এক সার্থক প্রহসন হয়ে থাকে তো তার জন্য এই বক্তাটির ব্যক্তিত্ব কম দায়ী নয়।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত কোনো আখ্যান কতখানি প্রভাবশালী হতে পারে, তা সম্যকভাবে বুঝতে গেলে মোপাসাঁর The Horla (ল্য অর্লা) গল্পটির প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে। গল্পটির প্রথম সংস্করণে মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ এক চিকিৎসককে দেখা যায় তারই চিকিৎসাধীন এক রোগীকে একটি বিচিত্র অনুরোধ করতে: অনুরোধটি ছিল, রোগীটি তার কাহিনী শোনায় অন্য সকলকে। রোগীর বদ্ধমূল কিছু ধ্যানধারণার সমর্থন চিকিৎসক করে গল্পের উপসংহারে, এবং তখন নিজেরও সিদ্ধান্ত সে জানায়। এক বছর বাদে গল্পটির যে-দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়, তাতে গোড়াতেই সরাসরি রোগীর ডায়েরির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই দ্বিতীয় আখ্যানটি তার নগ্নতা ও স্পষ্টতার দরুণ প্রথমটি থেকে বহুগুণে শক্তিশালী হয়, কারণ প্রথম আখ্যানটি মূল ঘটনার উপস্থাপনা ও পরে তাই নিয়ে টীকাটিপ্পনিতে ভারাক্রান্ত ছিল। এক অসুস্থ মনের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায় পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারে না। Insane? (পাগল?) গল্পে একজন বলতে বসে তার রক্ষিতার প্রতি তার আবেগের কাহিনী, যে-আবেগ এমন সর্বগ্রাসী রূপ নেয় যে শেষ পর্যন্ত তা তাকে খুনে প্ররোচিত করে। সে গল্পটির শেষ করে পাঠকের উদ্দেশে একটি ছোট্ট প্রশ্ন তুলে: 'আমি কি পাগল?'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি গল্পে উত্তম পুরুষে কাহিনী বলার আঙ্গিকটি ব্যবহার করেছেন। যেমন আগেই দেখেছি, কখনো-কখনো যথার্থ গল্পটি বলা হয় এক দ্বিতীয় প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তার মাধ্যমে, যার সঙ্গে প্রথম বক্তার পার্থক্য স্পষ্ট। এই ধারারই পরিচয় মেলে 'দুরাশা', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পগুলিতে। কিন্তু অনেক সময় প্রথম প্রতিনিধি-স্থানীয় বক্তা যা বলে, তা তার নিজেরই কাহিনী, অন্যের মুখে শোনা গল্প নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বক্তা কোনো পুরুষ, কখনো সে এক তরুণ ছাত্র, কখনো এক লেখক যে গল্পের লেখকেরই নকল, যেমন 'কাবুলিওয়ালা', 'সম্পাদক' বা 'বোষ্টমী' গল্পগুলিতে। সে কখনো বা হতে পারে এক দাম্ভিক নির্বুদ্ধি ডিটেকটিভও, অথবা এক দুর্বল ও ব্যর্থ স্বামী, যেমন 'পয়লা নম্বর' গল্পে, অথবা সুস্থ মস্তিষ্কের এক মধ্য-বয়স্ক, যেমন 'পাত্র ও পাত্রী'-তে। কখনো বক্তা আমি-র আড়ালে থাকে এক নারীর ব্যক্তিত্ব, যেমন 'দৃষ্টিদান' গল্পের নায়িকা, এবং এমন প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সাহসের সাক্ষ্য বহন করে। নারীর মনকে ভাষা দেওয়ার কী অসাধারণ প্রতিভা ছিল তাঁর, 'স্ত্রীর পত্র' তার এক দৃষ্টান্ত, চিঠির মাধ্যমে কাহিনী

উন্মোচনের আঙ্গিক এ-গল্পে তিনি আগাগোড়া ব্যবহার করেন। অন্যত্র, যেমন 'ডিটেকটিভ' ও 'পয়লা নম্বর'-এ, কাহিনীতে শেষের দিকে কোনো চিঠি সন্নিবেশিত হতে পারে, যার ফলে গল্প একটা নতুন মোচড় খায়। মোটামুটি-ভাবে, এমন আখ্যানভঙ্গির খুব একটা ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ করেন নি।

মোপাসাঁ কিন্তু এ-ভঙ্গিটির ভক্ত ছিলেন। তাঁর The Relic (স্মৃতিচিহ্ন) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মতো, একটি চিঠি মাত্র। পক্ষান্তরে, Words of Love (প্রেমের কথা) একটি চিঠি ও তার উত্তর। The Mad Woman (ক্ষিপ্তা ?) হল কোনো বান্ধবীকে লেখা নববিবাহিতা এক নারীর পত্র। এই তিনটিই লঘু কাহিনীর দৃষ্টান্ত, যা Suicide (আত্মহত্যা) নয়। শেষের গল্পটি এক মর্মস্পর্শী বিবরণী এমন এক মানুষের যার জীবনে চরম নৈরাশ্য এসেছে, যে বিগত দিনে ফিরতে চায় তাকে লেখা আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের পুরনো চিঠির পাঠের মাধ্যমে। সর্বশেষ চিঠিটা যখন পড়া হয়, যেটা সে নিজেই লেখে সাত বছর বয়সে, তখন সে আত্মহত্যা করে।

চিঠির আকারে তাঁর গল্পের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হয়তো Letter From a Mad Man (এক পাগলের পত্র), যা মনে হয় লিখছে এমন এক ব্যক্তি যাঁর ঘাড়ে চেপে বসেছে একগাদা অদৃশ্য প্রাণী। চিঠিটি লিখিত এক ডাক্তারকে, ভাষায় পত্র লেখকের মস্তিষ্ক বিকারের কোনো আভাস নেই। তার মনের আচ্ছন্ন ভাবের বিকাশটা পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয় অল্পে-অল্পে।

'এক পাগলের পত্র', 'ল্য অর্লা ১', 'ল্য অর্লা ২' এবং 'পাগল ?' – উন্মত্ততা বর্ণনার চারটি বিভিন্ন আখ্যান-ভঙ্গির দৃষ্টান্ত।

গল্পে বর্ণনার স্থানটি কী ? এই দুই লেখক প্রকৃতি থেকে বেছে নিয়েছেন কোন-কোন উপাদান ? বছরের কোন বিশেষ সময় তাঁদের বিষয়বস্তুর খোরাক যোগায় ? এ-প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা যাক।

গল্পের স্থান হিসেবে মোপাসাঁর প্রিয় ছিল দু'টি জায়গা : এক, নর্‌ম্যাণ্ডি অঞ্চল ; অন্যটি, প্যারিসের কাছে সেন নদীর ধার। কোনো-কোনো গল্পের স্থান ভূমধ্যসাগরের তীরও, যেমন ফরাসি রিভিয়েরা, বা কর্সিকা, এমন-কি উত্তর আফ্রিকাও। রৌদ্রঝলমল এই অঞ্চলগুলি স্থানবিষয়ক ও মানসিক অদ্ভুতত্বের প্রতি স্পৃহার উপাদান সরবরাহ করে। বর্ণিত ঘটনাটি ঘটছে কোথায়, সেটির যথাযথ নির্দেশ মোপাসাঁর অভিপ্রেত ছিল, এবং সে-নির্দেশ তিনি দিতেন গল্পের গোড়াতেই। A Country Excursion (গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ) হল এক প্যারি-সীয় পরিবারের কাহিনী যারা শহরের বাইরে বেড়াতে এসেছে। কোন-কোন জায়গার মধ্য দিয়ে তারা চলেছে, তার বর্ণনায় কাহিনীর সূত্রপাত হয়। সে জায়গাগুলি মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া পাঠকের পক্ষে শক্ত নয়, এবং শেষে

পৌঁছনো গন্তব্যে, সেটি হল সেন নদীর ধারে এক রেস্তোরাঁ। যথাযথের প্রতি এই ঝোঁক প্রকৃতিবাদীর লেখার দর্শনের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ এমন খুঁটিনাটিতে যান নি কখনো। তাঁর কোনো-কোনো গল্পের স্থান কলকাতা, তবু সেখানে উল্লেখ নেই কোনো রাস্তার নামের, বা পাড়ার। কলকাতার অতি পরিচিত জায়গার একটি-দুটির উল্লেখ মেলে 'ডিটেক্‌টিভ' গল্পে।

গল্পের স্থান যখন বাংলার পল্লী-অঞ্চল, তখনো বিশেষ কোনো নির্দেশ নেই। একবার 'একরাত্রি'-তে নোয়াখালির নাম পাওয়া যায়, সম্ভবত প্রচণ্ড ঝড়-বন্যার ব্যাখ্যা হিসেবেই। অন্যত্র বড় জোর হয়ত নদীর নামটা চোখে পড়ল, জানা গেল নদীটা ছিল ভয়ংকরী পদ্মা। তাঁর আগেকার গল্পের অধিকাংশ রচিত হয় শিলাইদহে, এই সত্য বিদিত বলেই আমরা ধরে নিতে প্রলুব্ধ হই গল্পগুলি ঘটছে সেখানেই। কিন্তু যথাযথের এই অনুপস্থিতির ফলে গল্পগুলির পরিবেশ পায় এক সাধারণ বাঙালিত্বের ভাব। নয় কোনো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, নয় চরিত্রদের কথাবার্তায় কোনো উপভাষাসুলভ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিতও। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, সব মিলিয়ে বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথের গল্পে জাগে এক গ্রাম ও নদীর দেশ হিসেবেই – যেখানে বর্ষা প্রচুর, যেখানে সূর্যের সঙ্গে মেঘ লুকোচুরি খেলে। সেখানে জমিদার যারা, তারা হিন্দু, তাদের কর্মচারীরা ও অধিকাংশ প্রজাও তাই। 'সমস্যাপূরণ-এর এক অছিমদ্দিকে বাদ দিলে তাঁর গল্পে মুসলমানেরা অনুপস্থিত, যদিও বাঙালি কৃষকদের একটা মোটা অংশ তারা ছিল, সে-যুগেও।

তাঁর খুব কম গল্পই ঘটে বাংলার বাইরে, ব্যতিক্রম যেগুলি, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর স্থান তাদের মধ্যে সর্বোচ্চে। স্থান নিয়ে অদ্ভুতত্বের প্রতি স্পৃহার শিকার রবীন্দ্রনাথ হন নি।

সেই রকমই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলিকে কোনো বিশেষ কাল বা সময়ে স্থাপিত করেন নি, এখানেও তিনি মোপাসাঁর বিপরীত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ১৮৭০-এর ফরাসি-জার্মান যুদ্ধ ফরাসি লেখকের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁর অনেক কাহিনী, যেমন বিশেষত Ball-of-Fat (বুল্ দ্য সুইফ), কোনো-কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার উপর স্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত। 'বুল্ দ্য সুইফ'-এর ক্ষেত্রে সেটি ছিল রুআঁর পতন ও শত্রুবাহিনী কর্তৃক সেই শহর অধিকৃত হওয়া। তাঁর রচনাগুলি পড়া যায় তাঁর যুগের পরিচয়পত্র হিসেবে।

বাংলা ১৩০১ সনে প্রকাশিত 'মেঘ ও রৌদ্র' নামক মনোরম গল্পে রবীন্দ্রনাথ একটি চরিত্র সৃষ্টি করেন, যার নাম শশী। উপনিবেশবাদ ও তজ্জনিত কিছু অত্যাচারের সম্মুখীন শশীকে হতে হয়। কংগ্রেস সমর্থক হিসেবে তার প্রতি সন্দেহ জাগে ও তাকে কারাবাস গ্রহণ করতে হয়। গল্পটিতে এই ঐতিহাসিক

পটভূমিকা ব্যবহারের পিছনে যে-উদ্দেশ্য কাজ করে, তা হল ব্রিটিশদের উদ্ধত ও ভণ্ডামি-ভরা তথাকথিত ন্যায়সংগত আচরণের সামনে পরাধীন জাতির এক প্রকাণ্ড অংশের কাপুরুষতা, কাপট্য ও অসত্যানুবর্তিতার রূপটি স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরা। তাছাড়া, বহির্জগতের ঘটনাবলির চেয়েও শশী ও গিরিবালার ভিতরকার সম্পর্কের উপরই এখানে আলোকপাত বেশি। 'রাজটীকা' গল্পে ব্যঙ্গপূর্ণ ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির নৈতিক ফলাফলের রূপ চিত্রিত করেন। 'নামঞ্জুর গল্প', 'সংস্কার' ও 'অপরিচিতা'-সদৃশ পরে লেখা গল্পগুলিতে এমন চরিত্রের পরিচয় মেলে যাদের মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক জ্ঞান বিকাশ পেয়েছে, তবু তাদেরও অনেকেই নানান পূর্ব-সংস্কার ও ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন থাকার ফলে আদর্শ অনুযায়ী এগোতে পারে না।

বর্ণনার প্রসঙ্গে যদি আসি তো দেখি মোপাসাঁর ক্ষেত্রে গল্পের সাধারণ সংক্ষিপ্ততাতেও তার এক মূল্যবান স্থান আছে। শুধু দর্শন বা শ্রবণের বস্তুই নয়, ঘ্রাণের বস্তুও বর্ণিত হয় এক বিশেষ রূপে। লেখক নিজের পরিচয় দেন এমন 'এক অনুভবের যন্ত্র' হিসেবে যাতে 'প্রত্যূষ, মধ্যাহ্ন, গোধূলি ও রাত্রি ধ্বনিত হয়।'[৭] এর ফলে জাগে অনুভূতির এক ঐকতান। প্রকৃতিকে বাস্তবের সংস্পর্শযুক্ত ক'রে এক মহান জিনিস হিসেবে দেখানোর কোনো চেষ্টা নেই ; প্রকৃতি তাঁকে যে-আনন্দ দেয়, তারজন্যই তাকে তিনি ভালোবাসেন। তিনি লেখেন[৮] : 'নারীর দেহ নিয়ে যে-প্রেম আমার, সেই একই প্রেম আমার ঘাস নিয়ে, নদী নিয়ে, সমুদ্র নিয়ে।'

যদিও নরম্যাণ্ডির তুষারাবৃত শীতকালীন নিসর্গ শোভা বা বর্ষণসিক্ত শরৎকালের সম্যক বর্ণনায় তিনি কিছু কম পারদর্শী নন, তাঁর আসল আনন্দের সন্ধান মেলে যখন তিনি আবাহন করতে বসেন গ্রীষ্মের দিন, কারণ তখনই প্রকৃতি তার ঔদার্যে-ঔজ্জ্বল্যে-দীপ্তিমত্তায় সুন্দরতম রূপে হাজির হয়। রনোয়ার ও মানে যা আঁকেন তুলির টানে, তা-ই মোপাসাঁ চিত্রিত করেন অক্ষরের মাধ্যমে। Story of a Farm Girl (গোলাবাড়ির এক মেয়ের কাহিনী -র নায়িকা বসন্ত-শেষের এক মধ্যাহ্নের ঘ্রাণে ও দৃশ্যে আত্মহারা হয়, তার প্রেমজর্জর দেহ নিবেদন করে গোলাবাড়ির প্রভুকে।

নদীর প্রেমিক মোপাসাঁ যেমন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি। আত্ম-বিনোদনের জন্য ফরাসি লেখকের চরিত্রেরা আসে নদীর ধারে। রবিবার সেখানে তারা মধ্যাহ্নভোজনে ব্রতী হয়, পরে বন্ধুদের নিয়ে নৌবিহার করে। নদী এক খেলার জায়গা, যেখানে নারী-পুরুষ মিলিত হয় উচ্ছল আনন্দে। বহিঃপ্রকৃতি থেকে যতটা পারা যায়, তা আহরণের আগ্রহ কারোই কম নয়। 'গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ' গল্পের তরুণী মেয়েটি যে-স্বাভাবিকতায় পাখি গান করে বা নদী ছোটে কলস্রোতে, সেই একই সহজভাবে প্রেমের আলিঙ্গনে মিলিত হয় সদ্য-পরিচিত এক পুরুষের সঙ্গে, যেন গ্রীষ্মের দিনের মাধুর্য তাদের আচ্ছন্ন করেছে। যেখানে

নৌকাযাত্রীরা জড়ো হয় ও রবাহূত অন্য দর্শকদের ভিড় জমে, বা যেখানে জলের উপর ভাসমান কাফে-তে পানাভিলাষী নারী-পুরুষেরা মিলিত হয়, সেখানে দেখা যায় চাঞ্চল্যের এক রূপ, যার সঙ্গে রাত্রিতে অবলুপ্ত নিঃশব্দ নদীতীরের কোনো মিল নেই। নদী শুধু মজা বা আনন্দের জায়গাই নয়, কখনো-কখনো তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ শব্দহীন, কুটিল। তার কৃষ্ণ গভীরতায় লোকে ডুবে মরে, পচতে থাকে। নদীতে এক রাত্রি যাপনের অসামান্য বর্ণনা লেখক দেন তাঁর On the Water (জলের উপর) গল্পে। জলের নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকার নায়ককে ভীতিতে আচ্ছন্ন করে। তার নৌকা নড়ে না, গভীর কুয়াশায় ঢেকে থাকে সব কিছু। কনকনে শীতের এক ধূসর প্রভাতে নদীর গর্ভ থেকে টেনে তুলে আনা হয় এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। The Country Excursion গল্পে নদীর যে-লঘু ও সুখময় ছবি মেলে, তার সঙ্গে 'জলের উপর'-এ বর্ণিত সেই নদীরই বিষণ্ণ ও করাল রূপটি পাশাপাশি রাখলে মোপাসাঁর দু'টি বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়: একটিতে ইন্দ্রিয়পরায়ণ প্রাণবন্ত মানুষ, অন্যটিতে উন্মত্ততার ভয় ও মৃত্যুর চিন্তায় জর্জরিত ও ম্রিয়মাণ মানুষ। Fly (মাছি) হল আরেকটি মনোরম কাহিনী, যেখানে লেখক জানাচ্ছেন: 'দশ বছর ধরে সেন নদী ছিল আমার মহান ও সর্বব্যাপী আবেগের একমাত্র আশ্রয়।'[৯]

নদী নিয়ে মত্ততায় রবীন্দ্রনাথও সমানই মাতেন। 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের প্রথম কাহিনী শুরু হয় গঙ্গার বর্ণনা দিয়ে। সময়টা সুন্দর শরৎ কাল, যখন বর্ষার পরে এক মধুর সূর্যের মুখ অবশেষে দেখা যাচ্ছে। স্ফীত জলরাশির উপর দিয়ে মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে, বিশ্বজগৎ স্নাত হচ্ছে স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণে। পাখিদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ কানে আসছে এবং দাঁড়-বওয়া নৌকার বদলে পাল তুলে চলেছে তরণী, যেন ভাসমান হংসশ্রেণী। নদীর তীরে মানুষ আসে-যায়, কাপড় কাচে, কখনো স্নান বা প্রার্থনায় রত হয়। এরা দৈনন্দিনের নানা কাজে লিপ্ত গ্রামবাসী, মজার সন্ধানী নয়। তাদের এসব কাজের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বেশি সময় নষ্ট করেন না। নদী তাঁর কাছে শাশ্বত প্রকৃতির প্রতীক, মুহূর্তে-মুহূর্তে পরিবর্তনশীল হয়েও চিরকালই একই জিনিস, বিপদসংকুল ও ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে এখানে তার পার্থক্য। কালের নদীতে মানুষ জলজাত উদ্ভিদের মতো।

'নিশীথে' গল্পেও শরতের পদ্মার এক সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়: চাঁদের আলোয় ঝকঝক করে বেলাভূমির বালু, গ্রামের পর গ্রাম, কর্ষিত প্রান্তর। ভয়ংকরী নদীকে তুলনা করা হয় এক নিদ্রালসা সাপিনীর সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে নদী প্রায়ই পথের এক প্রতিকল্প। কোনো জায়গায় যেতে হলে অন্যত্র লোক যেমন নেয় গাড়িঘোড়া বা বাস বা ট্রেন, এখানে তেমনি নেওয়া হয় নৌকা। 'ছুটি'-তে তরুণ নায়কটির নিয়তি একদিন এসে হাজির হয় তার মামার রূপ ধরে, নৌকায় ক'রে সে এসে নামে তাদের গ্রামের ঘাটে। একই

নৌকায় ছেলেটি পাড়ি দেবে কলকাতায়, যেখানে তার মৃত্যু ঘটবে। 'সমাপ্তি'-তেও নদী ব্যবহৃত হয় অনুরূপ পন্থায়। নদীর ধারে লোকে মাছ ধরে, মালপত্র ওঠায়-নামায়, বহু দিনরাত্রি ধরে তাদের যাত্রা চলে নদীর উপর। তীরে কোথাও হাট বসে, সময় যায় বেচাকেনায়। যে-ঋতুতে নদী জাগে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক রূপে, তা শরতের গোড়ার দিক, বা বর্ষণশেষের সময়, যখন পৃথিবী ধৌত হয়েছে প্রাণদায়ী সলিলের করুণায়। এমনই সময়ের এক বর্ণনা মেলে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। বর্ষায় মেঘ অল্প তখন, তা ছড়িয়ে আছে আকাশে-আকাশে, সূর্যের কিরণ সলজ্জ, যেন তার ভয় আকাশের পরিবর্তনশীল ভাবভঙ্গিকে নিয়ে। প্রকৃতির আবাহনের রূপ যেন চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্কের অস্থিরতার প্রতিভূ, যে-চরিত্রদের কারোই সময় নেই নিসর্গ শোভার ধ্যানে বসতে। নদীতীরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চেয়ে যখনই শশী নৌকায় চড়ে ভ্রমণে বেরোয়, তখনই এমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যার ফলে একমাত্র তাতেই সমস্ত মনোযোগ নিয়োগ না ক'রে তার উপায় থাকে না। একই গল্পে, অন্যত্র, বর্ষাকালের নদী-তীরবর্তী অঞ্চলের মনোরম বর্ণনা দেখা যায়, যদিও সেখানেও জোর ঐ মানুষের সম্পর্কের উপরই, ভাব এক বিষণ্ণতার, অস্বস্তির।

সারাদিনের বর্ষার পরে এক গুমট সন্ধ্যার কিছু সুর ধ্বনিত হয় 'শাস্তি' গল্পে : হাওয়া নেই, তেমন মেঘও নেই, সর্বত্র জল ও সদ্য গজিয়ে ওঠা আগাছার ছড়াছড়ি। দূরে দেখা যায় কূলপ্লাবী পদ্মা। একই পদ্মা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পে রাক্ষসীর রূপে হাজির হয়, নদীতীরের মানুষ বা জীবজন্তু বা গ্রামের পর গ্রাম গিলে খেতে তা উদ্যত। তার সর্বনাশা শক্তি সক্রিয় অবিরামভাবে। এমন ভয়ংকর মূর্তির তুলনায় 'সুভা'-র ছোট নদীটি শান্তশিষ্ট, যেন বন্ধু কোনো। গল্পের ছোট্ট নায়িকাটির মতোই তা একেবারেই গায়ে-পড়া নয়, বরং ধীরই, হিতকারীই। এখানে নদী ও কন্যা যেন একে অন্যের প্রতীক।

ফরাসি লেখকের তুলনায় বর্ণনার মাধ্যমে কোনো প্রতীকী অর্থের ইঙ্গিত-দানের ঝোঁক রবীন্দ্রনাথে আরো বেশি। তাঁর গল্পে বর্ণনাত্মক অংশের সংখ্যা কম। কবি হিসেবে তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বিস্তারিত আবাহনের অবকাশ তিনি অনেক পেয়েছেন, তাই হয়ত গল্পতেও তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। পক্ষান্তরে, মোপাসাঁ তাঁর গল্পকে ব্যবহার করেন এক কাব্যিক প্রকাশ হিসেবেও।

নারী নিয়ে উভয় লেখকেরই এক তীব্র আবেশের ভাব ছিল, যদিও সে-বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটাও নজরে পড়ে।

মোপাসাঁ ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখ-লিপ্সু, নারীর বুদ্ধি অপেক্ষা দেহই তাঁর কাছে বেশি উপভোগ্য ঠেকত। নারীর সৌন্দর্য মূলত শারীরিক। তাঁর নায়িকারা

স্থূলাঙ্গিনী গোছের, চুল তাদের প্রায়ই সোনালি। তাদের যে-ছবি তিনি আঁকেন, তাতে চোখের উল্লেখ কমই থাকে, কিন্তু দেহের ঘ্রাণের কথা কখনো-কখনো পাওয়া যায়। যেমন Tresses (কেশকলাপ) গল্পে, সেই দেহের কিছু উপভোগ্য খুঁটিনাটির আবাহনে তিনি মাতেন, হয়ত বর্ণনা কোথাও এক গুচ্ছ কেশের, তার রঙ ও বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যের, তার গন্ধের।

অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে নায়িকাদের বর্ণনা প্রায় করেনই না। শুধু প্রয়োজনে পড়েই তাদের সৌন্দর্যের উল্লেখ তিনি করেন, কিন্তু খুঁটিনাটিতে যান না। বড়জোর হয়ত বললেন তাদের চোখের কথা, যা সব সময়ই খুব বড়ো ও কালো। চোখই হল মনুষ্যদেহের সবচেয়ে বেশি আত্মিক অঙ্গ, চোখের উল্লেখ সেই কারণেই। হৈমন্তীর যে-বর্ণনা তার স্বামী দেয়, তা তার এক ফোটোগ্রাফে সে তাকে যেমনটি দেখেছিল, তারই অনুরূপ। দু'টি কালো চোখের উল্লেখ, তার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব ও বেশভূষার এক গম্ভীর সারল্য, এবং সবশেষে তার চরিত্রের অসাধারণ মায়াময় প্রভাবের কথা। শুধু, রবীন্দ্রনাথের গল্পে দু'টি মাত্র নারীকে দেখা যায় তাদের সৌন্দর্য নিয়ে অতিরিক্ত প্রগল্‌ভা হতে : একটি হল 'কঙ্কাল'-এর প্রেত, অন্যটি 'মানভঞ্জন'-এর নায়িকা। শেষেরটিকে জানানো হয় এক আকস্মিক আলোকরশ্মির মতো সুন্দরী বলে। তার সৌন্দর্যে চমক লাগে, চোখ ঝলসে যায়। তার গতিবিধি, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, চোখের চাওয়া, মাথা বা হাত নাড়ার ভঙ্গি, সবই মনোমুগ্ধকর। তবু তার মুখ বা শরীর সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত কোথাও নেই। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিক থেকে নিজের প্রতি প্রেমে বিভোর এই নারীর আলেখ্যটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ছোটগল্পে বোধহয় তুলনারহিত।

নারী দেহের লাবণ্য পুরুষের ইন্দ্রিয়-চেতনায় কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'বোষ্টমী' গল্পের একটি ক্ষণিক দৃশ্যে। ঘাট থেকে তরুণী রমণীটিকে সিক্ত বসনে ফিরতে দেখে গুরুঠাকুর বলে ওঠেন : 'তোমার দেহখানি সুন্দর।' কতখানি অব্যক্ত রয়ে যায় এই ক'টি কথায়, তার ইঙ্গিতটি অনুমেয়।

বাঙালি সমাজের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী কোনো মধ্যবয়স্ক পুরুষের পক্ষেও প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার এক নবযৌবনা কন্যার পাণিগ্রহণ সম্ভব ছিল। সদ্য পরিণীতার প্রতি অনুভূত ইন্দ্রিয়াবেগের কিছু প্রকাশ পাওয়া যায় 'নিশীথে' ও 'মধ্যবর্তিনী'-র মতো গল্পে। কায়িক প্রেমের পরিচয় ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের জগতে যে একেবারেই নেই, এমন বলা সমীচীন হবে না।

সুন্দরী নারী পুরুষের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করে, মোপাসাঁর কাছে তার এক বিশেষ মূল্য ছিল। নারীরা মুখ্যত পুরুষদের কামলিপ্সার ধন। তারা নিজেরাই অদম্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির বশীভূতা। নানা প্রসঙ্গে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত

হয় A Parisian Overture (দুঃসাহসের এক প্যারিসীয় ঘটনা), Fire Wood (জ্বালানি কাঠ) এবং Replacement (প্রতিকল্প) গল্পগুলিতে। অজানা নয় তাঁর নায়িকাদের অনেকেই বারবণিতা। তবু সেই নারীদের সামাজিক অবস্থা যেমনই হোক-না, তারা মোপাসাঁর চোখে ছিল অযৌক্তিক প্রাণী, যাদের কাছ থেকে যে-কোনো আচরণই প্রত্যাশা করা চলে। গভীর ও অনমনীয় আবেগে যে-পুরুষকে ভালোবেসেছে, তার জন্য সবকিছু ত্যাগ ক'রে বসল, এমন নারী-চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে মোপাসাঁর কয়েকটি গল্পে। প্রেমের এই ঐকান্তিকতা প্রশংসনীয় নিশ্চয়, তবু তার মধ্যে কিছু একটা আছে যা অতিরিক্ত, আদিম। অর্থলিপ্সা, কৃপণতা বা উদ্ভট কোনো মানসিক বিকারের মতো অন্যান্য আবেগ থেকে এমন প্রেমের মূলগত পার্থক্য তেমন নেই।

কখনো-কখনো এমন নারীর চরিত্র মোপাসাঁ এঁকেছেন যে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করার অধিকারে সোচ্চার, যে পিছপাও হয় না সমাজ বা তার রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেতে, যে আপন পারিপার্শ্বিকের ক্রূরতা ও ভণ্ডামি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত ক'রে বসে। তবু এমন ব্যতিক্রমে প্রচলিত রীতিরই প্রমাণ ঘোষিত হয়। নারীর মুক্তিকামী মোপাসাঁ ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন।

এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের গল্পে এমন নারীর সাক্ষাৎ নেই যে তার হিংসা, লোভ, নীচতা বা ঔদাসীন্যের বশে আশপাশের লোকের জীবন ধ্বংস করেছে; সেরকম কয়েকটি নারীর চরিত্র তিনি এঁকেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই নারীরা চিত্রিত হয়েছে এক মহিমান্বিত রঙে। তারা সমাজের বলি, বিশেষত সেই অল্পবয়স্কা মেয়েরা যাদের বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়, সেই শৃঙ্খলের স্বরূপটি তাদের বুদ্ধিগোচর হওয়ার আগেই। তাদের দিন কাটে যন্ত্রণায়, প্রায়ই নীরব প্রতিবাদে মৃত্যুও তারা বরণ করে। শ্বশুরালয়ের সবাই তাদের কাছ থেকে চায় যৌবন, সৌন্দর্য, অর্থ। এই প্রত্যাশাগুলির যে-কোনো একটিও যদি অপূর্ণ থেকে যায়, অসহ্য নিষ্ঠুরতার শিকার তাদের হতে হয়। 'দেনাপাওনা'-র নিরুপমাকে শিকার হতে হয় একদিকে যেমন তার পিতার অতিরিক্ত স্নেহ ও দম্ভের, অন্যদিকে তেমন তার স্বামীর পরিবারের লোভের। হৈমন্তী মারা যায়, কারণ সতেরো বছর বয়সেই তার বয়সটা বড্ড বেশি হয়ে যায়! 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পের নায়িকা অভিশপ্তা হয়, কারণ সে সুন্দরী ছিল না!

নারীদের হীন অবস্থা প্রকাশ করা হয় নানা উপায়ে। 'শাস্তি'-তে স্বামী বলে, 'বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।' সত্যি, সমাজের চোখে নারীর মূল্য অতি সামান্যই। এক স্ত্রী মারা গেলে অন্য স্ত্রী আসে। বরের যদি আগের পক্ষের স্ত্রী থাকেও, তা সত্ত্বেও তার হাতে মেয়েকে সমর্পণ করতে বাপ সর্বদাই ব্যগ্র। বহুবিবাহের এক কঠোর সমালোচক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের স্বাস্থ্য বা বন্ধ্যাত্বের কারণে কোনো স্ত্রী যদি তার

স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে উৎসাহ দেয়ও, তবু সে তার হিংসা ও স্বামীর উপর অধিকারের ভাব দমন করতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন।

নারীরা বলি হয় বিবাহের সময়ই, কিন্তু স্বামী যদি মারা যায়, তারা পড়ে আরো বড়সংকটে। কী অত্যাচার সহ্য করতে হয় বালবিধবাকে, কতখানি অযত্নের ও স্নেহহীন হয় তার জীবন, এবং যদি তার পা পিছলায়, কী আক্রোশে সমাজ তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে, তার এক চরম দৃষ্টান্ত মেলে 'বিচারক' গল্পটিতে। সহায়হীনা বিধবার প্রতি সকলের উদাসীন্য কী বিপুল আকার নিতে পারে, 'জীবিত ও মৃত' তার পরিচয় দেয়।

রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে এমন উচ্চ চিত্তবৃত্তি সম্পন্না নারীর দর্শন পাওয়া যায় যাদের বিবাহ হয়েছে অপেক্ষাকৃত অতি সাধারণ স্বামীর সঙ্গে। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'দর্পহরণ' ও 'পয়লা নম্বর' এই শ্রেণীর গল্প। তবু প্রকৃতি নারীর মধ্যে দেয় ভালো-বাসার এক বিরাট ক্ষমতা, যার দ্বারা প্রথম লাভবান হয় স্বামীরাই। পরে সেই লাভের অংশীদার হতে পারে সন্তানেরা। এ-ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যা তা হল এই যে সন্তান-পরিবৃত সুখী পরিবারের সাক্ষাৎ গল্পগুলিতে মেলে না। 'রাসমণির ছেলে'-র প্রশংসনীয়া জননী এক ব্যতিক্রম। 'দিদি'-তে পরিচয় এক রমণীর অত্যধিক স্নেহের, সে-স্নেহ তার আপন সন্তানের জন্য নয়, তারই ছোট ভাই-এর জন্য, যে-ভাই এক অনাথ বালক। নিঃসন্তান স্ত্রীর চরিত্র অংকিত 'মণিহারা' ও 'প্রতিহিংসা' গল্পে। সন্তানের অভাব-বোধ ঢাকবার জন্যেই যে 'মণিহারা'-র নারীটির এত বেশি আকর্ষণ তার অলংকার নিয়ে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অপত্য-সম্পর্কের মধুরতম ছবি ফুটে ওঠে পিতার সঙ্গে কন্যার আচরণে, যথা 'কাবুলিওয়ালা' ও 'সম্পাদক' গল্পে। সন্তানের মধ্য দিয়ে নারীর পূর্ণতার উপলব্ধির দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দেখান না।

আত্ম-উপলব্ধির কোনো পথ কি তিনি খোলা রাখেন এই নারীদের জন্য? প্রায় ক্ষেত্রেই মৃত্যু তাদের নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। যে-মানসিক গ্লানিতে তারা পর্যবসিত হয়, তা খুব বেশিদিন সহ্য করতে পারবে, এমন শারীরিক গঠন তাদের ততটা নেই। তাই শ্মশানে তাদের মুক্তি অর্জন করতে হয়। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন টিকে থাকে, নিজের নিয়তি আপন হাতেই নেয়। 'পয়লা নম্বর'-এর নায়িকা তার স্বামীকে ত্যাগ করে অজানায় হারিয়ে যাওয়ার জন্য। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নিঃসন্তান স্ত্রী তার একঘেয়ে অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে একদিন বেরিয়ে যায় সেই নিষ্ঠুর সমাজ ছেড়ে যা শুধু এই দাবিই করতে জানে: বিবাহিতা নারী পালন করুক তার সামাজিক ভূমিকা। পুরীতে গিয়ে সে ঠিক কী করবে, তা বোঝা যায় না, কেবল এটাই তার মনে হয় যে ধর্ম ভিন্ন এখন অন্য পথ খোলা নেই তার সামনে। 'বোষ্টমী'-ও এমন আরেকটি নিঃসন্তান নারী যাকে সত্যের সন্ধানে স্বগৃহ ত্যাগ করতে হয়।

'অপরিচিতা'-তে স্বাধীন নারীর এক আধুনিক সংস্করণ, যে-নারী বিবাহের বন্ধন অগ্রাহ্য ক'রে স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়।

রবীন্দ্রনাথকে তাই দেখা যায় নারীর সম্মান-রক্ষার ধ্বজাধারী হতে। নারীর হয়ে যুদ্ধই তিনি করেন নি, সে-নারী যে মণ্ডিত এক অনন্ত মাধুর্যে, সেটাও তিনি দেখিয়েছেন। তেমন নারীর বিশেষ দৃষ্টান্ত মেলে কয়েকটি তরুণী বালিকার মধ্যে, যেমন রতন, সুভা, 'সমাপ্তি'র নায়িকা, গিরিবালা, মিনি– এরা সকলেই অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। যে-বালিকা নারীতে উন্মেষিত হতে চলেছে, তাকে এত ভালো বুঝতে বা আঁকতে অন্য কোনো লেখক পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

মোপাসাঁ তাঁর গল্পে শিশুকে অবহেলা করেন নি। পোষ্যরূপে শিশু-পালনের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন, এ-কথা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। পরিত্যক্ত শিশুকে তার মা-বাবা পরে ফিরে পেলে যে-সমস্যা জাগে, তাও তিনি রচনার উপজীব্য করেছেন। এই বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর কিছু অস্বস্তিজনক গল্প আছে, যেমন A Parricide (পিতৃহত্যা) A Son (এক পুত্র) বা In the Fields (মাঠে)। অন্যত্র মা-বাবার অনুভূতির বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, কখনো-কখনো সহৃদয়তা বা সহানুভূতির সঙ্গেই, যেমন 'গোলাবাড়ির মেয়ের কাহিনী' এবং 'মাছি' গল্পে। কিন্তু শিশুরা শিশু হিসেবে কখনো প্রাধান্য পায় না তাঁর লেখায়। অন্য দিকে, রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন শুধু বালিকাদেরই নয়, বালকদেরও, যার উদাহরণ 'ছুটি'-র নায়ক, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এর অল্পবয়স্ক শিশুটি, 'গিন্নী'-র ছোট ছেলেটি।

যে-বিষয়বস্তু উভয় লেখকের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা অর্থ বা ধন। মোপাসাঁ দেখিয়েছেন, একটা কোনো দাম দিতেই হয়, সব কিছুর জন্যে, সকলেরই জন্যে। সমাজে যার স্থান যত উঁচুতে, তার দামও তত বেশি। বেশ্যারা বিক্রির বিষয়, কিন্তু বড় ঘরের কন্যারাও তাই, যদিও তাদের বিক্রয় করা হয় মাত্র একবার, তাদের বিবাহের সময়ে। যৌতুকের গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশে যেমন, ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সেও তেমনি।

নরম্যাণ্ডির কৃষকেরা এতই অর্থগৃধ্নু যে সামান্য পয়সা বাঁচানোর জন্যে তারা করতে না পারে এমন কাজ নেই। পুরুষেরা ভুলে যায় তাদের সম্মানের কথা, নারীরা ভোলে তাদের সতীত্ব। মৃত্যুকালে তাদের মুখে ফুটে ওঠে অর্থলিপ্সা ও ইতর লোভ। অর্থের প্রতি তাদের অতৃপ্ত বাসনার শিকার হয় পশুপক্ষীরা।

মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি তাদের সামাজিক মান বজায় রাখতে বৃথাই আপ্রাণ চেষ্টা করে। অভাব ও নগণ্যতার বিরুদ্ধে তাদের সেই যুদ্ধে তারা আগে থেকেই হেরে বসে আছে। সমাজের নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তরে সর্বত্রই অর্থের দোর্দণ্ড

প্রতাপ। লোভ একটা আবেগ, যে-কোনো মানসিক বিকৃতির আচ্ছন্নতার মতো তা সমানই উদ্ভট ও আত্মধ্বংসী। মোপাসাঁ কোনো সুযোগ দেন না মানুষকে, সে যে-কোনো স্থানে বা সময়েই এক মূঢ় ও হিংস্র জন্তুরই সমগোত্র।

বিশদভাবে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জগৎও অর্থের শাসনাধীন। এ-জগতের পরিবেশ প্রায়ই রচিত হয় কোনো জমিদারি তালুকের চিত্রণে, যেখানে ব্যবস্থাপকরা রয়েছে, প্রজারা রয়েছে। কেউ-কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথ কৃষক শ্রেণী নিয়ে বেশি কিছু লেখেন নি, বরং কৃষকদের প্রভুরাই তাঁর মুখ্য উপজীব্য ছিল যেমন লেখকেরা ক'রে থাকেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও যা অন্তরঙ্গভাবে জানতেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষক শ্রেণীর উল্লেখ যদি মোপাসাঁ প্রায়ই ক'রে থাকেন তো তা হয়ত এই কারণেই যে তুলনামূলকভাবে ফ্রান্সে সামাজিক দূরত্ব কম প্রচণ্ড। তবু 'শাস্তি' ও 'পণরক্ষা'-র মতো গল্প রবীন্দ্রনাথের রচিত অতীব শক্তিশালী সৃষ্টির অন্যতম।

এই জমিদারদের প্রধান চিন্তা হল, যে-জমি রয়েছে তাদের সেটা কী ক'রে রাখবে এবং কী ক'রে আরো জমি আহরণ করবে। নিজের মর্যাদাটা তাদের দেখাতেই হবে, মাতব্বরি করতেই হবে অন্য সকলের উপর। এর জন্যে তারা যে-কোনো কাজ করতে প্রস্তুত। তা সে-কাজ যত অসম্মানেরই হোক না কেন। দানপত্র বা উইল, এবং তার ফলাফল কী হয় না-হয়, তাও আখ্যানবস্তুর অনেকখানি জুড়ে থাকে। সম্পত্তির পক্ষে পরীক্ষার সংকটপূর্ণ মুহূর্ত আসে বিবাহ ও মৃত্যুর সময়। রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ে এই সামাজিক শ্রেণীর চিন্তাধারা, আচার-আচরণ ও জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে পারে।

ধনী হওয়ার সঙ্গে জমি থাকার কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক যে না ও থাকতে পারে, তার উদাহরণ মেলে অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে। সুদে টাকা ধার দিয়েও ধনী হওয়া চলে। ব্যবসার উল্লেখ কমই আছে। কখনো কোনো বিশেষ বৃত্তির শ্রেণীর উপস্থিতি নজরে পড়ে—যেমন ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক, সামান্য বেতনভোগী কর্মচারী ও কেরানি। জমিদারদের নিয়ে বহু সংখ্যক গল্পে জমিদার শ্রেণীর যেমন ছবি পাওয়া যায়, সেই তুলনায় ঐ অন্যান্য গল্পে উল্লিখিত বৃত্তিগুলিতে নিযুক্ত লোকদের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না।

ধর্মগত ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ ও পদমর্যাদা, যা জাতিভেদ প্রথার ফল এবং যার নিদর্শন মোপাসাঁতে, বলা বাহুল্য, নেই—তার একটি স্পষ্ট স্থান আছে 'মহামায়া', 'ত্যাগ', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি গল্পে। কুলীনত্বের প্রভাব বা 'ঘরজামাই'এর রীতির বিরোধিতাও নজরে পড়ে। বৈবাহিক বন্ধনে জাতির সঙ্গে অর্থকে যেন দাঁড়ি-পাল্লায় ধরে ওজন করা হয় এক সুতীক্ষ্ণ বিচার-পদ্ধতিতে, যদিও এর ফলাফল প্রায় ক্ষেত্রেই দুঃখজনক হয়। অর্থের দাপটের তুলনায় জাতিগত পদমর্যাদার দাম কী, 'প্রতিহিংসা' গল্প সেটি পরিষ্কার ক'রে দেখায়।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, যে-সমাজের ছবি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন, তাতে জমি-কেন্দ্রিক অভিজাত-তন্ত্রের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে, সেই আভিজাত্যের ধর্মগত ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে অর্থের সঙ্গে পদমর্যাদা যুক্ত হয়ে চলে। মোপাসাঁ তুলে ধরেন সমাজের এক পরবর্তী পর্যায়কে, যখন অর্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে একমাত্র বিচার্য বস্তু। আর নেই সত্যকারের তেমন কোনো আভিজাত্য যাকে প্রচুর পয়সার অধিকারী সাধারণ লোকেরা কলংকিত না করতে পারে। ফ্রান্সের ক্যাপিটালিস্ট যুগে সম্পূর্ণ পদার্পণ ঘটেছে।

কি মোপাসাঁ, কি রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই এমন গল্প লিখেছেন যাকে 'অতি-প্রাকৃতে'র আখ্যা দেওয়া যায়। তাঁদের এই গল্পগুলি বেশ বিভিন্ন প্রকৃতির।

উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে প্রগতি অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতার উপরে জয় ঘোষণা করেছে বলে মনে হয়। বিশ্বজগৎ তার রহস্যগুলি হারাতে চলেছে। এমন দিন আসবে যখন সে-রহস্যের সম্পূর্ণ উদঘাটন সম্ভব হবে, তাকে পুরোপুরি জানা যাবে। তবু এমন বিশ্বাসের ফলে মানুষ তার অন্তর্জগতের সব দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়েছে বলে মনে হয় না, কখনো-কখনো এক বদ্ধ দশার ভাব বা কারাগারের ভিতরে বন্দী থাকার অনুভূতি সমানই বলবৎ থাকে। যে মর্মন্তুদ গ্লানির অভিজ্ঞতা মানুষের হয়, তা তাকে পাগল ক'রে তুলতে পারে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে আত্মহত্যার দিকে।

সুস্থতা কী ক'রে পরিণত হয় উন্মত্ততায়, তার এক বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসংগত বিবরণ মোপাসাঁ দিয়েছেন, এই ক্ষমতাটি তাঁর অসামান্য কীর্তির অন্যতম। 'ল্য অর্লা'র মতো গল্প এ-ধরনের রচনার এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। কিছু কাল মানুষ চালিয়ে যেতে পারে তার দৈনন্দিন অস্তিত্ব, অস্বীকার ক'রে 'সবকিছুর শূন্যতা', 'সব বিষয়ের ভয়ংকর দুঃখবোধ'। সে ভালোবেসে চলতে পারে নারীকে, উপভোগ করতে পারে নিদাঘ অপরাহ্নে নৌকা-চালনা বা বন্ধুজনের সঙ্গসুখে উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য। তবু একদিন, কোনো আপাত কারণ ব্যতীতই, সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে অতল গহ্বরে। সমষ্টির ক্ষেত্রে যা হয় যুদ্ধের পাগলামি, তারই অনুরূপ এই পতন ব্যক্তিগত মানুষের ক্ষেত্রে। অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাবও অজানা থেকে সহসা কিছুর তেড়ে-মুড়ে ঢুকে পড়া। রহস্যে আচ্ছন্ন হয় বাস্তবতা যখন অতি-পরিচয়ের ফলে যেসব জিনিস প্রায় অদৃশ্য থেকে যায়, তারা ভয় দেখানোর ভাবে হঠাৎ তাদের অস্তিত্ব জাহির করে। অতিপ্রাকৃতের অভিজ্ঞতা তাই দৈনন্দিন জীবনের কিনারা ঘেঁসে থাকে। উপর থেকে ঝোলা এক গাছের ডালে আঘাত খেয়ে সদ্য নিহত ভাইকে যে-শিকারী বুকে ক'রে ধরে আছে, সে হঠাৎ অসাড় হয় এমন এক ভীতির অনুভূতিতে যার সাক্ষাৎ কখনো ঘটে নি তার আগে। এমন ভীতির স্পষ্ট কারণ কিছু নেই, তবু যে-মুহূর্তে তার রূপ জাগে তার মধ্যে, সেই

মুহূর্ত থেকে আশপাশের সব কিছু তার কাছে অসাধারণ ও ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। এমন কিছু মুহূর্তেই জগৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে অতিপ্রাকৃতের ব্যাপ্তিতে।

এটা যে সত্য, তেমন দাবি কখনো করেন না লেখক। যেন এমন এক চিন্তা যার থেকে রেহাই পাওয়া যায় না, এক অলীক বস্তুর দর্শন, বিক্ষিপ্ত চিত্তের এক বিভ্রম, এই আকারেই আবির্ভাব ঘটে তার। মোপাসাঁ যেভাবে তাঁর আখ্যান সাজান, তার ফলে গোড়ার দিকে যুক্তি ও অবিশ্বাসের যুগপৎ শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। Christmas Tales (বড়দিনের গল্প রচনাটিতে কাহিনীর বক্তা যে-ডাক্তারটি, সে জানায় যে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও সে এক আশ্চর্য জিনিস ঘটতে দেখেছে। Magnetisms (চুম্বকের শক্তি)-এ বক্তা তার প্রথম গল্পটা বোঝাবার চেষ্টা করে যুক্তিসংগতভাবে, কিন্তু সম্মোহন শক্তি নিয়ে তার দ্বিতীয় গল্পের ক্ষেত্রে দেবার মতো কোনো ব্যাখ্যা সে খুঁজে পায় না, যে-কারণে সেই দ্বিতীয় গল্পটির অদ্ভুত চরিত্র আরো প্রকট হয়। একই আঙ্গিকের ব্যবহার The Hand (ছাল ছাড়ানো হাত গল্পটিতেও: বিচ্ছিন্ন হাতটা যখন দেখানো হয়, হাসি-টিটকারিতে মুখর হয় সমবেত বন্ধুরা। পরে, যে-তরুণ যুবকটি সেই হাত বহন ক'রে আনে, সে মরে দম বন্ধ হয়ে, হাতটাও মিলিয়ে যায়। ভয়ই হল অতিপ্রাকৃত গল্পে মুখ্য বস্তু। ব্যাখ্যা ক'রে একে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'কেশকলাপ' গল্পের শেষে ডাক্তার বলে, 'এমন জিনিস নেই, যার প্রতি উন্মত্ত নয় মানুষের মন।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পে কখনো-কখনো কাহিনীর বক্তাই অতিপ্রাকৃতের উপাদান ঘুচিয়ে দেয়, তার কোনো অবশেষ রাখে না। এই রকম ঘটতে দেখা যায় 'মহামায়া' এবং 'জীবিত ও মৃত' গল্পে। এসব গল্প পাঠকের মনে যে-প্রভাব ফেলে, তাতে লাগে রহস্যের রঙ, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল এক সামাজিক দুর্নীতি বা প্রথা বা কুসংস্কারকে নিন্দা করা, যে-দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট চরিত্রদের জীবনে দুঃখজনক পরিণতি আনে।

'নিশীথে' ও 'মাস্টারমশায়' গল্পে অতিপ্রাকৃত উপাদানটিকে দেখানো হয় অন্তর্লীন এক অপরাধবোধের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। প্রথম গল্পটিতে তা উন্মত্ততার দিকে চরিত্রদের ধাবিত করতে পারে। মোপাসাঁ-তে যেমন, এখানেও তেমনি, অবদমিত কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে জাত এই আচ্ছন্নকর চিন্তা হতভাগ্য চরিত্রের সচেতন সত্তাটিকে গ্রাস করে। আখ্যান যে-মানসিক যন্ত্রণার জন্ম দেয়, তাকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায় না। তাই ঘটে 'মাস্টার মশায়'-এর ক্ষেত্রে। সেখানে, অবতরণিকা অংশের শেষে যে-বিস্ময় জাগে পাঠকের মনে, তাকে স্থগিত ক'রে রাখা হয় গল্পের বাকি অংশে। ধনীর নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধতার স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের দিকেই সেই বাকি অংশের ঝোঁক।

কঙ্কাল ও ভূত নিয়ে গঠিত যে অতিপ্রাকৃত অবয়ব, তাকে 'কঙ্কাল' গল্প পরিহাসের বস্তু ক'রে তোলে। কাহিনী বলার স্বরটি আগাগোড়া এক লঘু রসিকতায়

মণ্ডিত। 'মণিহারা' আরো গম্ভীর প্রকৃতির। রহস্যের ভাব এখানে শেষ পর্যন্ত জীইয়ে রাখা হয় এবং উপসংহার যত উত্তর দেয়, তার চেয়ে বেশি প্রশ্ন তোলে অপ্রত্যাশিতভাবে। মৃতা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যধিক প্রেম এক ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে ফিরিয়ে আনে সেই স্ত্রীকে, যে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীকে হত্যা করে। যে ইস্কুল মাস্টার কাহিনীটির মুখ্য বক্তা. তার ব্যক্তিত্বে গল্পের এই দিকটা চাপা পড়ে যায়, যেন সাহিত্যিক অনুশীলন আখ্যান-বস্তুর উপর প্রাধান্য জারি করছে, এমন ধারণা জন্মায়।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে প্রথম স্থানটি নেয় এক খেলার ভাব, কোনো রহস্যের আমেজ পাঠককে স্পর্শ করে না। কাহিনী যত উন্মোচিত হয়, ততই ভয়ের বদলে এক হর্ষই জাগে, যেন সৃষ্ট হচ্ছে এক কথার জগৎ তার স্বীয় আনন্দেরই জন্যে। কোনো-কোনো বিশেষ ঘটনার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে অতি-প্রাকৃত সূচিত হয়, সেই অতিপ্রাকৃতের পূর্ণতম পরিচয় এ-গল্পে তখনই মেলে যখন বিস্ময়ানুভূতির অস্তিত্ব আর একেবারেই থাকে না।[১০]

শুনতে একটু উল্টোপাল্টা ঠেকলেও, অধ্যাত্মবাদী কবি সাহিত্যে অন্তত অতিপ্রাকৃতকে তেমন গুরুত্ব দেন না। হয় তাকে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি উড়িয়ে দেন, নয় তা নিয়ে খেলা করেন। পক্ষান্তরে বস্তুবাদী মোপাসাঁ তার মোহে আবিষ্ট হন, মৃত্যুর চিন্তা বা যে-অযৌক্তিক শক্তি মানুষকে ভয় দেখায়, তা তাঁকে টানে এক অদম্য আকর্ষণে। নিশ্চিতভাবে অর্থহীন এক জগতে মানুষ যে খাঁচায়-পোরা পাখির মতো বন্দী হয়ে আছে, এমন অনুভূতির ফলস্বরূপ জাগে উন্মত্ততা, হিংস্রতা, প্রবল উত্তেজনা।

উপসংহারে বলা চলে, মানবিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার এক বিশেষ স্থান উভয় লেখকের মধ্যেই ছিল, এবং ছোটগল্পকার হিসেবে উভয়কেই বাস্তববাদী বলে মেনে নেওয়া যায়। তাঁদের চিত্রিত সমাজ পয়সাকড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে স্বার্থসাধনে নারীদের শোষণ করা হয়। যে-পরিবেশের বর্ণনা তাঁরা করেন তার বিচক্ষণ নিরীক্ষকই তাঁরা নন, তীব্র সমালোচকও বটে। উভয়েই অন্ধ বিশ্বাস ও মূঢ়তার রূপায়ণে শ্লেষের ব্যবহার করেন। মোপাসাঁ প্রায়ই বিদ্রূপাত্মক, রবীন্দ্রনাথ ভাবপ্রবণ ও করুণা-উদ্রেককর। ছোটগল্প বলতে কী বোঝায়, সে-বিষয়ে তাঁদের মোটামুটি মিলও দেখা যায়। আঙ্গিক ও ভাবের দিক থেকে 'দেনা পাওনা,' 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'শাস্তি', 'সমস্যাপূরণ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'পুত্রযজ্ঞ' ও 'উলুখড়ের বিপদ' জাতীয় গল্পের সঙ্গে মোপাসাঁর বহু গল্পের তুলনা করা চলে। যা তাদের প্রত্যেকটিকেই বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করে, তা মহান সংযম, সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অনুভূতির তীব্রতা ও শ্লেষের কামড়। গল্পের শেষেও থাকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটু নাচিয়ে দেওয়ার মতো কিছু, যেমন মোপাসাঁয়,

তেমনি রবীন্দ্রনাথে।

অন্যদিকে, 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'সমাপ্তি' এবং 'মেঘ ও রৌদ্র' জাতীয় কিছু-কিছু গল্প রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না। যে-করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক তারা করে, তার সত্যিই তুলনা নেই।

যা তাঁদের পৃথক করে, তা নিহিত থাকে এক গভীর স্তরে। মানুষ যে সব সত্ত্বেও ভালো, এ-বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। সৌন্দর্য বা সত্য বা প্রেম অন্ধকারের সব শক্তিকে শেষ পর্যন্ত যে পরাজিত ক'রে ছাড়বেই, এ নিয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না। মানুষ মহত্তর তার শরীর থেকে, তার সীমিত জগৎ থেকে। উত্তরণ ও প্রশান্তির বাণীতে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা। তাঁর নাটকে জড়ের উপরে মানুষের আত্মার জয়ের ঘোষণা। এ-কথা সত্য যে এক হয়ত তাঁর চিত্রকলা বাদ দিলে দুঃখ-দুর্দশা, নিষ্ঠুরতা ও হীনতার যে-মানবিক নিসর্গের পরিচয় মেলে তাঁর ছোটগল্পে, তার তুলনা তাঁর অন্য রচনায় নেই। তাঁর আঁকা ছবিতে ইঙ্গিত সেই একই শ্লেষের, মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার অলিগলির উপর সেই একই আলোকপাতের। তবু এসব সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ মূলত ছিলেন মানববাদী, এক অধ্যাত্মবাদী।

শোপেনহাওয়ারের রচনা-পাঠের মধ্যে মোপাসাঁ পান তাঁর দুঃখবাদের অন্যতম উৎস। যে-যুগের অংশ তিনি, সেই যুগে ছিল সকীর্ণ এক জড়তা-ভিত্তিক অদ্বৈতবাদের জয়জয়কার। কোনো অসীমত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন না। জগৎকে পুরোপুরি এক বস্তুভিত্তিক ও বদ্ধ জায়গা হিসেবে দেখতে বাধ্য হওয়ার ফলে তার বাইরেও যে আর কিছু থাকতে পারে, তেমন প্রত্যয় অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। হয়ত অতীব সততারই কারণে বুর্জোয়া সমাজের শোভনতা ও সংস্কারের আপাত রূপটিতে তিনি ভোলেন নি, তাই নির্দয় চিত্তে বর্ণনা করতে বসেন এমন এক চতুর্দিক থেকে আবদ্ধ বৃত্তকে যেখানে শাসন চলে পাশবিক কামনা-বাসনার, লোভের ও মূঢ়তার, যেখানে কাল গিলে খায় মানুষকে।

প্রতীক হিসেবে যে একই আয়নার ব্যবহার উভয়ে করেছেন, তার মাধ্যমে তাঁদের পারস্পরিক পার্থক্যটিকে স্পষ্ট ক'রে দেখা যায়।

'ল্য অর্লা' কাহিনীর বক্তা একদিন এক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে-আয়নায় নিজেকে দেখতে পায় না। ঝকঝকে কাঁচ থাকে শূন্য, পরিষ্কার, আলোয় পূর্ণ। লোকটি তখন ভাবে, অতিপ্রাকৃত প্রাণীর অদৃশ্য শরীর তার প্রতিবিম্ব আত্মসাৎ করেছে। পরে, এক ঘোলো কুয়াশার মধ্যে যখন সে নিজের অস্পষ্ট ছবি খুঁজে পায়, তখন তার মনে হয় যে সেটা অর্লারই এক আবছা আকার। আয়না মানুষকে দেখায় তার নিজেরই শূন্যতার ছবি।

একই আয়নার ব্যবহার রবীন্দ্রনাথও করেন 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে। কিন্তু কাহিনীর বক্তা তাতে যেন এক ঝলকে প্রতিফলিত হতে দেখে মাধুর্যে মণ্ডিত

সেই দাসী কন্যাটিরই ছায়া যার পিছনে স্বপ্নাবিষ্টের ভাবে সে ছুটে বেড়ায় প্রতি রাত্রে, নির্জন প্রাসাদে। এ-ছবি সৌন্দর্যেরই, হয়ত সে-সৌন্দর্য মায়া বৈ নয়, তবু তা নয় কিছু কম মনোমুগ্ধকর।

—ইংরেজি থেকে অনুবাদ : লোকনাথ ভট্টাচার্য

উল্লেখপঞ্জি

১. 'গল্পগুচ্ছ : বিশেষ রবীন্দ্র সংকলন' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের প্রবন্ধ "গল্পগুচ্ছের পূর্বসূত্র" (পৃ ২১৬-২৬৬) এবং ডাঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের প্রবন্ধ "ছোট গল্পের বিশ্বপট ও রবীন্দ্রনাথের গল্প" (পৃ ১৬৫-১৭৬) পড়ে আমি উপকৃত বোধ করেছি।

২. Rene Godenne, *La nouvelle francaise* PUF, ১৯৭৪ ; পৃ ৮৯-৯০।

৩. ঐ, পৃ ১০৭।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', এক খণ্ডে ; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ; পৃ ৪৯।

৫. ঐ, পৃ ১৫৯।

৬. ঐ, পৃ ১৯৫।

৭. *La Maison Tellier*, Paris, Garnier-Flammarion, intr. পৃ ২৯।

৮. ঐ, পৃ ২৯।

৯. ঐ, 'Mouche' (মাছি) পৃ ২২১।

১০. রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত ছোটগল্পের বিষয়ে লিখিত ও ইতিপূর্বে 'এক্ষণ' পত্রিকায় (শারদীয় ১৩৯৪) প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও অতিপ্রাকৃত' দ্রষ্টব্য।

দেবাশিস বসু

কলকাতার পথ-নাম

সামাজিক ইতিহাসের সূত্র

এক্ষণ-এর গত সংখ্যায় (শারদীয় ১৩৯৪) আলোচিত দু'টি পথ-নামের মধ্যে একটি ছিল 'কালী বিশ্বাস লেন'। কালী বিশ্বাস লেনের প্রাণপুরুষ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের পিতৃভূমি ছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে। ঐ গ্রামেরই আর এক সুসন্তান ছিলেন মনোমোহন বসু। তাঁর নামাংকিত 'মনো-মোহন বসু স্ট্রিট'-এর সূত্র ধরেই শুরু হচ্ছে এবারের আলোচনা।

১. মনোমোহন বসু স্ট্রিট

[ওয়ার্ড—১১ ; পোঃ—৬]

হাতিবাগানের অদূরে অবস্থিত মনোমোহন বসু স্ট্রিটের নামকরণ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক কৃতী কবি ও নাট্যকারের নামে। এই রাস্তারই তিন নম্বর বাড়িটি ছিল মনোমোহনের। মনোমোহনের দুই পুত্র মতিলাল এবং প্রিয়-নাথ বসু থাকতেন যথাক্রমে দুই ও চার নম্বর বাড়িতে। আজ অবশ্য এ রাস্তায় মনোমোহনের কোনো বংশধরই আর বসবাস করেন না।

মনোমোহন বসু স্ট্রিট এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাবেক নাম ছিল 'ভাল্লুক পাড়া',[১] রাস্তাটিরও নাম ছিল 'ভাল্লুক পাড়া লেন'। প্রবীণ বাসিন্দাদের মারফত জানা গেছে যে আগে এখানে ছিল ক্রীড়াপ্রদর্শক ভালুকওয়ালাদের বিরাট বস্তি। সে জন্যই পাড়াটির নাম হয়ে যায় 'ভাল্লুকপাড়া'। ডঃ. সুকুমার সেন কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। মনোমোহনের পুত্র প্রিয়নাথ বসুর সার্কাসের বাঘ-ভাল্লুক এখানে থাকত বলেই পাড়াটির নাম হয় 'ভাল্লুকপাড়া'—এই তাঁর মত (বাংলা স্থাননাম, আনন্দ, ১৩৮৮, পৃ ৫৪)। উৎপত্তির দিক থেকে কলকাতার আর একটি পল্লীনামের সঙ্গে ভাল্লুক পাড়ার সাদৃশ্য ছিল। সে অঞ্চলটির নাম ছিল 'ডুগডুগি পাড়া'। কিন্তু 'ডুগডুগি পাড়া লেন'-এর নামটিও হারিয়ে গেছে নতুন নাম 'গোরাচাঁদ লেন'-এর অন্তরালে।

যদিও মনোমোহন ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের এক সফল শিষ্য, যদিও সমকালের সাহিত্য, সংগীত ও অভিনয়-জগতের সঙ্গে তাঁর ছিল সক্রিয় সংস্রব, তবুও তাঁর জীবনের কয়েকটি দিক আজও অনালোচিত রয়ে গেছে। তাঁর জন্ম-তারিখ ও জন্মস্থান নিয়ে গোড়া থেকেই অনেক পরস্পরবিরোধী তথ্যের সমাবেশ ঘটেছিল। সে সব বিতর্কের অবসান ঘটলেও মনোমোহনের পারিবারিক জীবনের বেশ কিছু অধ্যায় আজও অস্পষ্ট। তাঁর কৌলিক পরিচয় ও পারিবারিক পটভূমি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা না হওয়ায়, কোন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে তাঁর আগমন ঘটেছিল, সে-প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে। কলকাতা শহরে মনোমোহনের পরিবারের আগমন এবং কলকাতা-সমাজে তাঁদের উত্থান-পতনের ধারাবাহিক কাহিনী এখনো লিপিবদ্ধ হয় নি। অথচ কলকাতার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে এ প্রসঙ্গগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

মনোমোহনের পারিবারিক পরিচিতি প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার ডঃ সুবোধ চৌধুরী লিখেছেন :

> ছোট জাগুলিয়া বসু পরিবারের বংশ-তালিকা থেকে জানা যায় যে এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন দশরথ বসু ; এঁদের গোত্র গৌতম। মনোমোহন এই বংশের আদিপুরুষ দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োবিংশতি পুরুষ। এঁদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণ-চব্বিশ পরগণার মাহিনগর গ্রাম। পরবর্তীকালের এঁদের কোন একজন মাহীনগর ত্যাগ করে বারাসতের সন্নিকটে খড়ু নামক গ্রামে চলে আসেন। আরও পরে এই বংশের দশম পুরুষ চক্রপাণি বসু সন ৮৯২ সালে ছোট জাগুলিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন।[২]

শ্রী চৌধুরীর মতানুসারে ছোট জাগুলিয়ার বসু বংশের গোত্র গৌতম এবং আদিপুরুষ দশরথ বসু। দশরথ বসু কিন্তু শুধু ছোট জাগুলিয়ার বসু বংশের আদি পুরুষ নন, তিনি বাংলার তাবৎ কায়স্থ বসুদের আদিপুরুষ।[৩] বাংলার সমস্ত কায়স্থ বসু গৌতম গোত্রীয় দশরথের বংশধর বলেই কায়স্থ বসু মাত্রেরই গোত্র গৌতম। শ্রী চৌধুরী আরও লিখেছেন যে মনোমোহন বসু হলেন দশরথের অধস্তন ত্রয়োবিংশ পুরুষ। বসু বংশের প্রথম পুরুষ হলেন দশরথ। অন্যদিকে মনোমোহন হলেন বসুবংশের একটি বিশেষ শাখার ত্রয়োবিংশ পুরুষ। কাজেই মনোমোহন দশরথের অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ, 'অধস্তন ত্রয়োবিংশতি' পুরুষ নন। সুবোধবাবুর দেওয়া বাকি প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। তারও আগে দরকার বসু-পরিবারের বংশ-লতিকাটি দেখে নেওয়া।

১. দশরথ বসু—২. কৃষ্ণরাম—৩. ভবনাথ—৪. হংসেশ্বর—৫. মুক্তিরাম—৬. দামোদর—৭. অনন্তরাম—৮ গুণাকর—৯ মাধব—১০. চক্রপাণি—১১ ধ্রুব ১২. কৃষ্ণনাথ—১৩. গোবিন্দরাম—১৪. শ্রীধর—১৫. শ্রীকান্ত—১৬. কামদেব ১৭. বাসুদেব (বংশী)—১৮. রাজীবলোচন—১৯. রাজারাম—২০. রামকানাই

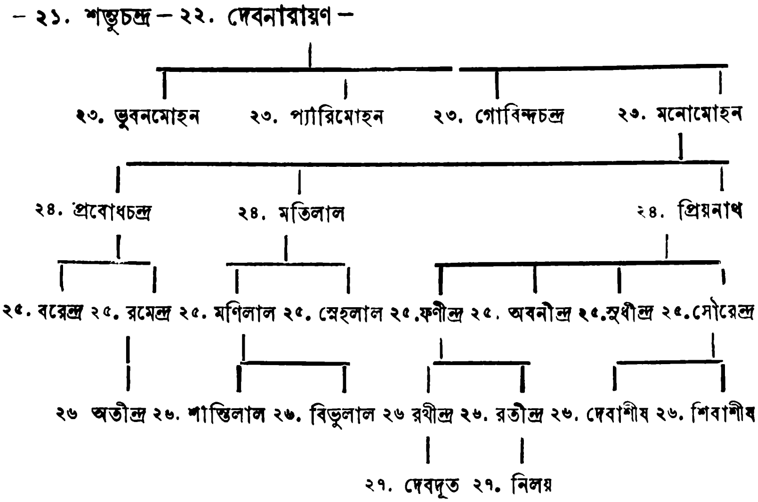

কুলশাস্ত্রের মতে, গৌড়াধিপতি রাজা আদিশূরের যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে পাঁচ-জন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন কায়স্থ কনৌজ থেকে বাংলায় আসেন। দশরথ বসু ছিলেন সেই পঞ্চকায়স্থের অন্যতম। তাঁর দুই পুত্র — কৃষ্ণরাম এবং পরমানন্দ। কনিষ্ঠ পরমানন্দ বঙ্গদেশে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) বাসস্থাপন করেন বলে তাঁর উত্তর-পুরুষরা অভিহিত হন 'বঙ্গজ' নামে। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণরাম রাঢ়দেশের দক্ষি-ণাংশে বসবাস করায় তাঁর বংশ-পরম্পরা 'দক্ষিণরাঢ়ীয়' আখ্যা লাভ করে। কৃষ্ণরামের পৌত্র হংসেশ্বর বসুর ছিল তিন পুত্র—শক্তিরাম, মুক্তিরাম এবং অলংকার। শক্তি ও মুক্তি বল্লাল সেনের কাছ থেকে কৌলিন্য লাভ করেন। কিন্তু কনিষ্ঠ অলংকার বসু সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন। প্রতিবাদে তিনি পূর্ব বাংলায় চলে গিয়ে বঙ্গজ-সমাজে যোগ দেন। কৌলিন্য লাভের পর শক্তি ও মুক্তি যথাক্রমে হুগলি জেলার বাগাণ্ডা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাহিনগরে বসবাস করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুরা সেই থেকে দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান — 'বাগাণ্ডার বসু' এবং 'মাহিনগরের বসু'।[8]

আদিশূরের কাহিনী এবং বল্লাল সেনের কৌলিন্য দানের যে বিবরণ কুলশাস্ত্র-গুলিতে বর্ণিত হয়েছে, তার ঐতিহাসিকতা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ পোষণের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আদিশূরের যজ্ঞে আগত আদিপুরুষ এবং প্রথম কৌলিন্য-প্রাপকদের মধ্যবর্তী পুরুষদের নাম নিয়ে কুলগ্রন্থগুলির মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু কৌলিন্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পর থেকে বংশাবলির তথ্যগুলি অনেক বেশি স্বচ্ছ ও বিরোধহীন।

মুক্তিরাম বসুর সময় থেকে তাঁর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মাধব বসুর আমল পর্যন্ত

মাহিনগরের বসু বংশের বিশেষ বিস্তার ঘটে নি। মাধব বসুর সাত পুত্র থেকে বংশটি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এই সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণ, মধ্যম চক্রপাণি এবং ষষ্ঠ শ্রীপতি বসুর বংশ বিস্তৃত ও বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি মালাধর বসু ছিলেন শ্রীপতির প্রপৌত্র। নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রাজা সুবোধ (বসু) মল্লিক, স্যার দেবপ্রসাদ (বসু) সর্বাধিকারী লক্ষ্মণের বংশজাত। মনোমোহনের পরিবার, অর্থাৎ ছোট জাগুলিয়ার বসু বংশ, মাধব বসুর মধ্যম পুত্র চক্রপাণি থেকে উদ্ভূত।

ছোট জাগুলিয়ার বসু পরিবারে একটি কিংবদন্তি আছে যে চক্রপাণি বসুই প্রথম ঐ গ্রামে এসে বসতি করেন। ডঃ সুবোধ চৌধুরী তাঁর তথ্যসূত্র জানান নি, তবু অনুমানে মনে হয় তিনি এই জনশ্রুতিকেই অনুসরণ করেছেন।[৫] কিন্তু এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া শক্ত। চক্রপাণির বংশধররা বাংলার বহু গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। ঋষি রাজনারায়ণ, স্যার কৈলাসচন্দ্র বসু, সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু থেকে শুরু ক'রে বিশ্বভারতী-র উপাচার্য নিমাইসাধন বসু পর্যন্ত অনেক সুপরিচিত ব্যক্তিই চক্রপাণির বংশধর। চক্রপাণির জাগুলিয়া বাসের কথা মেনে নিলে বলতে হয় যে এই সব ব্যক্তির প্রত্যেকের পূর্ব পুরুষই আদিতে ছিলেন ছোট জাগুলিয়ার বাসিন্দা। কিন্তু এ কথার সমর্থন এঁদের কুলজি থেকে মেলে না। ছোট জাগুলিয়ার বসু বংশের মুদ্রিত বংশ-লতিকাগুলিও এই সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

শ্রী চৌধুরীর মতে, চক্রপাণির পূর্ব বাসস্থান ছিল খড়ুগ্রামে। তাহলে ধরে নিতে হয় যে মুক্তিরাম এবং চক্রপাণির মধ্যবর্তী চার পুরুষের যে কোনো একজন মাহিনগর থেকে খড়ুতে চলে এসেছিলেন। একথা সত্যি হলে পশ্চিম বাংলার প্রায় অর্ধেক বসুর আদি নিবাস দাঁড়ায় খড়ুতে। অথচ কুলজি-সাহিত্যে এ সমাজস্থানটির নাম অনুল্লিখিত।

মাহিনগরের বসু বংশের বিভিন্ন শাখার বংশ-তালিকা এবং কুলগ্রন্থগুলির বিবৃতি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের যে ধারণা হয়েছে সেকথা এবার আলোচনা করা যাক। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার কায়স্থদের, বিশেষত মাহিনগরের বসুদের, স্বর্ণযুগ ছিল পাঠান আমল। পাঠান আমলে এই বংশের সদস্যরা পেয়েছিলেন উচ্চপদ এবং উপাধি। এভাবেই মাহিনগরের গোপীনাথ বসু হয়েছিলেন 'পুরন্দর খাঁ', কবি মালাধর বসু হন 'গুণরাজ খাঁ'। মালাধরের পিতামহ যজ্ঞেশ্বর (যোগেশ্বর) অবশ্য মাহিনগর ছেড়ে আগেই ডেরা বেঁধেছিলেন বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। কিন্তু অধিকাংশ শাখাই তখনো মাহিনগরে বসবাস করছিল। মোগল-পাঠান যুদ্ধে মাহিনগরের বসু বংশীয়রা পাঠান প্রভুদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাই পাঠানদের পরাজয়ে তাঁদের সৌভাগ্যও অস্তমিত হয়। মোগল বিজেতাদের হাত থেকে ধন ও ধর্ম রক্ষার তাগিদে মাহিনগর ছেড়ে তাঁরা পালিয়ে যান স্থলপথ ও জলপথ থেকে দূরে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে।[৬] এই পলায়ন-কাহিনী

মাহিনগরের বসু বংশের অনেক শাখায় লোকশ্রুতির আকারে প্রচলিত ছিল।

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আদি বাড়ি ছিল হরিণঘাটার নিকটবর্তী বড় জাগুলিয়া গ্রামে। ছোট জাগুলিয়ার বসুদের মতো বড় জাগুলিয়ার বসুরাও আদতে 'মাহিনগরের বসু'। মাহিনগর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কাহিনীটি যে বড় জাগুলিয়ার বসু পরিবারে কিংবদন্তির আকারে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ মেলে সত্যেন বসুর একটি উক্তিতে। নিজের কুল-পরিচয় সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন :

> শোন, আমাদের দেশ ছিল এখন যেটা কল্যাণী ইউনিভারসিটি – তার কাছে বড় জাগুলিয়া…গ্রামের কাছে মথুরার বিল…ওইখানেই পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ১৬-১৭ শতাব্দীতে – একটা জেনেরাল এক্সোডাস হয়েছিল।[৭]

উক্তিটির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মাহিনগরকে অভিহিত করেছেন 'দক্ষিণ' বলে, কারণ মাহিনগর গ্রামটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত। মাহিনগর থেকে যিনি প্রথম বড় জাগুলিয়ায় পালিয়ে যান, তিনি ছিলেন বসু বংশের চতুর্দশ প্রজন্মের সদস্য।[৮]

চক্রপাণির বংশের একটি বিশেষ শাখার পঞ্চদশ প্রজন্মের সদস্য ছিলেন শ্রীকান্ত বসু (চক্রপাণির অধস্তন পঞ্চম পুরুষ)। এই শ্রীকান্তের বংশধররাই শুধু ছোট জাগুলিয়ায় ছিলেন বা আছেন। চক্রপাণির বংশের অন্য কোনো শাখার কোনো উত্তর পুরুষের হদিশ জাগুলিয়ায় পাওয়া যায় নি। তাই মনে হয়, শ্রীকান্ত বসু বা তাঁর পিতা শ্রীধর-ই প্রথম ঐ গ্রামে এসে বসতি করেন। শ্রীধর-শ্রীকান্তের সময় মোগল পাঠান সংঘর্ষের সময়ের সঙ্গে মিলে যায়। কাজেই একথা অনুমান করা অসংগত নয় যে সত্যেন্দ্রনাথ-কথিত 'এক্সোডাস'-এর ফলেই তাঁরা ছোট জাগুলিয়ার মতো পাণ্ডব-বর্জিত অঞ্চলে সরে যান।

মোগল আমল দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কায়স্থ বংশের পক্ষে ছিল অস্বস্তির যুগ। তাই মোগলযুগের অবসানে এবং ইংরেজ শাসনের অভ্যুদয়ে তাঁদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়েছিল। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় সেই কায়স্থ-অভ্যুত্থানের ছবি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে :

> মুঘল-বিজয়ের সময়থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল অনেক ব্যবধান। কায়স্থরা পাঠানদের সঙ্গে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন এবং সে সংগ্রামে পরাজিত হবার ফলে তাঁরা ভূম্যধিকারী আসন থেকে বিচ্যুত হলেন। মানসিংহের নির্দেশে মুঘলরা হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের দাঁড় করাল কায়স্থদের বিরুদ্ধে। এই শ্রেণীসংগ্রামে কায়স্থরা পরাজিত হলেন।… কিন্তু ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থরা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বেশ সমৃদ্ধিলাভ করেছিলেন। এভাবেই

কলকাতায় কায়স্থদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেল। কিন্তু কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এই কায়স্থদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ-রাঢ় শ্রেণীভুক্ত। পরবর্তীকাল ইংরেজীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইংরেজীভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। অতীতে যেমন ফার্সী ভাষায় তাঁদের ব্যুৎপত্তি ছিল, বর্ত্তমানেও তেমনি ইংরেজী ভাষায় তাঁরা দক্ষ হলেন। উদারনৈতিক গোষ্ঠীর উদ্ভব হল। এই গোষ্ঠীই ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কার কার্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল।[৯]

কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হওয়ার ফলে অন্যান্য কায়স্থ পরিবারগুলির মতো ছোট জাগুলিয়ার বসুদেরও দুঃখরাত্রির অবসান হল। বিবর থেকে বেরিয়ে এসে ইংরেজদের অধীনে ঠিকাদারি বা চাকরি নিয়ে তাঁরা দেখলেন বিত্তের মুখ। আজও ছোট জাগুলিয়ায় গেলে দেখা যাবে অসংখ্য ভগ্নপ্রায় ঠাকুরদালানযুক্ত বাড়ি। গঠনকৌশলের নিরিখে সেগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে নির্মিত বলে মনে হয়। পারিবারিক কাগজ-পত্রও এই নির্মাণকালের সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। একই সময়ে ছোট জাগুলিয়ায় এতগুলি বিশাল বাড়ি স্থাপনার পিছনে নিশ্চয়ই কাজ করেছিল এক সদ্যলব্ধ সমৃদ্ধিপুষ্ট আবেগ। এই আবেগের স্পর্শে ছোট জাগুলিয়ার সমগ্র চেহারাটাই পালটে গিয়েছিল, আর দশটা গ্রামের থেকে তার বহিরঙ্গ হয়ে গিয়েছিল আলাদা। সেই জন্যই ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন :

> …মামাদের দেশ ছোট জাগুলে গ্রামে গিয়েছিলুম। দেখেছিলুম সে গ্রাম আমাদের গোতানের মতো গ্রাম নয়। অনেকটা সহরের বা সহরতলীর মতো। সবই প্রায় দালানবাড়ী। বাঁধানো গলিপথ। অনেকের আবার বাড়ীর সঙ্গে বাগান। কারো যে চাষবাস আছে এমন চিহ্ন মেলেনি।[১০]

অনেক শখ ক'রে বাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু প্রয়োজনের চাপে শেষরক্ষা হয়ে ওঠে নি। কলকাতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, ইংরেজ নিয়োগকারীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং কলকাতার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সন্তান-সন্ততিদের পড়ানোর তাগিদ ছোট জাগুলিয়ার বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলিকে ধীরে ধীরে স্থানচ্যুত করে। যাঁদের সংগতি ছিল, তাঁরা সকলেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন কলকাতায়। নাড়ির যোগ ছিন্ন হওয়ার ফলে দেশের অবহেলিত ভদ্রাসন, ঠাকুরদালান বা দেবালয় পা বাড়াতে থাকে অবশ্যম্ভাবী অবলুপ্তির দিকে। এভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মনোমোহনের পৈতৃক ভিটা ও ঠাকুরদালান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে, ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে, স্বাভাবিকভাবেই ছোট জাগুলিয়ার সব ক'টি পরিবার বা বসুদের সমস্ত শরিক একই সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করতে পারেন নি। উচ্চপদস্থ আত্মীয়দের

সহায়তায় পশ্চাদ্‌পর শরিকরাও পরে ইংরেজের অধীনে চাকরি সংগ্রহ করেন। তবে সে জন্য অনেককেই যেতে হয়েছিল সুদূর প্রবাসে। মনোমোহন বসুর ডায়েরিতে তাঁর এই সব প্রবাসী জ্ঞাতিদের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বইটির 'পরিচায়িকা'-য় ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন :

> ডায়েরিটির আরও একটি মূল্য আছে; বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচকের পক্ষে। একদা যে এলাহাবাদে কলিকাতা ও বারাসত-নিবাধুঁই অঞ্চলের কায়স্থদের যে বড়ো উপনিবেশ ছিল সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য নিহিত আছে ডায়েরিটিতে।[১১]

বারাসত অঞ্চলের মানুষ যে শুধু এলাহাবাদেই ভাগ্যান্বেষণে হাজির হয়েছিলেন, তা নয়। মনোমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর লেখা থেকে জানা যায় যে রাওয়ালপিণ্ডি, লক্ষ্ণৌ, পেশোয়ারেও তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন।[১২] এঁরা প্রধানত ছিলেন মিলিটারি পে-অফিস বা কমিসারিয়েটের কেরানি। সেই জন্যই তাঁরা থাকতেন ক্যানটনমেণ্ট-যুক্ত শহরগুলিতে। ভারতের অন্যান্য অংশে তখনো ইংরেজিশিক্ষা ফলাও হয়ে ওঠে নি, তাই সারা ভারতের করণিকতন্ত্রে বাঙালির ছিল একচেটিয়া প্রবেশাধিকার।

মনোমোহনের আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং পরিচিত গোষ্ঠীর জন্য ইংরেজ-শাসন সৌভাগ্য বহন ক'রে এনেছিল। সরকারি আমলাতন্ত্রের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা পেয়েছিলেন জীবিকার সন্ধান। ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী মধ্যবিত্ত সমাজের সদস্য হয়ে ইংরেজ রাজত্বের সুফলগুলিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা মনোমোহনের পক্ষে ছিল অসম্ভব। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মিলনলগ্নে অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীই যে স্ববিরোধে ভুগেছিলেন, মনোমোহনও ছিলেন সেই দোটানায় আক্রান্ত। হিন্দু-মেলার হোতা হিসাবে একদিকে তিনি ছিলেন বৈদেশিক শোষণের বিরুদ্ধে মুখর, আবার অন্যদিকে তিনি ছিলেন মহারানী ভিকটোরিয়ার অনুরাগী। একদিকে পারিবারিক উত্তরাধিকার এবং অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মাদনা—এই দুই বিপরীতমুখী আকর্ষণের দ্বন্দ্ব মনোমোহনের চরিত্রে আরোপ করেছিল এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য।[১৩]

মাতৃকুলের দিক থেকেও মনোমোহন ছিলেন একই ধারার উত্তরাধিকারী। তাঁর মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন নিশ্চিন্তপুরের দুর্গাচরণ মিত্রের কন্যা। কলকাতার জেনারাল পোস্ট অফিসের খাজাঞ্চী ছিলেন দুর্গাচরণ।[১৪] নিশ্চিন্তপুরে দুর্গাচরণের বড়িটি ছিল তিন-চার মহলা। সঙ্গে ছিল চণ্ডীমণ্ডপ, খামার, বাগান ইত্যাদি।[১৫] মনোমোহনের পিতা দেবনারায়ণ বসু এই ক্ষমতাবান শ্বশুরের সুপারিশেই ডাকবিভাগের ঠিকাদারি পেয়েছিলেন।[১৬] সে ঠিকাদারি প্রসারিত ছিল কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত। চিঠিপত্র বিলি করার জন্য লোকলস্কর এবং যানবাহন

নিয়োগ ক'রে কাজ নির্বাহের দায়িত্ব ছিল দেবনারায়ণের। এর জন্য তিনি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ পেতেন।[১৭] কর্মক্ষেত্রে তিনি যখন দ্রুত উন্নতি করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়। মনোমোহনের বয়স তখন মাত্র তিন বছর।[১৮]

দেবনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই চন্দ্রশেখর বসু তাঁর পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ঢাকা অঞ্চলে ঠিকাদারি লাভ করেন।[১৯] মনোমোহনের শৈশবে চন্দ্রশেখরের ছিল দারুণ প্রতিপত্তি।[২০] কিন্তু তিনি বোধহয় বেশিদিন ডাকের ঠিকাদারি করেন নি। পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন নিমতলার শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীর দেওয়ান।[২১] চন্দ্রশেখরই প্রতিপালন করেছিলেন পিতৃহীন মনোমোহনকে। চন্দ্রশেখর তিনবার বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কোনো সন্তান হয় নি। তাই মনোমোহন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা চন্দ্রশেখরের সম্পত্তির একাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

মনোমোহনের জন্মতারিখ ও জন্মস্থান নিয়ে যে প্রথম থেকেই বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, সে কথা আমরা আগেই জেনেছি।[২২] মনোমোহন কিন্তু নিজেই তাঁর ডায়েরিতে পরিষ্কারভাবে তাঁর জন্মকাল লিখে রেখেছিলেন :

> খৃঃ অব্দ ১৮৮৬। এক্ষণে আমার বয়ক্রম ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর ৪ চারি মাস যেহেতু সন ১২৩৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম রথের পর দ্বিতীয় রথের মধ্যে যে বুধবার সেই বুধবারে আমার জন্ম। তিথি ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শুক্লা পঞ্চমী। ঠিকুজি ছিল, হারাইয়া গিয়াছে।[২৩]

আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে রসসিক্ত ভাষায় মনোমোহন নিজের জন্মকাহিনী বর্ণনা করেছেন :

> সপ্তদশ ত্রিপঞ্চাশৎ শকাব্দাঃ, আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমী, শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের প্রথম বিমান যাত্রার দুই দিবসান্তে, ঘোরা, গভীরা, জলধর পটলাবৃতা, তাহাতে যেন তিমিরাবগুণ্ঠনধারিণী যামিনী ঠাকুরাণী প্রথম দশদণ্ড পতিসোহাগিনী থাকিবার পর এক্ষণে বিরহিণী, সুতরাং নিতান্ত বিষাদিণী হইয়া মুখ আঁধার করিয়া রহিয়াছেন ; হেন কালে টিপ্‌ টিপ্‌ নি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন অশ্রুপাত করিলেন ! তাঁহার অন্তরের তাপ জানিতে পারিয়া অনুচর বাহুড় ভায়া তিন্তিড়ী শাখা ছাড়িয়া বিশাল দুটী পাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে লাগিল, তাঁহার চিত্ত বিনোদনার্থ চির-সখা পেচক মহাশয় মধুর স্বরে গান যুড়িয়া দিলেন ; সানায়ের যুড়ি যেমন বিরাম ব্যতীত একঘেয়ে পোঁ শব্দ ছাড়িতে থাকে, গায়ক প্রধান পেচকের সঙ্গে ঝিল্লিও তেমনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত স্বর সংযোগ করিল। গ্রাম্য চোর, চৌকীদারের সহিত ভাগের বন্দোবস্ত করিয়া সচকিত অতি ত্রস্ত সন্ধি-শলাকা (সিঁধকাটী) হস্তে আস্তে আস্তে গৃহস্থের গবাক্ষ নীচে দাগ দিতেছে, সেই শুভ লগ্নে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মাতামহ ভবনে কর্কট রাশিতে আমি (কেঁড়েল) ধরণী পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া 'ট্যাঁ ট্যাঁ,

করিয়া কাঁদিয়াছিলাম। আমি চতুর্থ গর্ভের সন্তান। এই আমার জন্মবৃত্তান্ত বা জন্মকোষ্ঠী।[২৪]

মনোমোহনের বাল্যশিক্ষা সমাধা হয়েছিল ছোট জাগুলিয়ায় এবং নিশ্চিন্তপুরে। তারপর তাঁকে নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। ছাত্রজীবনেই তাঁর সাহিত্যচর্চার উদ্বোধন ঘটে। তিনি যখন জেনারাল অ্যাসেম্বলি'জ ইন্সটিটিউশনের ছাত্র, তখনই 'ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য' শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধ লিখে তিনি পুরস্কারলাভ করেছিলেন।[২৫] এই ঘটনার অনতিপরে মনোমোহনের সঙ্গে কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় হয় এবং তিনি গুপ্তকবির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২৬] কাকা চন্দ্রশেখর বসু প্রথমে মনোমোহনের এ সাহিত্যপ্রীতিকে সুনজরে দেখেন নি। কিন্তু চারিদিকে মনোমোহনের প্রশংসা শুনে পরে তিনি তাঁর মত বদলান।[২৭]

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হয়েও মনোমোহন এই সময়ে (১৮৪৯-৫০) একবার তাঁর সঙ্গে দ্বৈরথে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। সে ঘটনাটির প্রসঙ্গে মনোমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র লিখেছেন:

> ইহার মধ্যে আর একটী অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় কবিবরের সাহিত্য জগতে উন্নতির পথ আরও সুপরিষ্কৃত হইল। তাঁহার আবাল্য সখা, সম্পর্কে শ্যালক, পরে কলিকাতার প্রথিতনামা Ernsthushan Oysterler কোম্পানীর book-keeper ৺ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সহিত বালকোচিত চপলতার বশবর্তী হইয়া ৺কাশীধামে যাত্রার সুযোগ উপস্থিত হইল। ...তথায় গিয়া দেখেন যে বাঙ্গালীটোলায় ৺গুপ্তকবির তখন খুব পসার। ৺গুপ্তকবিকে পাইয়া তথাকার বাঙ্গালীরা একেবারে একটী সঙ্গীত সংগ্রামের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন কিন্তু ৺গুপ্তকবির সহিত প্রতিযোগিতা সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে কেহই সাহসী হইলেন না। মনোমোহনকে পূর্ব্ব হইতেই ৺গুপ্তকবি প্রিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সেই সংগ্রামের দুই একটী বিশিষ্ট পাণ্ডাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে আমার এক প্রিয় শিষ্য ৺ধামে সমুপস্থিত। তোমরা তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারিলে আমার কোন আপত্তি নাই।...মনোমোহন প্রথমেই এ প্রস্তাব শ্রবণে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সখা ৺ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের অকাট্য যুক্তি ও উৎসাহজনক প্ররোচনায় পরিশেষে সম্মত হইলেন। ...পরিশেষে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ৺গুপ্তকবি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় প্রিয় শিষ্যের হস্তে পরাস্ত স্বীকার করিলেন; কবি মনোমোহন তখন গলদঘর্ম্ম কপোলে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই বিস্তীর্ণ সংগ্রামক্ষেত্রে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ৺গুপ্তকবি সাদরে বিনম্র যুবকের মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "আমার আশীর্ব্বাদে তুমি প্রতি সঙ্গীত সংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়ী হও।"[২৮]

মনোমোহনের ডায়েরি থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু বাড়তি তথ্য পাওয়া যায়। এই

কবির লড়াইয়ে দুই পক্ষের নাম ছিল 'কাশীবাসী দল' এবং 'মথুরাচ্ছত্রের দল'। ঈশ্বর গুপ্ত গান লেখেন কাশীবাসীদের জন্য, আর মনোমোহন হন মথুরাচ্ছত্রের বাঁধনদার।[২৯]

বিজয়ী শিষ্যের প্রতি বিজিত গুরু যে আশিস বর্ষণ করেছিলেন, তা উত্তরকালে সার্থক হয়েছিল। মোহনচাঁদ বসু এবং ঈশ্বর গুপ্তের ধারার সফল সংরক্ষক হয়েছিলেন মনোমোহন। হাফ-আখড়াই এবং দাঁড়া-কবির লড়াইয়ের প্রতি তৎকালীন কলকাতার ধনিক-সমাজের ছিল দারুণ ঝোঁক। বিভিন্ন ধনীগৃহের সংগীত-সংগ্রামে মনোমোহন অংশগ্রহণ ক'রে যশোলাভ করেছিলেন। নিচের তালিকা থেকে সে কথা বোঝা যাবে।

১. ১২৭৪ বঙ্গাব্দের সরস্বতী পুজোর রাতে হোগলকুঁড়ের শিবচন্দ্র গুহের[৩০] বাড়িতে হাফ-আখড়াইয়ের লড়াই হয়। বিবদমান দুই পক্ষ ছিল কাঁসারিপাড়া এবং শ্যামপুকুরের দল। মনোমোহন কাঁসারিপাড়ার জন্য গান বেঁধেছিলেন। সে গানের গুণে শ্যামপুকুর-দল নিজে থেকেই হার স্বীকার করেছিল।[৩১]

২. ১২৮৬ বঙ্গাব্দের সরস্বতী পুজোর রাতে বড়বাজারের রামমোহন মল্লিকের[৩২] বাড়িতে ভবানীপুর এবং বাগবাজার দলের মধ্যে হাফ-আখড়াই যুদ্ধ হয়। সে সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। একটি গান (চিতেন – 'না জেনে গিয়েছি আগে, শেষে বুঝেছি কালার ফাঁদ') কৃষ্ণদাসকে এত মুগ্ধ করেছিল যে গানটির একটি কপি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বাগবাজারের বাঁধনদার মনোমোহনকে তিনি অনুরোধ করেন। বড়বাজারের এই আসরে জিতে বাগবাজারের দল যায় কালীঘাটে পুজো দিতে। সেদিন (২ চৈত্র, ১২৮৬ ব.) সন্ধ্যায় সেবায়েত হালদারদের অনুরোধে দেবালয়ের নাটমন্দিরে একতরফা হাফ-আখড়াই গেয়েছিলেন তাঁরা। সখী সংবাদের সুরে কালীর স্তব বসিয়ে সেদিনের গান রচনা করেছিলেন মনোমোহন।[৩৩]

৩. ১২৮৩ বঙ্গাব্দের পঞ্চম দোলের রাতে পাথুরিয়াঘাটায় যদুলাল মল্লিকের[৩৪] বাড়িতে কাঁসারিপাড়ার ধর্তা এবং জোড়াসাঁকোর উত্তর নিয়ে বসেছিল হাফ-আখড়াইয়ের আসর। ধর্তা লিখেছিলেন মনোমোহন।[৩৫] ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ৬ বৈশাখ রাতে আবার যদুলালের বাড়িতে লড়াই হয়েছিল। এবার ধর্তা ছিল জোড়াসাঁকোর, উত্তর ছিল বাগবাজারের। এই আসরে উত্তর বেঁধেছিলেন মনোমোহন। কিন্তু জোড়াসাঁকোর দলের গাওয়া গানে নাকি কবিগানের রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়েছিল। তাই নিয়ে সভায় তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। শেষে উভয় পক্ষ থেকে কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সালিশী মানা হয়। তাঁরা একবাক্যে বাগবাজারকে জয়ী ঘোষণা করেছিলেন।[৩৬]

৪. ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ, সরস্বতী পুজোর রাতে শোভাবাজারে রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের[৩৭] বাড়িতে আবার জোড়াসাঁকো এবং বাগবাজারের দল মুখো-

মুখি হয়। এবারেও বাগবাজারের উত্তর বাঁধেন মনোমোহন। এই লড়াইয়ে জিতে বাগবাজারের দল পুজো দিতে যায় খড়দার শ্যামসুন্দরের মন্দিরে। কালীঘাটের মতো শ্যামসুন্দরের নাটমন্দিরেও তাঁরা হাফ-আখড়াই গেয়েছিলেন।[৩৮]

৫. ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৩ কার্তিক, জগদ্ধাত্রী পুজোর রাতে বাগবাজারের নন্দলাল বসুর[৩৯] বাড়িতে ভবানীপুর এবং বাগবাজারের হাফ-আখড়াই হয়। বাগবাজারের উত্তর লিখে দেন মনোমোহন।[৪০]

৬. ১২৭৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়াবাগানের এক সখের কবি-দল একটি গ্রাম্যদলের সঙ্গে দাঁড়াকবির লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। মনোমোহন গোয়াবাগান-দলের জন্য কয়েকটি গান বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে আসরে উপস্থিত হন নি। তবুও গোয়াবাগান দলের লড়াই করতে অসুবিধা হয় নি, চাপান-উতোরের সময় কোনো গানের পরিবর্তনসাধনও করতে হয় নি।[৪১]

৭. ১২৭৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক পুজোর রাতে সিমলার ঈশ্বরচন্দ্র নানের[৪২] বাড়িতে গোয়াবাগান-দল পানিহাটির দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াকবির প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। মনোমোহন গোয়াবাগানের জন্য চারখানি উত্তরী গান বেঁধে দিয়েছিলেন।[৪৩] এই গোয়াবাগানের দলই ১২৭৭ বঙ্গাব্দের সরস্বতী পুজোর রাতে আহিরিটোলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল বাকসাড়ার দলের সঙ্গে। এই দুই দলের দ্বিতীয় দ্বৈরথ অনুষ্ঠিত হয় ১২৭৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক পুজোর রাতে। এ দুবারও মনোমোহন গান লিখে দিয়েছিলেন গোয়াবাগানের জন্য। শেষবারের শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন অভিধানকার তারানাথ তর্কবাচস্পতি। গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তিনি সভার মধ্যেই মনোমোহনকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।[৪৪]

৮. ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জগদ্ধাত্রী পুজোর রাতে ভবানীপুরে গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির কবির লড়াইয়ে বাকসাড়া-নপাড়ার ছিল ধর্তা, আর ভবানীপুরের ছিল উত্তর। মনোমোহন নপাড়ার জন্য গান বেঁধেছিলেন।[৪৫]

মনোমোহন যে শুধু কবির লড়াইয়ের জন্যই গান বেঁধে দিতেন, তা নয়। অনেক সময়ে উৎসবের উপরোধেও তাঁকে সংগীতরচনা করতে হয়েছে। ১২৬৪ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতি বছর ছোট জাগুলিয়ার সখের দলের জন্য মনোমোহন রথের সময় দু'টি করে গান বেঁধে দিতেন। ১২৭০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত এ রীতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১২৭১ বঙ্গাব্দে প্রথম রথটিতে গান হয় নি, শুধু উল্টোরথে হয়েছিল।[৪৬] ১২৯২ বঙ্গাব্দে কুমোরটুলির কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের গৃহদেবতার রথে সংকীর্তনের জন্য তিনি দু'টি গান লিখে দিয়েছিলেন। সংকীর্তন করেছিল 'বাগবাজার বান্ধব সমাজ'।[৪৭] গড়পার[৪৮] এবং কাঁসারিপাড়ায়[৪৯] নগর-সংকীর্তনের জন্যও তিনি গোষ্ঠলীলা ও উদ্ধব-সংবাদের গান রচনা করেছিলেন। বৌবাজার নেড়া-গির্জার রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়িতে[৫০] ঝুলনের সময় সংগীত-উৎসব হতো। এই উৎসবের জন্যও একবার মনোমোহন বেশ কিছু গান লিখে

দিয়েছিলেন।[৫১]

প্রতি বছর সাড়ম্বরে রথযাত্রা উদ্‌যাপনের যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল ছোট জাগুলিয়ায়, এক সময়ে তা সংক্রামিত হয় কলকাতাতেও। জাগুলিয়ার যে সব বাসিন্দা কলকাতায় ঘর বেঁধেছিলেন, তাঁরাই ছিলেন এই রথোৎসবের উদ্যোক্তা। এক্ষণ-এর বিগত সংখ্যায় কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছিল। সেই কালীপ্রসন্নের পুত্র প্রমথনাথ বিশ্বাসকে লেখা মনোমোহনের একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে বিষয়টি জানা গেছে। জীর্ণ ও ভঙ্গুর চিঠিটির চারটি শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেই স্থানগুলিতে তারকা চিহ্ন বসিয়ে চিঠিটি উদ্ধৃত করা হল :

আষাঢ় ১৩০৩ সাল।
Manomohan Library,
203-2 Cornwallis Street,
Calcutta.

**আশীর্ব্বাদ জানিবে—

মধ্যাহ্নে গোষ্ঠ আসিয়াছিল, তাহাতেই বুঝিলাম যে, তোমরা রথের গানের নিমিত্ত যথার্থই উৎসাহী ও উদ্যোগী হইয়াছ। কিন্তু তবু তোমাদের মুখে পাকা না শুনিয়া এবং who will stand security or rather who will be responsible for payments ইটী ঠিক না জানিয়া খুলিকে (খোলবাদক —দে. ব.) বায়না এবং গায়ক সকল সংগ্রহ করিতে পারি না। তোমাদের দুই ভাইয়ের একজন বা উভয়েই এরূপ দায়িত্ব স্বীকার না করিলে কার্য্য হইবে না। আমাদের সমবয়স্ক প্রায়ই গতাসু পুর্ব্বে [sic] যাহাদের জোরে আমি একাজ নির্ব্বাহ করিতাম তাহারা গত অথবা যাঁহারা আছেন তাঁহাদের প্রায় না থাকাই সমান। বিশেষ এখন বৃদ্ধ অতএব চাঁদা আদায়ের ভার আমি কি রাজমোহন লইতে পারিব না।

আমার লাইব্রেরির ঠিক সম্মুখে উত্তম আখড়ার স্থান আছে, কয়দিনের ভাড়া দিতে হইবে। যদি তোমার জেলেটোলার বাটী খালি না থাকে তবে এই স্থানই উৎকৃষ্ট হইবে।

যদি করা মত হয়, তবে যেরূপ লিখা হইল পত্রপাঠ তাহা করিবে কেন না কিছু মাত্র সময় নাই, আকড়ার ভার লইবার একজন সুচতুর লোক চাই, উমাচরণ হইলেই ভাল হয়। যাহা হউক, * * একবার এখানে আসিলে সব * * ধার্য্য হইতে পারে।

শ্রী রাজমোহনকে সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় এখন আন্দাজ * * ৫০ টাকার কম হইবে না। এই পত্রখানি পাঠ মাত্র এখন একটু লিখিয়া দিবে যে "হাঁ আপনারা খুলির ফুরান ও গায়ক সংগ্রহ করুন।" আমরা দুজনে চাঁদা লইয়া প্রস্তুত আছি.

তোমাদের ঐরূপ লেখা পাইবামাত্র কাঁশারিপাড়ায় যাইয়া গোষ্ঠের সঙ্গে পাটা করিব। কিন্তু উমাচরণ বা অন্য কেহ না আইলে আখড়া ঠিক ও আখড়া বসানো হয় না, আর দিন নাই। অদ্যই বসানো উচিত, না হয় বড় জোর কল্য। যেভাবে হয় আসিবে নয় তো কাহাকে পাঠাইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে জবাব এখনই দিবে। শ্রীমনোমোহন বসু

স্বগ্রামবাসীদের সংগীতের শখ মেটানোর ব্যাপারে মনোমোহনই যে ছিলেন প্রধান সহায়, তা চিঠিটি থেকে বোঝা যাচ্ছে। চিঠিতে উল্লিখিত উমাচরণ ও রাজমোহন হলেন জাগুলিয়ার 'রাঙাবাড়ি'-র উমাচরণ বসু ও 'দত্তবাড়ি'-র রাজমোহন দত্ত। রাজমোহন ছিলেন মনোমোহনের বাল্যবন্ধু। তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে মনোমোহন একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন 'মধ্যস্থে'। 'কুলীনচাঁদ' নামক সে উপন্যাসটি কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

কলকাতা গ্রাম থেকে নগরে রূপান্তরিত হয়েছিল ধীর লয়ে। তৎকালীন কলকাতার অধিকাংশ বাসিন্দা ছিলেন গ্রামাঞ্চল থেকে সরে আসা গ্রাম্য বাঙালি। তাই সং, পাঁচালি বা কবিগান যে কলকাতা-সমাজে আদৃত হবে, এটা ছিল স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তির স্পর্শে ধীরে ধীরে বদলাল রুচি, কবিগানকে হঠিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করল থিয়েটার-সার্কাস-সিনেমা। এই রুচি-পরিবর্তনের আগের যুগটা ছিল নিধুবাবু-মোহনচাঁদ-ঈশ্বর গুপ্তের যুগ। সে যুগের শেষ পর্বের এক প্রতিনিধি ছিলেন কবি মনোমোহন। সেদিন যে শুধু উচ্চ-বর্গের মানুষ পাল-পার্বণের রাতে কবিগানের আসর বসাতেন তা নয়, পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও আগ্রহ ছিল এ ধরনের গানের দিকে। সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিবাদ জ্ঞাপন বা বিজয়-মিছিলেও ছিল এ রীতির গানের কদর। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার কয়েকজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কলকাতায় দু'টি 'কসাই-কালী' স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এর অর্থ ছিল হিন্দুদের জন্য দু'টি আলাদা 'স্লটার-হাউস' এবং তার মধ্যে দু'টি কালীমূর্তি স্থাপন। ধর্মের সঙ্গে পশুহত্যাকে জড়িয়ে দেওয়ার এই প্রচেষ্টায় অনেকেই মর্মাহত হন। তাঁদের প্রতিবাদে এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে যায়। তখন মহাসমারোহে প্রতিবাদীরা বের করেন বিজয় মিছিল। সে শোভাযাত্রার জন্য মনোমোহন রচনা ক'রে দিয়েছিলেন একটি বাউল-সুরের গান—'আয়রে ভাই সবাই মিলে, বাহু তুলে, হরি বলে নাচি চল!'[৫২]

মনোমোহন যে কেবল গুরুস্থানীয় গুপ্তকবির গীতরচনাকেই অনুসরণ করেছিলেন তা মনে করলে ভুল হবে। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে'র অনুকরণে একুশ বছরের যুবক মনোমোহন প্রকাশ করেছিলেন 'সংবাদ বিভাকর'। এই 'অর্দ্ধ সাপ্তাহিক পত্র'-টির আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। কিন্তু 'বিভাকর'-এর বিশ বছর

বাদে মনোমোহনের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে 'মধ্যস্থ'। রক্ষণশীল ও অত্যাধুনিক দলের মধ্যবর্তী ছিল মনোমোহনের মতামত। সেই জন্যই পত্রিকার নাম হয়েছিল 'মধ্যস্থ'।[৫৩]

কবি ও সাংবাদিক মনোমোহন নাট্যরচনা শুরু করেন উপরোধের খাতিরে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ছোট জাগুলিয়ায় সখের অভিনয়ের হুজুক ওঠে। ছোট জাগুলিয়া তখনো যথেষ্ট সমৃদ্ধ, তাই চাঁদাও ওঠে ছ'শো টাকা। আত্মীয়-স্বজনের ফরমায়েশ রক্ষা ক'রে মনোমোহন রচনা করেন 'রামাভিষেক নাটক'। এটিই তাঁর প্রথম নাট্যরচনা। নাটকটি কিন্তু শেষবেশ জাগুলিয়ায় অভিনীত হয় নি। সে-বছর উড়িষ্যায় দুরন্ত দুর্ভিক্ষ হওয়ায় চাঁদার টাকা থেকে পাঁচশো টাকা সে জন্য দান ক'রে দেওয়া হয়। বাকি একশো টাকা খরচ করা হয় জাগুলিয়াতেই। তাই 'রামাভিষেক'-এর অভিনয় আর সম্ভবপর হয় নি।[৫৪] 'প্রণয়পরীক্ষা' (১৮৬৯) এবং 'সতী' (১৮৭৩) যথাক্রমে মনোমোহনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাটক।[৫৫] তাঁর রচিত চতুর্থ নাটক 'হরিশ্চন্দ্রে'র (১৮৭৫) উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায় যে 'রামাভিষেক' ও 'সতী' অভিনীত হয়েছিল কলকাতার 'বহুবাজারস্থ-বঙ্গ-নাট্যসমাজে'। এই শখের দলের অনুরোধেই 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' রচিত হয়েছিল।[৫৬] 'হরিশ্চন্দ্রে'র পর প্রকাশিত হয় মনোমোহনের আরো কয়েকটি নাটক। তাঁর অন্যান্য রচনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা যাব না। তবে তিনটি ভাগে রচিত 'পদ্যমালা'র কথা উল্লেখ করতেই হবে। স্কুলপাঠ্য এই কবিতাগুলি এক সময়ে মুখে মুখে ফিরত।

জাতীয়তাবাদী চেতনা যে মনোমোহনের লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে' মন্ত্রীর মুখ দিয়ে মনোমোহন বলিয়েছেন:

> ···শিল্প বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে সে সব সঞ্চালিত হয়, তাতে দেশের লোকের লভ্য না হয়ে বৈদেশিক শিল্পী বণিকেরাই পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। অধিক কি, ক্রমে ক্রমে দেশ এককালে নির্ধন হয়ে পড়্‌লো।[৫৭]

এই একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে নাটকটির একটি গান 'দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন'-এ:

অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল;
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টি-হীন্!
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,

দেশের্ লোকের্ ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন্!

*　　*　　*

ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে ;
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে ;
প্রদীপ্‌টি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক্ নয়্ স্বাধীন ![৫৮]

পরাধীনতার বিরুদ্ধে মনোমোহনের এই পরোক্ষ জেহাদ সম্বন্ধে বেশি বলা বাহুল্য মাত্র। পরবর্তীকালে এই কারণেই ইংরেজ সরকার 'হরিশ্চন্দ্র নাটকে'র অভিনয় নিষিদ্ধ করে।[৫৯]

স্বদেশী ভাবনার অন্যতম পথিকৃৎ মনোমোহন যোগ দিয়েছিলেন নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা'য়, হয়ে উঠেছিলেন সে উৎসবের এক প্রধান উদ্যোক্তা। হিন্দু মেলার একটি অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতাতেও ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর উদগ্র স্বাধীনতা-কামনা :

এই মেলা রাধাকৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয় ; গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয় ; পীরের মহিমা-সূচকও নয় ; এই মেলার উদ্দিষ্টা দেবী তন্ত্রোক্তা নন—পুরাণোক্তা নন ! ইঁহার নাম "উন্নতি"। উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই—তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা। তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে ;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য ! "উদ্যম" নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্র দ্বারা দৈত্য-পতি 'পরবশ্যতার' বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ কম্পিত জরজর, পরাস্তপ্রায়, তথাপি কি আশ্চর্য্য হারিয়াও হারিতেছে না—মরিয়াও মরিতেছে না। দেখে আতঙ্ক হয়, ব্রহ্মার বর পাইয়া অমর হইয়া কি দুষ্ট দৈত্য ভারত পীড়নে অবতীর্ণ হইয়াছে ? কিন্তু ভরসা আছে বরদানকালে কোনো গুপ্ত ছিদ্র না রাখিয়া দেবতারা অসুর ও রাক্ষসকে বরদান করেন না। আমাদের এই দুর্জ্জয় শত্রুদমনেরও অবশ্য কোনো গুপ্ত রন্ধ্র আছে, আমরা তাহার নিগূঢ় জানি না। সেই গুপ্ত ছিদ্র পাইবার প্রয়াসে—অমঙ্গল-রূপী অসুর দলের পিতা, ভর্ত্তা ও অধিনায়ক সেই পরবশ্যতার দমন প্রয়াসেই উন্নতি দেবীর ঘটস্থাপন স্বরূপ এই মেলার অনুষ্ঠান ![৬০]

মনোমোহনের কর্মকৃতিত্ব ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে একাধিক গবেষক ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার মধ্য থেকে আমরা শুধু কলকাতার

সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলিই এখানে উদ্ধৃত করলাম। মনো-মোহনের কর্মজীবনের কথা আর না বাড়িয়ে আবার আমরা ফিরে আসব তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গের আলোচনায়।

কাকা চন্দ্রশেখর বসুই যে মনোমোহনের প্রতিপালক ও অভিভাবক ছিলেন, তা আমরা আগেই জেনেছি। নিঃসন্তান চন্দ্রশেখরের মৃত্যুর পর (১২৮৬ ব.) তাঁর তৃতীয়া পত্নী হেমকুমারী দেবীর সঙ্গে মনোমোহন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের মতান্তর শুরু হয়। যৌথ সম্পত্তি সংক্রান্ত সেই মনান্তর আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শেষে, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ নভেম্বর আপোস বন্দোবস্তে সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হয়। চন্দ্রশেখরের আমলে বসু-পরিবারের আর্থিক অবস্থা কি রকম ছিল, সম্পত্তি-বিভাজনের দলিলটি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। চন্দ্রশেখর একদিকে যেমন কলকাতায় একাধিক স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করেছিলেন[৬১], তেমনি ছোট জাগুলিয়ার ভূ-সম্পত্তিও রক্ষা করেছিলেন।[৬২] প্রয়োজনের চাপে কলকাতায় বাস করতে বাধ্য হলেও তিনি মনে-প্রাণে কলকাতাবাসী হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল শৈশব ও যৌবনের ক্রীড়াভূমি জাগুলিয়ার প্রতি এক পিছুটান।

আলোচ্য দলিলটিতে সম্পদ-তালিকার সঙ্গে আছে চন্দ্রশেখরের সময়ে পুজো ও যৌথ ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত জিনিসের একটি ফর্দ। বসু-পরিবারটির গৃহ-দেবতা শ্রীধর শালগ্রাম শিলার রুপোর সিহাসন, সোনার ছাতা বা দোলচৌকির কথা যেমন সে তালিকায় আছে, তেমনি আছে বলিদানের খাঁড়ার উল্লেখ। চন্দ্রশেখরের আমলে দুর্গাপুজো বা কালীপুজো যে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হতো, এটা তারই প্রমাণ। তালিকাটিতে উল্লিখিত গালিচা, ঝাড়লণ্ঠন এবং পেটা ঘড়ির কথা থেকেও পাওয়া যায় তৎকালীন ঠাট-বাটের পরিচয়।

চন্দ্রশেখর প্রথম জীবনে অর্থ উপার্জন করেছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ঠিকাদারি ক'রে। পরে তিনি হয়েছিলেন কোম্পানির কৃপাপুষ্ট নিমতলার বন্দ্যোপাধ্যায়দের দেওয়ান। তবুও কলোনিয়াল মানসিকতা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। চন্দ্রশেখরের পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিলেন না। তবু আর্থিক সচ্ছলতা তাঁকে প্ররো-চিত করল সামন্তসুলভ আচরণে। কলকাতা থেকে অর্জিত অর্থে তিনি গ্রামের বাড়িতে সাড়ম্বরে দোল-দুর্গোৎসব করলেন, সচেষ্ট হলেন সেখানকার জমিজমা রক্ষণ ও বর্ধনে।

সম্পত্তি ভাগাভাগির পর ২০২, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বসতবাড়িটি পড়ে মনো-মোহন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভাগে। এই বাড়িতে মনোমোহনের জীবনের দীর্ঘ-কাল অতিবাহিত হয়েছিল। প্রখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় যখন ঐ পাড়ায় বাড়ি ক'রে মনোমোহনের প্রতিবেশী হয়ে আসেন, তখন মনোমোহন একটি গান বেঁধেছিলেন – 'চাঁদের হাট বসালে পাড়ায় গুরুদাস।'[৬৩]

মনোমোহন বিবাহ করেছিলেন ছোট জাগুলিয়াতেই। তাঁর স্ত্রী যাদম্বিনী

(যাদুমণি) দেবী ছিলেন জাগুলিয়ার হরিমোহন বিশ্বাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা। মনোমোহন-যাদস্বিনীর তিন পুত্র—প্রবোধচন্দ্র, মতিলাল ও প্রিয়নাথ। পিতার মতো প্রিয়নাথ-মতিলালও খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তবে তাঁরা ছিলেন ভিন্ন নাট্যমঞ্চের নায়ক।

মনোমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথ (১৮৬৫-১৯২০) ছিলেন কলকাতার মেট্রোপলিটান ইনসটিটিউশনের ছাত্র। কিন্তু লেখাপড়ার চেয়েও তাঁর ঝোঁক বেশি ছিল শারীরচর্চা ও ছবি আঁকার দিকে। কলকাতায় তিনি আখড়া খুলে নিজে ব্যায়াম ও কসরৎ করতেন, আবার অন্য ছেলেদেরও শেখাতেন। জাগুলিয়াতেও তিনি আখড়া তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৬৪] লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ নেই দেখে পিতা মনোমোহন প্রিয়নাথকে ভর্তি ক'রে দেন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে। এদিকে ব্যায়ামচর্চাও চলতে থাকে পুরোদমে। কলকাতায় তখন কোনো বিদেশী সার্কাস এলেই প্রিয়নাথ দেখতে যেতেন এবং সেখানকার কর্মীদের তোষামোদ ক'রে এঁকে নিতেন যন্ত্রপাতির ছবি। তারপর সেই সব যন্ত্রপাতি তৈরি ক'রে খেলাগুলি অনুকরণ করার চেষ্টা চালাতেন তাঁরা।[৬৫] সব সময়েই তাঁদের মাথায় ঘুরত সার্কাসের চিন্তা।

এই সময়ের একটি অভাবনীয় ঘটনায় প্রিয়নাথ বসুর সার্কাস-স্থাপনার খেয়াল তুঙ্গে উঠল। প্রিয়নাথ তখন ছোট জাগুলিয়ায়। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন তাঁর ক্লাবের সদস্যরা রাস্তা থেকে একটি কংকালসার বেওয়ারিশ ঘোড়াকে ধরে আনলেন। এই শীর্ণ জীবটিকে পেয়ে প্রিয়নাথ এবং তাঁর সঙ্গীরা ভাবলেন, তাঁদের সার্কাস খুলতে আর বুঝি দেরি নেই। কিন্তু বেঁকে বসলেন স্বয়ং মনোমোহন। জিমন্যাসটিক্‌স বা সার্কাসকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। তাই এজন্য একটি পয়সা দিতেও অসম্মত হয়ে তিনি প্রিয়নাথকে জোর ক'রে ঢুকিয়ে দিলেন পঁচাত্তর টাকা মাইনের এক চাকরিতে। উদ্দেশ্যসাধনের জন্য গৃহত্যাগ করা ছাড়া এর পর প্রিয়নাথের আর কোনো উপায়ান্তর রইল না। বাড়ির মহিলাদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য সূত্রে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে নিজের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে প্রিয়নাথ পাড়ি দিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে এবং অন্যত্র নিরাড়ম্বর প্রদর্শনী ক'রে কিছু টাকা এল তাঁদের হাতে। কলকাতায় ফিরে সেই টাকা দিয়ে তাঁরা কিনে নিলেন নবগোপাল মিত্রের সার্কাসের জিনিসপত্র আর জন্তু-জানোয়ার। এই সময়ে (১৮৮৭ খ্রী) প্রিয়নাথ তাঁর দলের নামকরণ করেন 'প্রোফেসার বোসে'স গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'।[৬৬]

প্রথম দিকে কিছুদিন 'গ্রেট বেঙ্গল' খুব ভালোভাবেই চলছিল। এই আয়ের কল্যাণেই ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রিয়নাথ কিনে নেন যোগীন্দ্রনাথ পালের 'গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস'।[৬৭] কিন্তু নতুন পথের দিশারী প্রিয়নাথকে একাধিকবার আর্থিক

সংকটেও পড়তে হয়। একবার সুদূর বিদেশে খেলা দেখাতে গিয়ে তিনি এমন বিপদে পড়েন যে শেষে মনোমোহনকে গিয়ে ছেলেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে হয়। এ ঘটনার পর মনোমোহন প্রিয়নাথকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সার্কাস বন্ধ করতে। বলা বাহুল্য, সে অনুজ্ঞা প্রিয়নাথ অনুসরণ করেন নি। এই ধরনের আর্থিক বিপদের সময় প্রিয়নাথের পিতৃবন্ধু ও প্রতিবেশী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বহুবার তাঁকে গোপনে অর্থসাহায্য করেছিলেন।[৬৮] আর একবার সার্কাস এমন সংকটে পড়ে যে দলটি উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়। সেই চূড়ান্ত বিপদের সময় প্রিয়নাথের অগ্রজ মতিলাল টাকা দিয়ে দলটিকে রক্ষা করেন।[৬৯] অর্থদানের সুবাদে এবং পিতৃনির্দেশে এই সময় থেকে সার্কাসের যৌথ স্বত্বাধিকারী হন প্রিয়নাথ ও মতিলাল।

মতিলাল বসু (১৮৬৩-১৯১০) ছিলেন সাহিত্যরসিক। 'চারি চিত্র' নামে একটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন। 'গান ও গল্প' বলে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করতেন। আর্থিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু দুর্মুখ ছিলেন বলে তিনি বেশ কয়েকবার ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে টাকাকড়ির ব্যাপারে শৈথিল্যের জন্য প্রিয়নাথ বহুবার ভরাডুবির সম্মুখীন হয়েছিলেন। সার্কাস থেকে প্রিয়নাথকে ফেরাতে না পেরে এবং দুই ছেলের চরিত্রগত বৈপরীত্য দেখে মনোমোহনই দু'জনকে একসাথে কাজ করতে নির্দেশ দেন।[৭০]

প্রিয়নাথ ও মতিলালের যৌথ চেষ্টায় 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' আরোহণ করে খ্যাতির শীর্ষে। ,গ্রেট বেঙ্গল'-এর ইতিহাস তাই সার্কাস-জগতে বাঙালির উজ্জ্বল উত্তরণের কাহিনী। কিন্তু নানা বিষয় নিয়ে প্রিয়নাথ ও মতিলালের মধ্যে বিবাদের ফলে দলটি বারবার দ্বিধাবিভক্ত ও পুনর্মিলিত হয়।[৭১] দুই ভাইয়ের শেষ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে। এই ঘটনার মাস তিনেক বাদেই মতিলালের মৃত্যু হয় (১৭-২-১৯১০)।[৭২] পুনর্মিলনের সুযোগ তাই আর মেলে নি।

মতিলালের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মণিলাল পিতার সার্কাসটি চালানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালান। সাফল্য করায়ত্ত না হওয়ায় তিনি তাঁর দল নিয়ে মিশে যান প্রিয়নাথের সার্কাসে।[৭৩] কিন্তু অনতিবিলম্বে আবার দেখা দেয় পারিবারিক বিরোধ। গৃহবিবাদ এবং সমসাময়িক অন্যান্য বিপদের ফলে তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়ে পড়েন প্রিয়নাথ। বন্ধুপুত্র কাজি কাদের দাদ সাহেবের সহায়তায় শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রিয়নাথ গঠন করলেন 'প্রোফেসার বোসে'স গ্র্যাণ্ড সার্কাস'। উপার্জনের আশায় সে দল নিয়ে তাঁরা পাড়ি জমালেন সিঙ্গাপুরে।[৭৪] এই যাত্রাই কিন্তু পরিণত হল প্রিয়নাথের অগস্ত্য-যাত্রায়। সিঙ্গাপুরে জনডিসে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন প্রিয়নাথ (২১-৫-১৯২০)।[৭৫] প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর, কর্ণধারহীন তরণীর মতো দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে সার্কাস-দলটি সাগর পারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে

গেল।[৭৬]

সংগীত-সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার[৭৭] জীবনীকার ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত প্রিয়নাথ-মতিলালের সার্কাস প্রসঙ্গে দু'টি গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন দু'টি হল :

১. 'প্রোফেসর বোস আসলে কে ? মতিলাল না প্রিয়নাথ ?'[৭৮]
২. '…গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রকৃত মালিকানা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কার ছিল ? একা প্রিয়নাথের না মতিলালের, নাকি দু'জনেই পরে যৌথভাবে এর মালিক ছিলেন ?'[৭৯]

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে সেকালে অনেক সার্কাস-প্রদর্শকই 'প্রোফেসার' উপাধি ব্যবহার করতেন। স্বয়ং শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও (সোঽহং স্বামী) 'প্রোফেসার ব্যানার্জি'স সার্কাস' নামে একটি দল খুলেছিলেন।[৮০] সেই রীতি অনুযায়ী 'প্রোফেসার' উপাধি প্রিয়নাথ এবং মতিলাল দু'জনেই ব্যবহার করতেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, সাধারণ মানুষ 'প্রোফেসার বোস' বলতে কাকে বুঝতেন ? প্রাসঙ্গিক কিছু প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেগুলির সূত্র ধরেই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা যাক।.

প্রিয়নাথকে যে লোকে 'প্রোফেসার পি. এন. বোস' নামে চিনতেন, তার একাধিক প্রমাণ 'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রশংসাপত্রগুলির মধ্যে রয়েছে। এ ব্যাপারে একটি বাড়তি প্রমাণ হল সেকালের সিভিলিয়ান সূর্যকুমার অগস্তির[৮১] লেখা এই অপ্রকাশিত চিঠিটি :

S. K. Agasti M. A., P. R. S.,
C. S. (Retd.)

MIDNAPORE.
The 5/2 1913.

No. 2478.

To Proffessor [sic] P. N. Bose,
173/2 Grey Street
Calcutta.

Dear Sir,

Thanks for your wire. It is desirable that you should erect your tent by the 15th inst. positively. The opening ceremony will take place on the 17th Feby. The Hon'ble Mr. P. C. Lyon will open the exhibition.

In order to decorate the tent it is necessary that it will be erected by the 15th Feby. *latest*.

Mr. Bradly Birt is very anxious about your erecting the tent here by the 15th. So please do the needful and let me have a wire to remove my anxiety.

Yours faithfully
S. K. Agasti
Hony. Secretary.

প্রিয়নাথকে যে শুধু 'প্রোফেসার পি. এন. বোস' নামেই সম্বোধন করা হতো, তা নয়। অনেক সময়ে তাঁর পরিচিত জনেরা তাঁকে সম্বোধন করতেন শুধুই 'প্রোফেসার' বলে। বিখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা এই অপ্রকাশিত পত্রটি তার পরিচায়ক :

Mogul Sarai
Dated 24-10-1913.

My Dear Professor,

I am writing you from Mogul Sarai. I am reaching Benares today. You must come one of these days at the following address to stay with me. You will be glad to learn that Susila's matter has been successfully managed. The details you will hear from her. The bearer of this letter Mr. H. Remins [?] is a particular friend of mine. Do please admit him+his family in your Circus whenever he chooses to go.

More when we meet in Benares.

Yours affly.
A. N. Dutt.

প্রিয়নাথ বসু যে 'প্রোফেসার' উপাধি ব্যবহার করতেন এবং লোকও যে তাঁকে 'প্রোফেসার' নামে সম্বোধন করতেন, তার পরিচয় উপরের চিঠি দু'টি বহন করছে। কিন্তু এ চিঠি দু'টির বিষয়ে একটি বিরূপ মত উঠতে পারে। দু'টি চিঠিই লেখা হয়েছিল মতিলাল বসুর মৃত্যুর পরে। কাজেই বিরুদ্ধবাদীরা বলতে পারেন যে মতিলালের মৃত্যুর পরেই হয়ত প্রিয়নাথ 'প্রোফেসার' নামে পরিচিত হন। সে প্রশ্ন যাতে না ওঠে, সে জন্য এমন কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণের অবতারণা করা যাক, যা মতিলালের জীবদ্দশায় রচিত হয়েছিল।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের ১০ পৌষ 'প্রোফেসর বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত' নামে

একটি বই প্রকাশিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রোফেসার বোসের সার্কাস দলের ভ্রমণ-কাহিনীই ছিল বইটির উপজীব্য। বইটির প্রচ্ছদে বা আখ্যাপত্রে লেখকের প্রকৃত নামের কোনো উল্লেখ ছিল না। তার বদলে দু'জায়গাতেই ছিল একটি ছবি। ছবিটি প্রিয়নাথ বসুর। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে বইটি প্রিয়নাথেরই লেখা। বইটির রচয়িতা যে প্রিয়নাথ বসু, অন্য কেউ নয়, তার সপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। বইটির একাধিক জায়গায় দেখা যায় যে লেখককে লোকে 'প্রিয়বাবু' বলে সম্বোধন করছে। প্রিয়নাথ যদি 'প্রোফেসার বোস' নামে সুপরিচিত না হতেন, তাহলে কি স্বরচিত বইয়ের নাম 'প্রোফেসর বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' রাখতেন ? 'প্রোফেসার বোস' নামে সুপরিচিত না হলে তিনি নিশ্চয়ই বইটির আখ্যাপত্রে নিজের প্রকৃত নামটি দেওয়াও আবশ্যক বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রিয়নাথকে লোকে 'প্রোফেসার বোস' বলেই চিনত বলে, তাঁর 'প্রিয়নাথ' নামটি বইতে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় নি।

মতিলাল এবং প্রিয়নাথ – এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কোনজন 'প্রোফেসার বোস' নামে সুপরিচিত ছিলেন, সে প্রশ্নের মীমাংসায় দারুণ সহায়ক অমৃতবাজার পত্রিকার এই খবরটি :

> Professor Bose had so long been connected with his elder brother's circus, but a difference having arisen between them he has separated his concern and has organised a circus of his own.[৮২]

এই খবরটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অগ্রজ মতিলাল নন, 'প্রোফেসার বোস' নামে পরিচিত ছিলেন অনুজ প্রিয়নাথ-ই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল দুই ভাইয়ের শেষ বিচ্ছেদের সময়ে।

ডঃ বাঁধন সেনগুপ্তের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে 'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস'-এর মালিকানার বিষয়ে। সার্কাস-স্থাপনার অনতিপরে অর্থদান ক'রে মতিলাল যে 'গ্রেট-বেঙ্গল'-এর অর্ধাংশের অধিকারী হন, তা অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিবৃত করেছেন। কিন্তু দুই ভাইয়ের সম্পর্কে চিড় ধরার কিছু-দিনের মধ্যেই যবনিকার আড়ালে অন্তর্হিত হয় 'গ্রেট বেঙ্গল'। এর পর দুই ভাইয়ের উপর্যুপরি মিলন ও বিচ্ছেদের সময়ে দল দু'টির নাম এতবার পরিবর্তিত হয় যে সে-সময়ের কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা অত্যন্ত কঠিন। একবার দু'টি দলের মিলনের পর সংযুক্ত দলের নাম যে 'Bose's Circus & Menagerie' রাখা হয়, তা আমরা জানতে পেরেছি একটি প্যাডের পাতা থেকে। এই প্যাডে 'প্রোপ্রাই-টরস' হিসাবে নাম ছিল 'প্রোফেসার এম. এল. বোস' এবং 'প্রোফেসার পি. এন. বোস'-এর। তবে মিলনের পরেও যে দল দু'টি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায়

রাখত, তা অনুমান করা যায় অমৃতবাজারের খবরটি থেকে। তা না হলে প্রিয়নাথের পক্ষে তাঁর 'concern' অত সহজে 'separate' ক'রে বেরিয়ে আসা সম্ভব হতো না।

মনোমোহনের শেষ জীবনে স্বস্তি ছিল না। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়।[৮৩] 'মনোমোহন লাইব্রেরী' নামে যে বইয়ের দোকানটি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বার্ধক্যের কারণে সেটি তিনি মধ্যমপুত্র মতিলালকে হস্তান্তর করেন।[৮৪] কিন্তু মতিলাল পিতার অজ্ঞাতসারে দোকানটি বিক্রি ক'রে দেন নিজের জ্যেষ্ঠ জামাতা কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরীকে। পরে ব্যাপারটি জানতে পেরে মনোমোহন মতিলালের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। পিতা-পুত্রের এই বিবাদের প্রভাব হয়ত প্রিয়নাথের উপরেও পড়েছিল। সেজন্যই বোধহয় মতিলাল-প্রিয়নাথ বার বার জড়িয়ে পড়েছিলেন গৃহবিবাদের জালে। মনোমোহনের জীবদ্দশাতেই মতিলালের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার ফলে মানসিকভাবে মনোমোহন আরো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গেও বোধহয় মনোমোহনের মন-কষাকষি ছিল। কারণ, মনোমোহনের নিজস্ব বাড়ি খালি পড়ে থাকা সত্ত্বেও প্রবোধচন্দ্র বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকতেন উল্টোডিঙির তেলেঙ্গাবাগানে। মনোমোহনের অন্য দুই ছেলে তাঁর বাড়ির দু'-পাশে বাড়ি ক'রে থাকতেন।

কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথের প্রথমা পত্নী ও জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতেও মনোমোহন যথেষ্ট ব্যথিত হয়েছিলেন। প্রিয়নাথ সারা বছর সার্কাস নিয়ে দূরে দূরে থাকতেন, তাঁর পরিবারের দেখাশোনার ভার থাকত বৃদ্ধ মনোমোহনের উপর। শেষ বয়সে এটাই বোধহয় তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল।

মনোমোহনের মৃত্যু হয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি।[৮৫] তাঁর মৃত্যুর মাত্র আট বছর পরেই পরলোকগমন করেন প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের মৃত্যুর পর দেনার দায়ে ভাল্লুকপাড়ার সব বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যায়, নিঃশেষিত হয়ে যায় সমস্ত সমৃদ্ধি। বসু-পরিবারটির গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটে। প্রিয়নাথের মধ্যমপুত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু (১৫. ১১. ১৮৯৮ – ২৩. ১২. ১৯৩৯) তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে সচেষ্ট হয়েছিলেন সেই অধ্যায়ের লিপিকরণে। 'বাঙালীর সার্কাস' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তিনি সংক্ষিপ্তভাবে সংকলন করেছিলেন তাঁদের সার্কাসের কথা। সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের প্রশংসায় উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রকাশ করেন বইটির প্রভূতভাবে পরিবর্ধিত একটি সংস্করণ। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরে অবনীন্দ্রকৃষ্ণের অকালপ্রয়াণ ঘটে। পিতামহ মনোমোহনের একটি তৈলচিত্র এঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার দিয়েছিলেন শিল্পী অবনীন্দ্রকৃষ্ণ।[৮৬] সে ছবিটি আজও পরিষদে আছে।

বসু-পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চন্দ্রশেখর প্রথম গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতায়

পাড়ি জমিয়েছিলেন। তবু ছোট জাগুলিয়ার প্রতি তাঁর টান ছিল, ঝোঁক ছিল দোল-দুর্গোৎসবের দিকে। তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের সদস্য মনোমোহন কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠলেও তিনি ছিলেন ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির বাহক। তাঁর গান-নাটক-সাহিত্যে প্রাচীনপন্থার প্রভাব ছিল প্রকট। চন্দ্রশেখর-মনোমোহনের মানসিকতার বেড়া ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মতিলাল-প্রিয়নাথ। কবিগান-রচয়িতার সন্তান হয়েও তাঁরা ঝুঁকেছিলেন বিদেশী সংস্কৃতির দিকে, সার্কাস হয়ে উঠেছিল তাঁদের নেশা ও পেশা। তিন পুরুষের এই ধারাবাহিক ইতিহাস তাই শুধু ছোট জাগুলিয়া থেকে কলকাতায় স্থানান্তরের কাহিনী নয়, তা সামন্ত-মানসিকতা থেকে ঔপনিবেশিক ভাবনার জগতে সরে আসার এক বাস্তব দৃষ্টান্তও বটে, তাতে সন্দেহ নেই।

২. গঙ্গাপ্রসাদ লেন
[ওয়ার্ড – ৮, ৯ ; পোঃ – ৫]

সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের স্মৃতি বহন করছে কুমোরটুলির 'গঙ্গাপ্রসাদ লেন'। অদূরবর্তী আর একটি রাস্তা 'ভগবতী সেন লেন'-এর নামকরণ হয়েছে গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীপ্রসন্নের নামে। গঙ্গাপ্রসাদের অনুজ অন্নদাপ্রসাদ সেনের নাম জড়িয়ে রয়েছে দর্জিপাড়ার 'অন্নদাপ্রসাদ স্ট্রিট'-এর সঙ্গে। এক সময়ে এই সেন-পরিবারের সদস্যরা ছিলেন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-জগতের পুরোধাপুরুষ। তাঁদের সে কৃতিত্বকাহিনীর রেশ কলকাতার বুকে জাগিয়ে রেখেছে তিনটি স্বতন্ত্র পথ-নাম।

গঙ্গাপ্রসাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত উত্তরপাড়-কোমরপুরের বাসিন্দা।[৮৭] কিন্তু ঐ গ্রাম সেনবংশের দীর্ঘদিনের আবাসস্থল নয়। ধন্বন্তরি গোত্রীয় এই বৈদ্য সেনবংশের আদি নিবাস ছিল ত্রিবেণীর নিকটবর্তী বিশপাড়া গ্রামে। বর্গীর হাঙ্গামায় উত্যক্ত হয়ে পরিবারটির তৎকালীন পূর্বপুরুষ রাজারাম সেন বিশপাড়া ছেড়ে বিক্রমপুরে গিয়ে বসতি করেন। গঙ্গাপ্রসাদ এই রাজারাম সেনের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। সেন-পরিবারের ধারাবাহিক বংশ-লতিকাটি এ রকম: ১. গোস্নী সেন – ২. রাম – ৩. বিকর্তন – ৪. ধর্ম – ৫. ব্যাস – ৬. কাম – ৭. ঈশাণ ৮. শিব – ৯. গোপাল – ১০. বসন্ত – ১১. নরহরি – ১২. শ্যামসুন্দর – ১৩. রামগোপাল – ১৪. বিশ্বনাথ – ১৫. কালীনাথ – ১৬. রাজারাম – ১৭.

রাজীবলোচন — ১৮. শিবনারায়ণ — ১৯. হরিনারায়ণ — ২০. নীলাম্বর।

- ২১. গঙ্গাপ্রসাদ
  - ২২. ভগবতীপ্রসন্ন
    - ২৩. গিরিজাপ্রসন্ন
      - ২৪. জ্যোতিপ্রসন্ন
      - বাণীপ্রসন্ন
        - ২৫. অরিন্দম
      - ভবানীপ্রসন্ন
      - বিষ্ণুপ্রসন্ন
      - ধূর্জটিপ্রসন্ন
      - লক্ষ্মীপ্রসন্ন
        - ২৫. প্রত্যুষ
        - ২৫. সায়ন
      - শক্তিপ্রসন্ন
  - ২২. হরিপ্রসন্ন
    - ২৩. বিশ্বেশ্বর
    - ২৩. রামেশ্বর
  - ২২. গুরুপ্রসন্ন
    - ২৩. দুর্গাপ্রসন্ন
      - ২৪. শিবপ্রসন্ন
        - ২৫. পার্থপ্রতিম
    - দেবীপ্রসন্ন
    - সত্যপ্রসন্ন
    - কৃষ্ণপ্রসন্ন
    - কালীপ্রসন্ন
      - ২৪. পার্থসারথি
    - শচীপ্রসন্ন
    - সতীপ্রসন্ন
- ২১. দুর্গাপ্রসাদ
- ২১. অন্নদাপ্রসাদ

চারজন সুপরিচিত ব্যক্তির বিশেষত্ব নিয়ে রচিত একটি ছড়া লোকমুখে প্রচলিত ছিল ঢাকা অঞ্চলে :

গণি মিঞার ঘড়ি,
নীলাম্বরের বড়ি,
গোকুল মুন্সীর গোঁফে তা,
গল্প শুনবি তো মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা।[৮৮]

উপরোক্ত লোক-কবিতাটিতে উল্লিখিত 'নীলাম্বর'-ই হচ্ছেন গঙ্গাপ্রসাদের পিতা।[৮৯] কবিরাজ নীলাম্বর সেনের 'বড়ি' যে রোগ নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর ছিল, ছড়াটি তার সাক্ষী।

জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে নীলাম্বর গঙ্গাতীরে বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করতে মনস্থ করেন। সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি পিতৃভূমি ও পসারের মোহ ত্যাগ ক'রে চলে আসেন কলকাতায়।[৯০] গঙ্গাতীরে কুমোরটুলিতে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন ১২৪৭ বঙ্গাব্দ থেকে।[৯১]

নবাগত নীলাম্বরের চিকিৎসা-প্রতিভার কথা প্রথমে কলকাতাবাসীর কাছে ছিল অজানা। কিন্তু এক অদ্ভুত যোগাযোগের কল্যাণে তাঁর কৃতিত্বের কথা

ছড়িয়ে পড়ল কলকাতা-সমাজে। নীলাম্বরের কুমোরটুলির বাড়ির কাছেই ছিল শোভাবাজার রাজ পরিবারের একটি গঙ্গাযাত্রী-গৃহ। অন্তর্জলীর জন্য যে সব মুমূর্ষু রোগী সেখানে স্থান নিতেন, তাঁদের চিকিৎসা বা মৃত্যুকাল-নির্ণয়ের জন্য ডাক পড়ত নীলাম্বরের। নীলাম্বরের চিকিৎসার গুণে বেশ কয়েকজন গঙ্গাযাত্রী সেরে ওঠেন। এর পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[৯২]

গঙ্গাতীরে বসবাসের কাঙ্ক্ষিত সুখ কিন্তু বেশিদিন ভোগ করতে পারেন নি নীলাম্বর। কোমরপুর থেকে কুমোরটুলিতে বাসান্তর গ্রহণের মাত্র দু'বছর পরে, ১২৪৯ বঙ্গাব্দের ভৈমী একাদশীর দিন তাঁর মৃত্যু হয়।[৯৩] প্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে, নীলাম্বর নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদকে কবিরাজী-ব্যবসায় দীক্ষিত করেন। তাঁর অবর্তমানে যাতে গঙ্গাপ্রসাদের অসুবিধা না হয়, সে জন্য নিজের পৃষ্ঠপোষক পরিবারগুলির সঙ্গেও নীলাম্বর পুত্রের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেন।[৯৪]

১২৩১ বঙ্গাব্দের ২ ভাদ্র গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল।[৯৫] সুতরাং তিনি যখন কবিরাজী শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। আয়ুর্বেদের ছাত্র হিসাবে যে গঙ্গাপ্রসাদ খুব মেধাবী ছিলেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। চিকিৎসাগুণে তিনি হয়ে উঠলেন কলকাতার কবিরাজ সম্প্রদায়ের অগ্রণী সদস্য।[৯৬] কাশ্মীর, নেপাল রেওয়া, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানের রাজা-রাজড়া ও ভূস্বামীদের সফল চিকিৎসা ক'রে তিনি অর্জন করেন অতুল অর্থ ও যশ।[৯৭] কিন্তু ভক্তিমার্গের পথিকদের কাছে গঙ্গাপ্রসাদের স্মৃতি আজও জাগরূক হয়ে রয়েছে অন্য একটি কারণে। তাঁদের কাছে গঙ্গাপ্রসাদের পরিচয় শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হিসাবে।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালের গোড়ার দিকে অনিদ্রা গাত্রদাহ প্রভৃতি নানারকম উপসর্গ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-মনকে পীড়িত ক'রে তোলে। তাঁর এ অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন রানী রাসমণির জামাই মথুরবাবু। সেই সময়ে মথুরবাবুর নির্দেশেই শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার ভার পড়ে কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের উপর। ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই প্রায়ই আসতে হতো গঙ্গাপ্রসাদের কাছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এ সম্পর্কে বলেছেন :

> একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশা-নুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়া-ছিলেন, 'ইহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি; ঔষধে সারিবার নহে।'[৯৮]

কেউ কেউ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের রোগটিকে যিনি 'যোগজ ব্যাধি' নামে অভি-হিত করেছিলেন, তিনি গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন।[৯৯]

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল গভীর আস্থা। গঙ্গাপ্রসাদের নির্দেশগুলি তিনি যে নিখাদ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, তার স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন নিজ মুখেই :

> যখন আমার ভারী ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বললে, স্বর্ণপটপটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না; বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে কেমন করে আমি থাকবো। আমি রোক কল্লুম, আর জল খাব না। 'পরমহংস'! আমি ত পাতিহাঁস নই—রাজহাঁস! দুধ খাব।[১০০]

গঙ্গাপ্রসাদকে শ্রীরামকৃষ্ণ কি চোখে দেখতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর আর একটি উক্তিতে :

> গঙ্গাপ্রসাদ বল্লে, আপনি রাত্রে জল খাবেন না। আমি ঐ কথা বেদবাক্য ধরে রেখেছি। আমি জানি, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।[১০১]

শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় যখন ক্যান্সার হয়, তখনো প্রথমে কবিরাজদের ডাকা হয়েছিল। অন্যান্য কবিরাজদের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদও তাঁকে পরীক্ষা ক'রে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ সে বিষয়ে লিখেছেন :

> বৃথা সময় নষ্ট করা বিধেয় নয় ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধি সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ সেদিন আহূত হইয়া ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। যাইবার কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গাপ্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, "ডাক্তারেরা যাহাকে 'ক্যান্সার' বলে, রোহিণী তাহাই; শাস্ত্রে উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা অসাধ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।"[১০২]

গঙ্গাপ্রসাদের যে চিকিৎসালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ আসতেন, সেটি সেন-পরিবারের বসত বাড়ির উলটোদিকে অবস্থিত। বাড়িটির (৯/১ কুমোরটুলি স্ট্রিট) গায়ে একটি মর্মরফলকে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের কথা উৎকীর্ণ করা আছে।

একদিকে যেমন কবিরাজীর কল্যাণে গঙ্গাপ্রসাদ রাজসিক রোজগার করতেন, তেমনি বিনা পারিশ্রমিকে তিনি অজস্র রোগীর চিকিৎসা ক'রে তাঁদের বিনা মূল্যে ওষুধ দিতেন। আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীদের নিজের খরচে বাড়িতে রেখে শিক্ষাদান করার পিছনেও তাঁর অনেক অর্থ ব্যয়িত হতো।[১০৩] বিনা পয়সায় চিকিৎসা ও ওষুধ পাওয়ার আশায় প্রতিদিন শত শত রোগী তাঁর চিকিৎসালয়ে ভিড় করত। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'-এ দেখা যায় কলকাতায় ঘুরতে ঘুরতে সে দৃশ্য দেবতাদের চোখে পড়েছে :

> ক্রমে একস্থানে যাইয়া দেবগণ দেখেন, শত শত রোগী ঔষধ লইয়া বাহির

হইতেছে। তদ্দৃষ্টে পিতামহ কহিলেন, "এটি কবিরাজ-বাড়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। বরুণ, এই কবিরাজ-বংশের বিষয় বল।"

বরুণ। ইহারা পূর্ব্ববঙ্গের বৈদ্য কবিরাজ। এই বংশের সুবিখ্যাত কবিরাজ নীলাম্বর সেন ··সুচিকিৎসা-গুণে ধন্বন্তরি নামে প্রসিদ্ধ হন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদও কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। ইনি প্রত্যহ শত শত রোগীকে বিনামূল্যে মহামূল্য ঔষধ দান, বিস্তর ছাত্রকে আহার ও বিদ্যা দান করিতেন। ১৮৭৭ সালের দরবারে ইনি গবর্নমেণ্ট হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ সেন ও অন্নদাপ্রসাদ সেনও বিদ্বান্ সু-চিকিৎসক। ··ইহাদের ঢাকা জেলায় জমিদারী ও কলিকাতায় অনেকগুলি ভাড়াটে বাড়ী আছে।[১০৪]

'বরুণের বর্ণনায়' পাওয়া যাচ্ছে গঙ্গাপ্রসাদের এক প্রশংসাপত্র প্রাপ্তির উল্লেখ। মহারানী ভিকটোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি কলকাতায় একটি 'দরবার' আয়োজিত হয়েছিল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সে দরবার থেকে মানপত্র লাভ করেন কলকাতার দুই বিখ্যাত কবিরাজ। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন গঙ্গা-প্রসাদ, অন্যজন কবিরাজ রমানাথ সেন।[১০৫] যে ইংরেজ সরকার গঙ্গাপ্রসাদকে সম্মানিত করেছিল প্রশংসাপত্র দিয়ে, সেই প্রশাসনের বিরুদ্ধেই কয়েক বছর পরে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। সে-কাহিনীর পটভূমি ছিল আইন-আদালত।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র বিধিবদ্ধ হয় 'সহবাস সম্মতি আইন'। ধর্মবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপের রব তুলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন হিন্দু মৌলবাদীর দল। রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র 'বঙ্গবাসী' তখন এই নয়া কানুনটির বিরুদ্ধে কলম ধরে ব্যক্ত করে প্রকাশ্য জেহাদ। তিন মাসের মধ্যে পাঁচটি বিরুদ্ধবাদী নিবন্ধ প্রকাশিত হয় বঙ্গবাসীর পাতায় :

১. 'আমাদের অবস্থা', ১৫ চৈত্র ১২৯৭
২ 'ইংরেজরাজের প্রকটমূর্ত্তি', ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
৩ 'অসভ্য হিন্দুর প্রধান ও প্রথম ধারণা,' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
৪ 'পরিণাম কি ?' ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
৫. 'অসভ্যের পক্ষে অকপট নীতিই ভাল', ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮

বিধিবদ্ধ আইনের বিরুদ্ধে এই নিন্দাবাদ ইংরেজ সরকারের কাছে ছিল প্রত্যক্ষ রাজদ্রোহের সামিল। তাই ২৩ শ্রাবণ ১২৯৮ তারিখে বঙ্গবাসীর স্থাপয়িতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু-সহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় (কার্যাধ্যক্ষ) এবং অরুণোদয় রায়ের (মুদ্রক ও প্রকাশক) বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ

থেকে দায়ের করা হয় একটি মামলা।[১০৬] প্রথমে গ্রেফতার হন অরুণোদয় রায়। বাকিরা পরে আত্মসমর্পণ করেন আদালতে।[১০৭] যথাসময়ে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা আবেদন করলেন জামিন পাওয়ার জন্য। কিন্তু সরকার পক্ষের প্রতিনিধিরা জামিনদানের প্রতিকূলে গড়ে তুললেন প্রবল প্রতিরোধ। বিস্তর বাগ্‌যুদ্ধের পর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম কোমার পেথেরাম এক লাখ টাকার জামিন মঞ্জুর করলেন। প্রায় একশো বছর আগে লাখ টাকার দাম কত ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কাজেই লক্ষপতি জামিনদার সংগ্রহ করা ছিল অসাধ্যসাধনের নামান্তর। সে বিপদের বিবরণ পড়া যাক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পুত্র মহেন্দ্রকুমারের লেখা থেকে :

> এক লক্ষ টাকার জামীন! সে বড় সহজ কথা নহে; সহসা এরূপ জামীনদার পাওয়া দুষ্কর হইল। 'বঙ্গবাসী'র উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেও অর্থবান লোকে রাজদ্রোহ মামলার জামীনদার হইতে ভীত হইলেন। অবশেষে কবিরাজ কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় জামীন দিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার অসমসাহস দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। অনেকে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি 'বঙ্গবাসী'কে সমর্থন করিয়া, স্বেচ্ছায় এক লক্ষ টাকার জামীন দাঁড়াইয়া রাজদ্রোহের আসামীদের মুক্ত করেন। সে যুগে রাজরোষে পতিত হইবার আশঙ্কাকে তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার এই বদান্যতা ও সৎসাহস বিশেষভাবে স্মরণীয়।
>
> কথিত আছে, কৌঁসুলী মিঃ পিউ যখন শুনিলেন, জামীনদার একজন কবিরাজ অর্থাৎ দেশীয় চিকিৎসক, তিনি নাকি সন্দিগ্ধচিত্তে গঙ্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার লাখ টাকা আছে?" দো-ভাষী তাঁহাকে ঐ কথা বুঝাইয়া দিলে, তিনি সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন,—"সাহেব কিসে চান? সম্পত্তিতে, কোম্পানীর কাগজে, না নগদ টাকায়?" এ পক্ষের ব্যারিষ্টারও তখন বলেন,—"এই সমস্ত দেশীয় চিকিৎসকের আয়, ডাক্তারী চিকিৎসকের আয়ের অপেক্ষা অনেক অধিক। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং ১৮৭৭ সালের কলিকাতা দরবারে গভর্নমেণ্ট হইতে বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন; যথেষ্ট বিত্তশালী ও দেশখ্যাত বিশিষ্ট কবিরাজ।" তখন জামীন মঞ্জুর করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ চারিদিন নরকতুল্য হাজত বাসের পর, ১২ই আগস্ট, ২৮শে শ্রাবণ তারিখে হাজতগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করেন।[১০৮]

গঙ্গাপ্রসাদ আদালতে সত্যিই নিজের বিত্তবৈভবের কথা সহাস্যে ব্যক্ত করেছিলেন কি না, তা আজ যাচাই করা দুরূহ। তবে লোকশ্রুতিটি থেকে একটি কথা বোঝা যায়। যথেষ্ট ধনগৌরব না থাকলে গঙ্গাপ্রসাদ সম্পর্কে এমন গল্প রটতো না।

কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের সম্পূর্ণ সম্পদ-তালিকা আমাদের হাতে নেই। নিজের অন্তিম ইচ্ছাপত্রে গঙ্গাপ্রসাদ কয়েকটি ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ভূ-সম্পত্তির সেই আংশিক উল্লেখ থেকে তাঁর মোট সম্পদের বিপুল পরিমাণ অনুমান করা যায়।

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর (২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গঙ্গাপ্রসাদ। তার আগের দিন তিনি সম্পাদন করেন তাঁর ইচ্ছাপত্রটি। ফরিদপুর জেলার কেঁয়রপুরের রাধামাধব সেনের কন্যার সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম হরিপ্রসন্ন পিতামাতার জীবদ্দশায় মারা যান। নিজের সমস্ত সম্পত্তি দুই জীবিত পুত্র-সহ মৃত পুত্রের দুই সন্তানের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার জন্যই গঙ্গাপ্রসাদ উইলটি করেন। এ ছাড়াও উইলটির উদ্দেশ্য ছিল দেবসেবার নীতি-নির্ধারণ। গঙ্গাপ্রসাদের ইচ্ছাপত্রে তাঁর যেসব ভূ-সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি হল :

১. ১৬ ও ১৭ কুমোরটুলি স্ট্রিটের বসতবাড়ি—ঠাকুরদালানশোভিত এ বাড়িটি আসবাবসহ গৃহদেবতার নামে দেবত্র ক'রে দেন গঙ্গাপ্রসাদ। বাড়িটিকে ভদ্রাসন হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার খর্ব না হলেও, দান-বিক্রির অধিকার আর তাঁর বংশধরদের হাতে রইল না।

২. ৯/১ কুমোরটুলি স্ট্রিটের চিকিৎসালয় ও সংলগ্ন জমি—এটি পড়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীপ্রসন্নের ভাগে।

৩. ২১ বনমালী সরকার স্ট্রিটের বাড়ি ও সংলগ্ন জমি—এ সম্পত্তিটি পান কনিষ্ঠ পুত্র গুরুপ্রসন্ন।

৪. ১০ সক স্ট্রিটের (কুমোরটুলি স্ট্রিটের)[১০৯] বাড়ি ও সংলগ্ন জমি—পিতৃহীন দুই পৌত্রের জন্য এই সম্পত্তিটি বরাদ্দ করেন গঙ্গাপ্রসাদ।

৫. ১৭৯ (আপার ?—দে. ব.) চিৎপুর রোডের বাড়ি ও জমি—এটি পান ভগবতীপ্রসন্ন।

৬. ১৬২ ও ১৬৪ হ্যারিসন রোডের বাড়ি ও জমি—এই বাড়ি দু'টির ভাড়ার আয় থেকে মেরামতি ও করদানের খরচ বাদ দেওয়ার পর যে টাকা থাকবে, সে টাকায় চলবে কুমোরটুলির দেবত্র সম্পত্তির মেরামতি ও ট্যাক্স-খাজনার ব্যয়। বাকি টাকা দিয়ে নির্বাহ হবে কুমোরটুলি ও কাশীর দেবসেবা, বসত বাড়ির চণ্ডীপাঠ, দোলযাত্রা, দুর্গোৎসব এবং বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ। গঙ্গাপ্রসাদ দুর্গোৎসব এবং দোলযাত্রার জন্য বাৎসরিক ব্যয় ধার্য করেছিলেন যথাক্রমে আড়াই হাজার টাকা এবং পাঁচশো টাকা। প্রায় শতবর্ষ আগের এই খরচের বন্দোবস্ত থেকে আন্দাজ করা যায় উৎসব দু'টির জাঁকজমকের মাত্রা। এই সব ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ চালানোর পরেও যদি কোনো টাকা উদ্‌বৃত্ত হয়, তবেই তা ওয়ারিশানরা পাবেন।

৭. কাশীর বাড়ি ও জমি—কাশীতে একটি বাড়ি কিনে গঙ্গাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'গঙ্গাধর' শিবলিঙ্গ। ইচ্ছাপত্রে তিনি তাঁর এস্টেটের খরচে শিবের জন্য একটি মন্দির স্থাপনের আদেশ লিপিবদ্ধ ক'রে যান। 'বঙ্গবাসী'র বিপদে

বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। সে জন্যই হয়তো কৃতজ্ঞ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' উপন্যাসের একটি বর্ণনার মধ্যে কাশীর এই বাড়িটির কথা উল্লেখ করেছিলেন।[১১০]

এই ভূ-সম্পদের কথা ছাড়াও কিছু আর্থিক আদেশ ছিল গঙ্গাপ্রসাদের উইলে। অবশিষ্ট সম্পত্তির বিষয়ে শুধু দেওয়া ছিল বিভাজনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। নিজের শ্রাদ্ধের জন্য গঙ্গাপ্রসাদ দশ হাজার টাকা খরচ করার ব্যবস্থা ক'রে যান। কিন্তু বাস্তবে তাঁর 'দানসাগর' শ্রাদ্ধে নাকি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।[১১১]

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের উইলে রয়েছে তাঁর চিকিৎসালয়-সংলগ্ন কিছু জমির উল্লেখ। এই জমিগুলি-সহ বসতবাড়ির লাগোয়া আর এক খণ্ড জমি তিনি কেনেন কলকাতার বন্দর-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। এই জমিগুলি কেনার সময়ে বন্দর-কর্তৃপক্ষ এবং গঙ্গাপ্রসাদের মধ্যে যে দলিলটি সম্পাদিত হয়েছিল, তার মধ্যে নিহিত আছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।[১১২]

১৮৭০-এর দশকে কলকাতার বন্দর কর্তৃপক্ষ[১১৩] কুমোরটুলিতে দু'টি রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। উদ্দেশ্যটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করেন। যথাসময়ে নির্মাণকার্য শেষ হলে পথ দু'টির নামকরণ করা হয় সক'স হোয়ার্ফ এবং সক স্ট্রিট। গঙ্গাতীরে নির্মিত সক'স হোয়ার্ফের সঙ্গে আপার চিৎপুর রোডের সংযোগসাধনের জন্যই তৈরি হয় সক স্ট্রিট।[১১৪] সব কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল অধিগৃহীত জমির সবটুকু কাজে লাগে নি, কিছুটা বাড়তি হয়েছে। বন্দর-কর্তৃপক্ষ তখন ঠিক করেন যে এই উদ্বৃত্ত জমির একটি অংশ (দলিলের ভাষায় 'Lot D') প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি ক'রে দেওয়া হবে। এই নিলাম পরিচালনার ভার দেওয়া হয় ম্যাকেঞ্জি লায়াল অ্যাণ্ড কোম্পানির উপর। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নিলামটিতে সর্বোচ্চ দর (টা. ১৯১৮২-৮-০) দিয়ে জমিটি কিনে নেন গঙ্গাপ্রসাদ। এর পর বন্দর-কর্তৃপক্ষ আরো দু'টি জমি ('Lot B' ও 'Lot C') গঙ্গাপ্রসাদকে ৬৯২৯ টাকায় বিক্রি করবেন বলে স্থির করেন। এ জমি দু'টি কিন্তু নিলামে তোলা হয় নি। যে তিনখণ্ড জমি গঙ্গাপ্রসাদ ক্রয় করেন, সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ এ রকম :

১. প্রথম জমি (Lot D)—আয়তন ৩. ৮৩৬৫ কাঠা। চৌহদ্দি—উত্তরে সক স্ট্রিট, দক্ষিণে তৃতীয় জমিটি (Lot C) ও গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসালয়, পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র সা'র ভাড়াটে জমি এবং পশ্চিমে বন্দর-কর্তৃপক্ষের ট্রামওয়ে (পোর্ট কমিশনার্সের রেললাইন ?—দে. ব.)।

২. দ্বিতীয় জমি (Lot B)—আয়তন ০.৫৬৪৩ কাঠা। চৌহদ্দি—উত্তরে কুমোরটুলি ঘাট স্ট্রিট, দক্ষিণে বন্দর-কর্তৃপক্ষের জমি ও নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুদাম, পূর্বে গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বসতবাড়ি এবং পশ্চিমে বন্দর-কর্তৃপক্ষের জমি।

৩. তৃতীয় জমি (Lot C) – আয়তন ০·৮২১৫ কাঠা। চৌহদ্দি – উত্তরে প্রথম জমিটি (Lot D), দক্ষিণে কুমোরটুলি (ঘাট) স্ট্রিট, পূর্বে গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসালয় এবং পশ্চিমে বন্দর-কর্তৃপক্ষের জমি।

'আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী' নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ। এটিই ছিল ভারতের প্রথম মাসিক আয়ুর্বেদ পত্রিকা।[১১৫] পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক হয়েছিলেন গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীপ্রসন্ন সেন।[১১৬] পিতার মতো ভগবতীপ্রসন্নও ছিলেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারঙ্গম। মৃত্যুকালে গঙ্গা-প্রসাদ তাঁর চিকিৎসালয়টি যে ভগবতীপ্রসন্নকেই দিয়ে যান, তা আমরা তাঁর ইচ্ছাপত্র থেকে আগেই জেনেছি। গঙ্গাপ্রসাদের মৃত্যুর পর থেকে ১৩.৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসালয়টি পরিচালনা করার পর পরলোকগমন করেন ভগবতী-প্রসন্ন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র একান্ন বছর। দীর্ঘদিন তিনি দক্ষিণ দমদম পুরসভার কমিশনার ছিলেন।[১১৭]

গঙ্গাপ্রসাদ ও ভগবতীপ্রসন্নের মতো সেন-পরিবারের যে তৃতীয় সদস্যটির নামে কলকাতায় রাস্তা আছে, তিনি হলেন গঙ্গাপ্রসাদের ছোট ভাই অন্নদাপ্রসাদ সেন। গঙ্গাপ্রসাদের মতো অন্নদাপ্রসাদও ছিলেন প্রথিতযশা কবিরাজ। সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু নিজের স্মৃতিকথায় তাঁকে অভিহিত করেছেন 'আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত' বলে।[১১৮] গঙ্গাপ্রসাদের চেয়ে অন্নদাপ্রসাদ ছিলেন এগারো বছরের ছোট। অন্নদাপ্রসাদের জন্ম হয় ১২৪২ বঙ্গাব্দের ১৩ কার্তিক। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র ছাড়াও বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ, ষড়দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর ছিল দারুণ দখল। কাশী, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গা থেকে পণ্ডিতেরা তাঁর কাছে আসতেন শাস্ত্রীয় মীমাংসার জন্য। তিনি মাধব করের বিখ্যাত নিদান গ্রন্থের টীকাও রচনা করেছিলেন। তন্ত্রচর্চায় আগ্রহী অন্নদাপ্রসাদ সেনবাড়ির দুর্গা ও কালীপুজোয় নিজেই তন্ত্রধারকের কাজ করতেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৩ চৈত্র তাঁর মৃত্যু হয়।[১১৯] অন্নদাপ্রসাদ থাকতেন দর্জিপাড়ার ১১, হরি বসু লেনে। তাঁর কোনো পুত্রসন্তান ছিল না, চিন্ময়ী দেবী নামে একটি মাত্র মেয়ে ছিল। অন্নদা-প্রসাদের পর তাঁর জামাই সারদাপ্রসাদ মজুমদার এবং দৌহিত্র হরপ্রসাদ মজুম-দার দর্জিপাড়ায় কবিরাজী করতেন। হরপ্রসাদের পুত্রেরা কিছুদিন হল বাড়িটি বিক্রি ক'রে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন।

গঙ্গাপ্রসাদের আমলে রথযাত্রার সময় তাঁদের গৃহদেবতার রথকে কেন্দ্র ক'রে যে সংকীর্তনের আয়োজন হতো, তা 'মনোমোহন বসু স্ট্রিট' প্রসঙ্গে আমরা আগেই বলেছি। অন্যান্য উৎসবেও যে সেনবাড়িতে নাচ-গান-যাত্রার আসর বসত সে কথা জানা যায় অধ্যাপক কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা থেকে :

কুমারটুলীতে গঙ্গাতীরস্থ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের বাটীর দুর্গোৎসবে শহরবাসীরা প্রতিমাদর্শন যাত্রাগান পুতুলনাচ তৎকালে প্রচলিত পূজার পনর দিন পূর্বে

চণ্ডীর গান শুনিতে যাইত। এবং পূজার কয়দিন কলিকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকের জন্য বাঈ খেমটার নাচ ও গান হইত। তৎকালের প্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকাদের মজলিশ হইত। বিজয়া দশমীর দিন সকালে পল্লীর পুরমহিলা-গণের শুনিবার জন্য মহিলা গায়িকা দ্বারা বাউল কীর্তনের ব্যবস্থা হইত।

পূজার কয়দিন একদিকে যেমন দীয়তাং ভুজ্যতাম চলিত আবার তৎসঙ্গে আমোদ-উৎসবের নানা আয়োজনে কুমারটুলী পল্লীটি মুখরিত হইয়া উঠিত। গঙ্গাপ্রসাদ স্বয়ং দাঁড়াইয়া বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনা করিতেন এবং উৎসবে কোন বিষয়ে কোন অঙ্গহানি না হয় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও এই বিষয়ে তাঁহার কোন শৈথিল্য ছিল না।[১২০]

গঙ্গাপ্রসাদের পুত্রদের আমলেও এ রীতি অব্যাহত ছিল। গঙ্গাপ্রসাদের ভাগিনেয় ও ছাত্র বিজয়রত্ন সেন পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি হিসাবে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পেয়েছিলেন। বিজয়রত্নের আমন্ত্রণে কবি নবীনচন্দ্র সেন নিজের 'কুরুক্ষেত্রে'র অভিনয় দেখার জন্য সেনবাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন ভগবতীপ্রসন্নের আমলে। সে বিষয়ে তিনি নিজের আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

> কলিকাতায় একদিন সুহৃদশ্রেষ্ঠ বিজয়রত্ন বলিলেন যে আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্রা করিয়া ভূষণদাসের দল গাইতেছে। তিনি উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে। প্রথিত-নামা চিকিৎসক ৺গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গানে বিজয়রত্ন স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি বালক অভিমন্যুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে। সে ঠিক যেন আমার কল্পনার অভিমন্যু। তাহার যেরূপ মধুর কণ্ঠ, সেরূপ সুন্দর দীর্ঘমূর্ত্তি, তেমনই বিষাদ গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরবব্যঞ্জক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও রঙ্গালয়েও দেখি নাই।...৺গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীবাবুর আদরের ও আহারের আবদারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্যুর অভিনয়ে, মুগ্ধ হইয়াছিলাম।[১২১]

নবীনচন্দ্রের মতো আর একজন সাহিত্যিকও ঘটনাচক্রে এসেছিলেন সেনবাড়িতে। তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দু'জনের আগমনের মধ্যে একটু ফারাক ছিল। নবীনচন্দ্র এসেছিলেন পরিণত বয়সে, আর বালক বিভূতিভূষণ আসতেন বাবার সঙ্গে। বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন খ্যাতনামা কথক। তিনি যখন সেনবাড়িতে কথকতা করতেন, তখন তাঁর সাথে গলা মেলাতেন শিশুপুত্র বিভূতিভূষণ। কথিত আছে, একবার নাকি বিভূতিভূষণের সুমিষ্ট বাচন-ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে ভগবতীপ্রসন্ন তাঁর দু'হাতে দু'গাছি বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বিভূতিভূষণের সেনবাড়িতে শেষ আগমন ঘটে ন'বছর বয়সে।[১২২] এর দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার এসেছিলেন সেনেদের চিকিৎসালয় এবং ভদ্রা-

সনে। সে কথা বিভূতিভূষণ লিখে রেখে গেছেন তাঁর 'উর্মিমুখর' বইটিতে :

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলুম গঙ্গার ধারে। গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিস্‌পেন্‌সারির মধ্যে অয়েল-পেন্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটিতে আছে— বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতীপ্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়িটা সেই রকমই আছে, তবে খুব পুরনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে, সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুনরায় ঢুকবার মধ্যে,…কত কথা মনে হোল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় অয়েল পেন্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজাবাবুর সঙ্গে ওদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরনো আমলের ছবি টাঙানো, সে সব ছবি আর এখন মেলে না। উঠোনের সেই জায়গাটি যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূষণ দাসের যাত্রার দলে, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরনো হয়ে গিয়েচে।[১২৩]

'উর্মিমুখর'-এর রচনাকাল ১৯৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দ। কাজেই ঐ সময়েই নিশ্চয়ই বিভূতিভূষণ গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কাছে এসেছিলেন।

বহু বছরের ব্যবধানের পর আবার সেনবাড়িতে এসে বিভূতিভূষণের চোখে সব কিছুই বড় পুরনো ঠেকেছিল। দেওয়ালে টাঙানো দুষ্প্রাপ্য ছবির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছিল জীর্ণ দেওয়াল, বাল্যস্মৃতির মাধুর্য ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল রূঢ় বর্তমান।

আয়ুর্বেদের সর্বাঙ্গেও যেন একই রকমভাবে বাসা বেঁধেছে যুগ-যুগান্তরের জীর্ণতা। তার জনপ্রিয়তার গাঙে এখন শুধুই ভাঁটার টান। সেই জন্য সেনবাড়ির অধিকাংশ সদস্যই আজ পৈতৃক পেশার বদলে প্রবেশ করেছেন অন্যান্য জীবিকার জগতে। বর্তমানে গঙ্গাপ্রসাদের ধারার বাহক তাঁর জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র কবিরাজ জ্যোতিপ্রসন্ন সেন।

কুমোরটুলি স্ট্রিটে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাপ্রসাদের ভদ্রাসন ও চিকিৎসালয়। সময়-সচেতন বংশধরদের গৌরবে গঙ্গাপ্রসাদের ভদ্রাসনটির বর্ণাঢ্য বহিরঙ্গ ঝকঝক করছে। তুলনায় চিকিৎসালয়টি হৃতসৌন্দর্য ও জীর্ণ। রূপকথার সুয়োরানী-দুয়োরানীর মতো বাড়ি দু'টি যেন এক পরস্পরবিরোধী অস্তিত্বে বিরাজিত॥

উল্লেখপঞ্জি

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা – ৫১, মনোমোহন বসু,

সাহিত্য-পরিষৎ, ২য় সং, ১৩৬৩, পৃ. ২৭. [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'সা-সা-চ' নামে উল্লিখিত]।

২ সুবোধ চৌধুরী, কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু (জীবনী ও সাহিত্য), অশোক পুস্তকালয়, ১৯৮৩, পৃ ৪।

৩ অনেকের ধারণা আছে যে 'বসু' পদবী শুধু কায়স্থ-দেরই হয়। এ ধারণা ভুল। উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও 'বসু' পদবী আছে। বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার দেনুড় ও ভুয়াড়ি গ্রামে, বর্ধমান থানার কাদরা-কাষ্ঠকুড়ুম্ব গ্রামে এবং অন্যত্র বসু-উপাধিবিশিষ্ট বর্ধিষ্ণু উগ্রক্ষত্রিয় পরিবার আছে। এই 'এফিডেভিট'-এর যুগে অবশ্য অনেকেই 'বসু' উপাধি গ্রহণ করেছেন। সেই জন্যই শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক কর্মকার, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বারুজীবী, বৈশ্যকপালী, ব্রাহ্মণ, মালী, সবিতৃ ও সূত্রধরদের মধ্যেও 'বসু' পদবী খুঁজে পেয়েছেন (দ্র. খগেন্দ্র-নাথ ভৌমিক, পদবীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, মিত্রলোক, ১৩৮৯, ঘ-বিভাগ, পৃ ১৭)।

৪ দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক, বংশ গৌরব, ১৩৪৭, পৃ ৩০-৩২, ৫২, ৬০, ৭১।

৫ এই কিংবদন্তিকে বিশ্বাস ক'রে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারও ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'এই বংশের আদি পুরুষের বাস ছিল গড় গোবিন্দপুরে। ইংরাজ সরকার এই অঞ্চল অধিকার করায় এই বংশের তদানীন্তন পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি বসু গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া বারাসতের নিকটবর্ত্তী ছোট জাগুলিয়া নামক গ্রামে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন।' দ্র. বংশ-পরিচয়, ২৬শ খণ্ড, গ্রন্থকার, ১৩৫৬, পৃ ১৫৯)। চক্রপাণি ছিলেন কবি মালাধর বসুর জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ। কাজেই তাঁর পক্ষে ইংরেজ কোম্পানির সমসাময়িক হওয়া যে একান্ত অসম্ভব, তা বলাই বাহুল্য।

৬ 'So long as the Afghan rule continued, the Basu family (the descendants of Purandar) maintained its social influence and opulence. After 1576 Mughal imperialistic control spread over Bengal, followed by the collapse in the fortunes of the old *gosthipati* family. The transfer of power from Afghan to Mughal rulers severely affected the fortunes of many leading families of Bengal.…The end of the Afghan rule had caused a dispersal of *Kulins* (families of the highest purity of descent) in western Bengal.' See, Pradip Sinha, *Calcutta in Urban History*, Firma KLM, 1978, p 87.

৭ পূর্ণিমা সিংহ, 'সত্যেন বসুর ব্যক্তিত্ব ও মননের ধারা', দেশ, ২৯ অকটোবর ১৯৭৭, পৃ ৯-১।

৮ তদেব।

৯ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, নবভারত পাবলিশার্স, ২য় সং, ১৯৮৩, পৃ ১০১।

১০ সুকুমার সেন, দিনের পরে দিন যে গেল, আনন্দ পাবলিশার্স, ২য় সং, পৃ ১০১।

১১ সুনীল দাস সম্পাদিত, মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি, সাহিত্য-লোক, ১৯৮১, পৃ ৭ [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'ডায়েরি' নামে উল্লিখিত]

১২ প্রোফেসর বোসের অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, মনোমোহন লাইব্রেরী, ১৩০৯, পৃ ১০৭, ১১২, ১২৫।

১৩ 'লর্ড রিপনের বিদায় উপলক্ষে বেলগাছিয়া উদ্যানে যে সম্বর্ধনা হয়, তাহাতে বাগবাজারের শৌখিন হাফ্-আখড়াই-এর দল মনোমোহন রচিত একটি গান গাহিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। এটিকে রাজভক্তির গান বলিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না। সে যুগের স্বাদেশিকতার সঙ্গে রাজানুগত্যের কোন বিরোধ ছিল না। আনন্দমঠে বঙ্কিমের শেষ কথা—"ইংরাজ মিত্র রাজা"। যিনি "বাজ রে শিঙা, বাজ এই রবে" বলিয়া বাঙালীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিও রাজ-প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। ১৮৭৩ সালে অভিনীত কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতমাতা নাটকেও দেখি ইংরাজের শুভ-বুদ্ধির প্রতি লেখকের বিশেষ আস্থা। আজ আমরা যাহাকে 'পলিটিক্স অব পিটিশন' বলিয়া অবজ্ঞা করি, তাহার মূলেও ইংরাজ সম্বন্ধে আমাদের এই আস্থা এবং ইহা আমরা কোনদিন একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।…এক অর্থে আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারা এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের পালা।…উনবিংশ শতাব্দীর রাজানুগত্য ও দেশপ্রীতির সমন্বিত ভাবটি বুঝিতে হইলে এই কথাটি স্মরণ করিতে হইবে।'—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'মনোমোহন বসুর স্বদেশী গান', দেশ, ৫ ফাল্গুন ১৩৬২, পৃ ১৭৩-৭৪।

১৪ সমাজচিত্র (পূর্ব ও বর্তমান) অথবা কেঁড়েলের জীবন, ডায়েরি, পৃ ৯৬।

১৫ তদেব, পৃ ১২৫। ১৬ তদেব, পৃ ১০০। ১৭ তদেব, পৃ ৯৬।

১৮ তদেব, পৃ ৯৭। ১৯ তদেব, পৃ ১০০। ২০ তদেব, পৃ ১০২।

২১ ডায়েরি, পৃ ২৩।

২২ সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, মনোমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্রও পিতার জন্মবর্ষ ও জন্মস্থান সম্পর্কে ভুল করেছিলেন (নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৫৬৯)। বাণীনাথ নন্দী মনোমোহনের ডায়েরি দেখে জন্মতারিখটি ঠিক করলেও জন্মস্থান হিসাবে ছোট জাগুলিয়ার নাম উল্লেখ করেছিলেন (জন্মভূমি, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ ১৬)। এই ভুলগুলি প্রথম সংশোধন করেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সা-সা-চ, পৃ ৬-৭)।

২৩ ডায়েরি, পৃ ১৭।

২৪ কেঁড়েলের জীবন, ডায়েরি, পৃ ৯৬।

২৫ প্রবোধচন্দ্র বসু, 'কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী)', নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ ৫৭০-৭১।

২৬ তদেব, পৃ ৫৭২। ২৭ তদেব, পৃ ৫৭১। ২৮ তদেব, ৫৭২-৭৩।

২৯ ডায়েরি, পৃ ৪৬।

৩০ হোগলকুঁড়েতে আজও আছে শিবচন্দ্র গুহ-র কালীবাড়ি। শিবচন্দ্রের পুত্র অভয়চরণের নামে 'অভয় গুহ রোড' নামে একটি রাস্তাও আছে ঐ অঞ্চলে। স্বনামধন্য কুস্তিগীর গোবর গুহ এই পরিবারের সন্তান।

৩১ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় (সংকলক ও প্রকাশক), মনোমোহন-গীতাবলী, ১৮৮৩, পৃ ৫ [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'গীতাবলী' নামে উল্লিখিত]।

৩২ রামমোহন মল্লিক ছিলেন ধনকুবের নিমাইচরণ মল্লিকের পঞ্চম পুত্র। রামমোহনের নামে বড়বাজারে একটি রাস্তা আছে।

৩৩ গীতাবলী, পৃ ১৩-১৪।

৩৪ যদুলাল মল্লিক ছিলেন রামমোহনের ছোট ভাই মতিলাল মল্লিকের পোষ্যপুত্র। যদুলালের নামে পাথুরিয়াঘাটায় রাস্তা আছে।

৩৫ গীতাবলী, পৃ ১৫।

৩৬ তদেব, পৃ ২১।

৩৭ রাজা রাজকৃষ্ণ দেব ছিলেন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণ দেবের পুত্র। রাজকৃষ্ণের নামে হাতিবাগানের কাছে একটি রাস্তা আছে।

৩৮ গীতাবলী, পৃ ২৮-৩১।

৩৯ নন্দলাল বসু বাগবাজারের বিখ্যাত বসু পরিবারের সন্তান। নন্দলালের নামে বাগবাজারে একটি রাস্তা আছে।

৪০ গীতাবলী, পৃ ৩৩।

৪১ তদেব, পৃ ৫৪।

৪২ ঈশ্বরচন্দ্র নান ছিলেন হুগলি জেলার রাজবলহাটের তন্তুবায়কুলের সন্তান। কলকাতায় এসে ঈশ্বরচন্দ্র স্টিভেডোরিং-এর ব্যবসার কল্যাণে সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। হোগলকুঁড়ের শিবচন্দ্র গুহ ছিলেন ঈশ্বর নানের বন্ধু। দুই বন্ধুই দু'টি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দু'টি নিস্তারিণী কালী স্থাপন করেন। ২৫ নম্বর বেথুন রো-তে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী নবরত্ন কালীমন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরে শ্রীধর শালগ্রাম শিলাও আছেন। নবরত্ন মন্দির প্রাঙ্গণের দু'পাশে দু'টি আটচালা শিবমন্দির আছে। ঈশ্বর নানের মূল ভদ্রাসন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তাঁর দুই পুত্র মতিলাল ও শ্যামলাল বাস করতেন যথাক্রমে ৩৬ ও ১৮ বেথুন রো-তে। নান পরিবারের সদস্যরা এখনো সেখানে

রয়েছেন।

৪৩ গীতাবলী, পৃ ৬৪। ৪৪ তদেব, পৃ ৬৭, ৭০, ৭৫।

৪৫ তদেব, পৃ ৭৫-৭৬। ৪৬ তদেব, পৃ ৯১-১০৩। ৪৭ তদেব, পৃ ১১১।

৪৮ তদেব, পৃ ১১২। ৪৯ তদেব, পৃ ১১৪।

৫০ রামকানাই অধিকারীর ঠাকুরবাড়ির ঠিকানা ১, বাবুরাম শীল লেন। রামকানাই-এর নামে বৌবাজার অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে।

৫১ গীতাবলী, পৃ ২০৪।

৫২ তদেব, পৃ ২২৬-২২৭।

৫৩ সা-সা চ, পৃ ১০-১১।

৫৪ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, 'মনোমোহন বসু', ভারতবর্ষ, ১৮শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৭, পৃ ৩০৬ [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ' নামে উল্লিখিত]।

৫৫ সা-সা-চ, পৃ ২০।

৫৬ বৌবাজারের এই শখের নাট্যদলটির বিষয়ে বিশদ তথ্যের জন্য দ্র. শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, 'বহুবাজারের প্রাচীন নাট্যসমাজ', বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩০, পৃ ৭৬৪-৭১।

৫৭ মনোমোহন বসু, হরিশ্চন্দ্র নাটক, ১৭৯৬ শকাব্দ ; পৃ ১০৯।

৫৮ তদেব, পৃ ১৫০।

৫৯ নব্যভারত, পৌষ ১৩২৪, পৃ ৪৮৩।

৬০ যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩৫২, পৃ ৩৭-৩৮।

৬১ চন্দ্রশেখরের আমলে কলকাতায় তিনটি সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছিল। সেগুলি হল – ১. 'যোড়াসাঁকো চাষাধোপাপাড়ায় বিন্দু পালিতের গলিতে ১১ নং পাকা দোতলা বাটী জমি আন্দাজ /১ কাটা ইহার বর্ত্তমান মূল্য আন্দাজ ১৫০০ টাকা পনর শত টাকা হইতে পারে…। ইহার চৌহদ্দী এইরুপ উত্তরে রমানাথ চক্রবর্ত্তীর বাটী পুর্ব্ব নবার মাতার বাটী দক্ষীণ ৺রাজু ঘোষের বাটী এবং পশ্চীম বিন্দু পালিতের লেন নামক প্রকাশ্য গলি রাস্তা।' এ বাড়িটি কেনা হয়েছিল চন্দ্রশেখরের পত্নী হেমকুমারী দেবীর নামে।

২. 'অপার সাকুলার রোডের বহির্গত জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ডিহি ৫৫ গ্রামের সামিল গড়পার নামক পল্লীতে বাহির মেজাপুর লেনে ৬ নং পাকা দোতলা বাটী জমি আন্দাজ /২ দুই টাকা [ভুল ; 'কাঠা' হবে – দে. ব.] ইহার বর্ত্তমান মূল্য আন্দাজ ১২০০ এক হাজার দুই শর্ত্ত টাকা হইতে পারে…। ইহার চৌহদ্দী এইরুপ পশ্চিমে রেয়েতী গলি রাস্তা, দক্ষীণে গলি রাস্তা ও ভোলানাথ ঘোষের বসত বাটী পুর্ব্ব সরকারি ড্রেন ও ৺কেনারাম

দের জমী এবং উত্তরে কৃষ্ণমোহন সীংহের বশত বস্তী'। প্রথম বাড়িটির মতো এ বাড়িটিও কেনা হয় হেমকুমারী দেবীর নামে। এ বাড়ি দু'টি পড়ে হেমকুমারীর ভাগে।

৩. 'শীমুলিয়া পল্লীতে করণওয়ালীষ স্ট্রেটে ২০২ নং পাকা দোতলা বাটী মায় তলাস্থ জমি আন্দাজ /২ দুই কাটা ইহার বর্ত্তমান মূল্য আন্দাজ ২৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা হইতে পারে…। ইহার চৌহদ্দী এইরূপ পুর্ব্ব করনওয়ালিশ ষ্ট্রীট নামক প্রকাশ্য রাস্তা দক্ষীণে ডাক্তার ব্রজনাথ বন্ধুর প্রেসিডেন্সী মেডিকেল হাল নামক ডাক্তার খানা পশ্চীমে উক্ত ডাক্তার খানার গুদামবাটী, এবং উত্তরে তেজনারায়ণ বস্থর [বাবুর ? – দে. ব.] ২০১ নং ভাড়াটীয়া বাটী।' এ বাড়িটি পড়ে মনোমোহন ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভাগে। উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত হল সম্পত্তি-বিভাজনের দলিল থেকে।

৬২ দলিলটি থেকে দেখা যায় যে বসু পরিবারের যৌথ সম্পত্তির মধ্যে ছোট জাগুলিয়ায় ভদ্রাসন ছাড়াও একাধিক বাগান ও পুকুর ছিল।

৬৩ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; পৃ ৩০৫।

৬৪ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাঙালীর সার্কাস, ২য় সং, পাবলিসিটি ষ্টুডিও, ১৩৪৫, পৃ ১১-১৩ [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'বাঙালীর সার্কাস' নামে উল্লিখিত]।

৬৫ তদেব, পৃ ২০-২১। ৬৬ তদেব, পৃ ২১-২৪। ৬৭ তদেব, পৃ ২৯।

৬৮ তদেব, পৃ ৩১। ৬৯ তদেব, পৃ ৩৪-৩৫। ৭০ তদেব, পৃ ৩৪।

৭১ তদেব, পৃ ৩৫। ৭২ তদেব, পৃ ১৯১। ৭৩ তদেব, পৃ ১৯১-৯২।

৭৪ তদেব, পৃ ১৯৩। ৭৫ তদেব, পৃ ১৯৭। ৭৬ তদেব, পৃ ১৯৮।

৭৭ ইন্দুবালা ছিলেন মতিলাল বসুর কন্যা। ইন্দুবালার মা রাজবালা ছিলেন সার্কাসের এক ক্রীড়াপ্রদর্শিকা।

৭৮ বাঁধন সেনগুপ্ত, ইন্দুবালা, মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৪, পৃ ২৫১।

৭৯ তদেব, পৃ ২৫০।

৮০ বাঙালীর সার্কাস, পৃ ১৬৭।

৮১ 'Agasti Suryyakumar—B. A. 1878 (1st Division, 2nd place) ; M. A. 1879 (1st Class, 1st in Philosophy) ; PRS 1881. Lecturer, Metropolitan Institution ; Assistant Professor, Dacca College. Deputy Magistrate and Deputy Collector. Stood first in the Statutory Civil Service Examination of 1884 ; served in the Civil Service in Bengal for 28 years from 1885 to 1913 in different capacities ; Magistrate and Collector at the time of his retirement. A fine linguist with a thorough knowledge of Sanskrit and Persian, as well as

of French and Latin'. – See, Surendrachandra Majumdar and Gokulnath Dhar (Ed.), Presidency College Register, Govt. of Bengal (Education Dept.) 1927, p 85.

সূর্যকুমারের সচিত্র শোক-সংবাদের জন্য দ্র. বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩১০ ; পৃ ৬৮১-৮৩।

৮২ *The Amrita Bazar Patrika*, December 3, 1909, p 7, col. 5.

৮৩ ডায়েরি, পৃ ৭৪।

৮৪ তদেব, পৃ ১৩-১৪।

৮৫ সা-সা-চ, পৃ ২৬-২৭।

৮৬ তদেব, পৃ ৩০।

৮৭ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, বংশ-পরিচয়, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থকার, ১৩৩৫, পৃ ৩০৬। [পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'বংশ-পরিচয়' নামে উল্লিখিত]।

৮৮ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গভাষার লেখক, বঙ্গবাসী, ১৩১১, পৃ ৭৬৪।

৮৯ বংশ-পরিচয়, পৃ ৩০৬।

৯০ Lokenath Ghose, ***The Modern History of the Indian Chiefs Rajas, Zamindars & c.***, Part II, J. N. Ghose & Co., 1881, p 293. (Subsequently referred to as 'Lokenath').

৯১ বংশ-পরিচয়, পৃ ৩০৬।

৯২ Lokenath, p 293.

৯৩ গিরিজাপ্রসন্ন সেন ও জ্যোতিপ্রসন্ন সেন, স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ভারত প্রসিদ্ধ আদি আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয়, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ ৫ [এটি একটি প্রচার-পুস্তিকা। পুস্তিকাটিতে সেন-পরিবারের ইতিহাস, তাঁদের বিক্রীত ওষুধের তালিকা ও বিজ্ঞাপন আছে। পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে 'পুস্তিকা' নামে উল্লিখিত]।

৯৪ Lokenath, p 293.

৯৫ পুস্তিকা, পৃ ৫।

৯৬ Lokenath, p 293.

৯৭ পুস্তিকা, পৃ ৬।

৯৮ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭৭, সাধকভাব, পৃ ১৩২-৩৩ ও ১৭৮-৭৯। সাধকভাব অংশের কালপঞ্জি অনুযায়ী (পৃ ৪১১) গঙ্গাপ্রসাদ ১৮৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা করেন।

৯৯ তদেব, পৃ ১৭৯, পাদটীকা।

১০০ শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৭৪, অষ্টম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ ৬১।

১০১ তদেব, সপ্তদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ ১৩৮।

১০২ স্বামী সারদানন্দ, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭২, 'ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ', পৃ ২৯৬।

১০৩ Lokenath, p 293-94.

১০৪ দুর্গাচরণ রায়, দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪, পৃ ৬২৮।

১০৫ Lokenath, p 294. রমানাথ কবিরাজের নামে বৌবাজার অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে।

১০৬ 'আমাদের হাজত', প্রথম অধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী (স. নির্মল দাশ), তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থমেলা, ১৯৮৬, পৃ ৫১৭।

১০৭ যোগেন্দ্র স্মরণী, দ্বিতীয় পর্ব, অষ্টম অধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থমেলা, ১৯৮২, পৃ একত্রিশ।

১০৮ তদেব, পৃ তেত্রিশ। মহেন্দ্রকুমার বসুর মতে, গঙ্গাপ্রসাদ সেন লাখ টাকার জামিন দাঁড়িয়েছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের বংশধরদেরও একই মত (দ্র. পুস্তিকা, পৃ ৭)। কিন্তু অন্য সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে ভিন্ন তথ্য: 'Mr. Hill then applied to the Chief Justice and Mr. Justice Beverley for bail which was granted on executing a bond of Rs. 10,000 and finding two securities of Rs. 10,000 each. The well-known Kabiraj Ganga Prasad Sen and Kabiraj Bejoy Kissen Sen stood bail for the proprietor, Babu Jogindra Chandra ; Babu Gangadhur Banerjee, M. A., B. L. and Babu Surja Kanta Roy Chowdhury, Zemindar of Taki, for the editor, Babu Krishna Chandra ; Kabiraj Ganga Prasad Sen and Babu Jadu Nath Banerjee for the Manager Babu Brajaraj ; and Babus Jogesh Chunder Banerjee, the Manager of the Canning Library and Jadu Nath Sanyal for the printer, Babu Arunodoy. The accused had applied to almost all the leaders of Calcutta society. None of them ventured to come forward for fear of offending the powers that be. Old Ganga Prasad, by coming forward himself and inducing others to join him, showed the superiority of his mettle to that of the Rajas and Rajalings of the metropolis who had, as long as there was no danger, *Sabashed* the ***Bangabashi*** for those strong articles that were

the cause of its misfortune but who at the first note of danger all fell away.' – See, 'An Old Journalist, History of the Native and Anglo-Indian Journals of Bengal', in ***The National Magazine***, April 1896, p 146. Reprinted in Alok Ray (ed.), ***Nineteenth Century Studies***, No. 7, Bibliographical Research Centre, 1974, p 324-321.

১০৯ এই বাড়িটির ঠিকানা নিয়ে বোধ হয় কোনো রকম গণ্ডগোল ছিল। সে জন্যই হয়ত এরকম অদ্ভুতভাবে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে।

১১০ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থমেলা, ১৯৮৬, পৃ ১৫৭।

১১১ পুস্তিকা, পৃ ৮।

১১২ দলিল সম্পাদনের তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯।

১১৩ দলিলের ভাষায় : '....The Commissioners for making improvements in the Port of Calcutta (a Corporation created under Act V of One thousand Eight hundred and Seventy of the Council of the Lieutenant Governor of Bengal ...).'

১১৪ দলিলের ভাষায় : '....the Government of Bengal sometime since under the provisions of Act X of One thousand Eight hundred and Seventy of the Legislative Council of India acquired certain lands and hereditaments for and on behalf of the said Commissioners for public purposes (that is to say) for the purpose of opening out a new River Side Road and also a new Road connecting the new said River Side Road with the Upper Chitpore Road and which have since been called or known by the respective names of Schalch's Wharf and Schalch's Street in Coomartoolee in Calcutta....'

১১৫ পুস্তিকা, পৃ ৭।

১১৬ তদেব, পৃ ১২।

১১৭ তদেব।

১১৮ চন্দ্রনাথ বসু, পৃথিবীর সুখ দুঃখ, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ১৩১৫, পৃ ৬৪।

১১৯ পুস্তিকা, পৃ ৯-১০।

১২০ কুমুদবন্ধু সেন, 'আয়ুর্ব্বেদের এক গৌরবময় যুগ', লোকসেবক, ১৫ চৈত্র ১৩৬৪, ২৯ মার্চ ১৯৫৮।

১২১ নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, পঞ্চম ভাগ, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী, ১৩২০, পৃ ৩৪৬।

১২২ ঊর্মিমুখর, বিভূতি-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৯২, পৃ ৪৪৮–৪৯।

১২৩ তদেব, ৪৪৩।

স্বীকৃতি

মনোমোহন বসু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে আমার প্রধান সহায় হয়েছেন তাঁর একমাত্র জীবিত পৌত্র শ্রী সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু। প্রোফেসার প্রিয়নাথ বসুর দৌহিত্র শ্রী ভবানীপ্রসাদ দত্ত-ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ছোট জাগুলিয়া গ্রামে সরেজমিন অনুসন্ধানে সঙ্গী হয়ে এবং পুরাকীর্তিগুলির কাল নির্ণয়ে সাহায্য ক'রে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রী তারাপদ সাঁতরা। ছোট জাগুলিয়া পরিক্রমাকালে প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন গ্রামটির দুই প্রবীণ অধিবাসী শ্রী বলাইপদ দত্ত ও শ্রী পশুপতি বসু। মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত চিঠিটি পেয়েছি শ্রী প্রমোদকুমার বিশ্বাসের সৌজন্যে। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য শ্রী জ্যোতিপ্রসন্ন সেনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। তাঁর আনুকূল্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্যচয়নে পোষকতা করেছেন শ্রী অশোক উপাধ্যায়, শ্রী মৃদুলকান্তি বসু, শ্রী সুনীল দাস, ডাঃ অরূপকুমার কর, শ্রী সচ্চিদানন্দ নান, শ্রী অমিত রায়, শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী ও শ্রী গৌতম বসু মল্লিক।

অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

জাক দেরিদা

বা দর্শনের আত্মহত্যা

তত ক্ষণ তৃষ্ণাস্ফীত আমি, / সর্বেসর্বা নাস্তির প্রণামী /
না যোগায় সত্তা যত ক্ষণ ॥
—পোল ভালেরি (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত আগে যিনি ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি অবশ্যই জঁা পল সার্ত্র। ১৯৩৬-এ প্রকাশিত তাঁর নতিদীর্ঘ দার্শনিক প্রবন্ধ 'অহং-এর অতিক্রমণ' La transcendence de l'ego) ও ১৯৩৯-এর উপন্যাস 'বিবমিষা' (La Nausee) যে নতুন চিন্তার ইঙ্গিত দিয়েছিল তা ক্ষণিকের কলরব তুলে সহজে মিলিয়ে যায় নি। এই দুই রচনার মধ্যে ধ্বনিত একাধারে বিশুদ্ধ চৈতন্য ও নাস্তির অভেদ এবং অন্য ধারে মানুষী অস্তিত্বের অর্থহীনতা—এ দু'য়ের যুগ্ম আকর্ষণ ও প্রভাব অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল। ফরাসি সাহিত্য বা চিন্তায় নাস্তিবোধ কিছু অভাবনীয় অভিজ্ঞতা নয়। কিন্তু যা তরুণ সার্ত্রের চিন্তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল তা তাঁর পদ্ধতিবদ্ধ দার্শনিক যুক্তি, যার আলোকে তিনি মানুষী চৈতন্যকে কেন্দ্রচ্যুত ক'রে এক অন্তহীন শূন্যতার দিকে ঠেলে নিয়ে যান। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এটা নতুন; এমন কি হেগেলও এতদূর যান নি, যে কারণে সে-সময়ে অনেকেই সার্ত্রকে ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিকদের সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা করেন নি। মোটামুটি এ ব্যাপারগুলো জানা এবং এটাও কিছু অবিদিত নয় যে সার্ত্র তাঁর তারুণ্যের চিন্তায় আজীবন প্রোথিত থাকেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও নাৎসি দখলের প্রচণ্ড সংঘাতেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠে পৌছে সার্ত্র তাঁর যৌবনের চিন্তার প্রায় সবটাই ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করেন। ১৯৪৫-এ প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি নিজেকে 'হিউম্যানিস্ট' বলে দাবি করেন এবং ১৯৪৭-এ তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'ল তাঁ মদের্ন'-এ ধারাবাহিক-

ভাবে প্রকাশিত ও অতিশয় সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য কি বস্তু?' (Qu'est ce que la litte'rature ?)-র মধ্যে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রথম প্রকাশ পেল। উত্তরকালে সার্ত্র এই আকর্ষণ থেকে আর মুক্ত হতে পারেন নি।

কিন্তু তরুণ সার্ত্রের পৌরোহিত্য ও শিক্ষকতা বিফলে যায় নি। যাঁরা তখন বয়সে আরো তরুণ, এমনকি যাঁরা তখনো স্কুলে, তাঁদের অনেকেরই মননশীলতার হাতেখড়ি সার্ত্রীয় চিন্তার মাধ্যমে এবং তাঁদের চিন্তার উপর সার্ত্রীয় দর্শনের (প্রথম দিককার) প্রভাব হয় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং দু'জনেই বর্তমান ফরাসি সংস্কৃতির দুই প্রধান প্রতিনিধি ; একজন সাহিত্য সমালোচক ও আলংকারিক, সম্প্রতি প্রয়াত, রোলাঁ বার্থ (Roland Barthes) ও অন্যজন দার্শনিক জাক দেরিদা (Jacques Derrida)। বার্থের ক্ষেত্রে সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের প্রভাব খুব সহজেই নীরিক্ষ্য। ১৯৫৩-তে প্রকাশিত বার্থের প্রবন্ধ-সংকলন 'রচনার শূন্য ডিগ্রি' (Le degre' ze'ro de l'e'criture) যা বার্থকে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত করে, যার মধ্যে লেখক ব্যাকরণের বিশ্লেষণে রচনাকে কেন্দ্রচ্যুত ক'রে এটা দেখাতে তৎপর হয়েছিলেন, কিভাবে অতীত কালের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে উনিশ শতকের বুর্জোয়া ফরাসি উপন্যাসগুলি এক মনগড়া রূপকথার সৃষ্টি ক'রে অস্তিত্বের বহুমুখী জটিলতা ও বৈক্লব্যকে পরিহার করেছে — সে প্রবন্ধগুলির ভাঁজে ভাঁজে সার্ত্রের 'সাহিত্য কি বস্তু?'-র প্রভাব জাজ্বল্যমান। বার্থও ঋণ স্বীকারে ত্রুটি রাখেন নি। অবশ্য বার্থ পরে স্ট্রাকচারালিস্ট ও চিহ্নতাত্ত্বিক (Semiologist) হয়ে সার্ত্রের বিরাগভাজন হন। দেরিদার ক্ষেত্রে তরুণ সার্ত্রের প্রভাব কথঞ্চিৎ জটিল এবং খুব সহজে অনুমেয় নয়। বোধহয় এই কারণে দেরিদার মার্কিন টীকাকাররা প্রায় কেউই সার্ত্রের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন না, কিন্তু বার্থের মতো দেরিদাও সার্ত্রীয় প্রভাবের মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন। অবশ্য বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তি দেরিদা, বার্থ নন।

দেরিদার ব্যক্তিগত জীবনে এমন কোনো লোমহর্ষক ঘটনা নেই যা কোনো পেশাদার জীবনীকারকে আকর্ষণ করতে পারে। মামুলি বুদ্ধিজীবী অধ্যাপকের জীবন। জন্ম ১৯৩০-এ তৎকালীন ফরাসি আলজিরিয়ার একটি ফরাসি-ভাষী ইহুদি পরিবারে। সেখানে স্কুলে শিক্ষা শেষ ক'রে ফ্রান্সে আসেন — ফ্রান্সের সবচেয়ে বনেদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'একল্ নর্মালে'র ছাত্র হিসাবে ; পরে সেখানেই অধ্যাপনা। ষাটের দশক থেকে — বিশেষ ক'রে হুসেরল (Edmund Husserl) পাঠের পর দার্শনিক রচনা লিখতে শুরু করেন। দেরিদার মূল রচনার সংখ্যা খুবই সামান্য। তাঁর অধিকাংশ লেখাই — বিশেষ ক'রে যেগুলি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছে — অন্যান্য বিখ্যাত দার্শনিকদের রচনার টীকা বা সমালোচনা।

যদিও দেরিদা ধর্মে অবিশ্বাসী এবং জড়বাদী, তাঁর রচনার চরিত্র ও পদ্ধতির উপর ইহুদি ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মধ্যযুগের ইহুদি পুরোহিত বা র‍্যাবাইদের অনেকেই মূল রচনা না লিখে, তাঁদের ধর্মশাস্ত্রের উপর টীকা লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানে এটাও স্মর্তব্য যে ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত বৈদান্তিক দার্শনিক শংকরেরও মূল রচনা সামান্য; তাঁর মৌলিকত্ব মূলত বেদান্তের টীকাকার হিসাবে। দেরিদার প্রত্যেকটি রচনার উদ্দেশ্য একটি : অধিবিদ্যা বা metaphysics-এর বিরুদ্ধে অভিযান; এই অভিযান কিভাবে নানা আকারে দেখা দিয়েছে এ প্রবন্ধে সেটাই আলোচ্য।

তরুণ সার্ত্রের চিন্তায় অধিবিদ্যার কোনো স্থান নেই; তাঁর মতে অস্তিত্বের কোনো অনড় সারাংশ (essence) নেই। এডমুণ্ড্ হুসেরল – যাঁর কিছু প্রভাব সাময়িকভাবে সার্ত্রের উপর পড়েছিল – প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে এটা ধরে নিতে শুরু করেন যে মানুষের চৈতন্যের কেন্দ্রে তার নিজস্ব একটি প্রাতিস্বিক অহং বা ego আছে যা এই চৈতন্যকে পরিচালিত করছে। এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে হুসেরলের 'কার্তেসীয় অনুধ্যান' (Cartestian Meditation)-এ। এ-বক্তব্যকে সার্ত্র ধূলিসাৎ করেছেন তাঁর ঐ ছোট প্রবন্ধে, যার কথা আমি উপরে উল্লেখ করেছি এবং যুদ্ধের সময়ে লেখা তাঁর বিপুল ডক্টরাল থিসিস 'অস্তি ও নাস্তি' (L'etre et le ne'ant)-র মধ্যে। তিনি এটা দেখিয়েছেন যে অনড় হুসেরলীয় ego নামক বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই; চৈতন্যের কেন্দ্রে এমন কোনো মেরু নেই যা বস্তু বা object হিসাবে আবিষ্কৃত বা গৃহীত হতে পারে। চেতন হওয়ার অর্থই হল কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা কোনো ঘটনা সম্পর্কে চেতন হওয়া। বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং নাস্তি এক ও অভেদ। অধিবিদ্যার মূলে এটা একটা শক্তিশালী আঘাত, কারণ অনড় ধ্বংসহীন আদর্শ কোনো বস্তুর বিদ্যাই হল অধিবিদ্যা।

দেরিদার দার্শনিক জীবনও সার্ত্রের মতো শুরু হয়েছে হুসেরল-পাঠ থেকে এবং হুসেরলীয় চিন্তার বিরুদ্ধে দেরিদা যে ক'টি আঘাত হেনেছেন তার মধ্যে উপরোক্ত সার্ত্রীয় আঘাতও অন্যতম। যদি সার্ত্র উত্তরকালে তাঁর মত বদলে থাকেন ও এক অধিবিদ্যাকে আক্রমণ ক'রে অন্য একটির ফাঁদে পড়ে থাকেন, দেরিদা এখনো অবিচল ও অক্লান্তভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন অধিবিদ্যা ও তার নানারূপী অবতারদের বিরুদ্ধে। কিভাবে, কোন রণকৌশলে দেরিদা তাঁর এই অদৃশ্য প্রতিমল্লকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করছেন সেটা আলোচনার আগে একবার যাচাই ক'রে নেওয়া প্রয়োজন অধিবিদ্যা বা metaphysics বস্তুটি কি!

দেরিদা দার্শনিক রচনায় গাম্ভীর্যের অনুশীলক নন; তিনি পরিহাসপ্রিয় লোক; যে-কারণে তাঁর বিরুদ্ধে 'চ্যাংড়ামি' বা triviality-র অভিযোগ এসেছে। সুতরাং পরিহাস দিয়ে শুরু করা যাক।

উনিশ শতকের এক ভারতীয় বাঙালি কবি রগড় ক'রে গেয়েছিলেন : 'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত / পান্তুয়া শত শত' ! – এটা অবশ্যই রজনীকান্ত সেনের পরিহাস। কোনো শিশুও এমন এক জগতে নিরন্তর বাস করতে চাইবে না, যে-জগৎ সতত রানাঘাটের পান্তুয়ায় নিমগ্ন। ওটা মূল সমস্যা নয়। যেটা লক্ষণীয় সেটা এই যে এই রগুড়ে সংগীত শুরু হচ্ছে একটি অপূর্ণ ও অপূরণীয় ইচ্ছা দিয়ে। যদি···যদি···যদি জীবনে আমাশয় কিংবা অগ্নিমান্দ্য, রিউম্যাটিজ্‌ম কিংবা ক্যান্সার না থাকত; যদি গ্রাসাচ্ছাদনের প্রাত্যহিক তাগিদে প্রতি সকালে আমাদের কাজে যেতে না হতো; যদি না থাকত ধর্মঘট, মিছিল, শোভাযাত্রার আকস্মিক আবির্ভাবে না ঘটত কোনো ট্রাফিক জ্যাম্; যদি ফুটবল স্টেডিয়ামগুলো হতো গুণ্ডামিবর্জিত এবং শহরতলির ট্রেনগুলো থাকত অষ্টপ্রহর ফাঁকা; যদি এমন কোনো দেশ থাকত যেখানে 'কোথাও মৃত্যু, কোথাও বেদনা, কোথা বিচ্ছেদ নাই' – তাহলে ? তাহলে অবশ্যই জীবন হতো একটানা মধুময়। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতানির্ভর জীবনে তা হবার নয়। তাই কবি কল্পনা করেছেন, 'মহাসিন্ধুর ওপারে' এমন একটি দেশের কথা 'যেথা নাহিকো মৃত্যু, নাহিকো জরা'। এই কবি-কল্পনা এতটা গভীর ও গাঢ় দার্শনিক সমস্যার আকার নিত না যদি এটা কাব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু বস্তুত তা হয় নি। এই কাল্পনিক জগতের চিন্তা প্রথমে ধর্ম ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাকে এমন সামূহিকভাবে গ্রাস করেছে, যার ফলে দু'তিন হাজার বছরের পলাতকী অভ্যাসে, আমাদের দৈনন্দিন ভাবনা ও প্রতিন্যাস, এমন কি আমাদের প্রাত্যহিক ভাষা পর্যন্ত এই চিন্তায় দূষিত। যদি আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রপাত, বন্যা বা এতাদৃশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনো সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি ক'রে থাকেন, তাহলে কথঞ্চিৎ সভ্যতা-সঞ্চারের পর, তাঁদের অনুবর্তী ভাবুকেরা বাস্তব জীবনের গ্লানি ও বৈগুণ্যকে বোধি (intuition)-র সাহায্যে অতিক্রম ক'রে এমন এক নির্দোষ ও সর্বগুণে ভূষিত জগৎ-এর কথা চিন্তা করেছেন যার কথা একবার ভাবলেই বাস্তব জীবনে সাময়িক সান্ত্বনা মেলে। যে-বোধির সাহায্যে, শোনা যায়, এই অতিক্রমণ সম্ভব – তার অবশ্য কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই এবং এই কল্পিত জগতের কোনো বাজারি মূল্য নেই। কারণ এটা সর্বতোভাবে অসত্য।

দর্শনশাস্ত্রে এই সর্ব গুণে গুণান্বিত জগৎ বা সত্তার বিদ্যাকেই বলা হয় অধিবিদ্যা বা metaphysics; অর্থাৎ যে বিদ্যার বিষয় হল সেই জগৎ যা দৃশ্যমান, বাহ্য জগৎ বা physic (গ্রীক physis)-এর পরে বা পশ্চাতে রয়েছে (গ্রীক ভাষায় meta শব্দের অর্থ 'পর')। উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্ম এবং প্লেটোর 'আইডিয়া' থেকে শুরু ক'রে দেকার্তের কজিটো, স্পিনোৎসার ঈশ্বর, লাইবনিৎস-এর মোনাড্, হয়ে হেগেলের 'অ্যাবসল্যুট' পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে অধিবিদ্যার এক রোমহর্ষক

অভিযান ও ভ্রমণকাহিনী। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে ভাবুক মাত্রই এই অদৃশ্য অনড় জগতের মোহমুগ্ধ হয়েছেন বা এই অদৃশ্য শক্তির অধীনতা মেনে নিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকরা (যাঁরা সকলেই হিন্দু বংশজাত) বেদান্তের আনন্দরূপ অমৃতকে অগ্রাহ্য ক'রে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ, বেদনা ও নির্বেদকে একমাত্র সত্য হিসাবে ধরে নিয়ে নীতিশাস্ত্র নিয়ে চিন্তা করেছেন। প্রাচীন গ্রীসের দুর্ধর্ষ তার্কিক ও যুক্তিনিষ্ঠ সফিস্টরা মেনে নেন নি প্লেটো এবং তস্য গুরু সক্রেটিসের 'আইডিয়া'র আধ্যাত্মিক বলাৎকারকে; মেনে নেন নি উত্তরকালের গ্রীসের চরম সংশয়ীদের শিরোমণি পাইরো বা পুরো (Pyrrho এবং তাঁর শিষ্য সেক্সটুস এম্পিরিকুস (Sextus Empiricus)। ইদানীং কালেও অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছেন স্কটল্যাণ্ডের ডেভিড হিউম, জার্মানির কাণ্ট, ফরাসি বিশ্বকোষ গোষ্ঠীদের সদস্যেরা—যথা দিদেরো, অলবাঘ, বা হেলভেসিউস্। কিন্তু এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে ফলপ্রসূ হয় নি। কাণ্টের পর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাবসল্যুটের পতাকা উড়িয়ে এসেছেন হেগেল। এই ব্যর্থতার প্রভূত কারণ আছে। এঁরা প্রায় কেউই মূল সমস্যাকে স্পর্শ করেন নি; এঁরা এ-ব্যাপারে সজাগ ছিলেন না যে দর্শনে ব্যবহৃত ভাষায় অধিবিদ্যা বা অদৃশ্যের কামড় এমনই সার্বত্রিক এবং এর মধ্যে ছড়িয়ে রাখা ফাঁদ এমনই অসংখ্য যে শত্রুকে পর্যুদস্ত করা মাত্রই সে আবার পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে।

আরো সাম্প্রতিক কালে, যে দু'জন দার্শনিক অধিবিদ্যাকে আক্রমণ ক'রে মানুষী সত্তাকে অদৃশ্যের শিকল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা ফ্রিডরিশ নীচ্এ (Friedrish Nietzsche) ও আধুনিক নিরীশ্বরী অস্তিত্ববাদের প্রধান পুরুষ মার্টিন হাইদেগার (Martin Heidegger), যিনি অনেকের মতে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক। জাক দেরিদার দার্শনিক ভাবনায় এই দুই দার্শনিকের—এবং সেই সঙ্গে ফ্রয়েডের—প্রভাব সবচেয়ে গভীর এবং দেরিদা স্পষ্টভাবে এই প্রভাব স্বীকার করেছেন।

দু'টি নিম্নলিখিত কারণে এই প্রভাবের বিশদ আলোচনা আমি এ প্রবন্ধে করব না। প্রথমত, (ক) দেরিদার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পদ্ধতিবদ্ধ রচনা 'দ লা গ্রামাতোলজি'র যে অনুপম ইংরেজি অনুবাদ শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক্ করেছেন এবং এই অনুবাদের সংলগ্ন যে দীর্ঘ ও মূল্যবান ভূমিকা তিনি দিয়েছেন তার মধ্যে দেরিদার উপর এই জার্মান প্রভাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা মিলবে। এই ভূমিকা দেরিদীয় দর্শনে অভিনিবিষ্ট যে কোনো ব্যক্তির কাছে অপরিহার্য।[১] এমন কি যাঁরা মূল ফরাসিতে দেরিদা পড়তে অভিলাষী তাঁদের কাছেও এই ভূমিকাটি অবশ্যপাঠ্য। শ্রীমতী গায়ত্রী এই জার্মান প্রভাব সম্পর্কে যা লিখেছেন তার উপর আমার নতুন কিছু যোগ করার নেই। দ্বিতীয়ত, (খ) এই প্রবন্ধে

আমি জাক দেরিদাকে ফরাসি মনন ও চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে প্রচেষ্ট হয়েছি। যদিও দেরিদার উপর নীচীয়, হাইদেগারীয় ও ফ্রয়েডীয় প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত, তাঁর চিন্তার একটি অন্য — অর্থাৎ ফরাসি — দিকও আছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও, এ প্রসঙ্গে ফ্রিড্‌রিশ নীচ্‌এ সম্পর্কে দু'একটি বাড়তি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। কারণ নীচীয় দর্শনের ব্যাপক প্রভাব যেমন একাধারে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই অন্যধারে, নীচ্‌এ-র রচনা বিপজ্জনকও বটে। বিপজ্জনক এই অর্থে যে ঈশ্বর, অধিবিদ্যা ও খ্রীস্টধর্মকে আক্রমণ করার মানসে ক্রোধান্বিত হয়ে নীচ্‌এ এমন অনেক কথা বলেছেন যার সহজ ও তরল পাঠ এবং নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং নানাবিধ দলগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে তার সহজ, আক্ষরিক ব্যাখ্যা খুবই সম্ভব। শক্তির আরাধনা, দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞা ও অনুকম্পা, হিন্দু বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থনও প্রশংসা, 'মনুসংহিতা' ও তার লেখকের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা, সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ইহুদি বিদ্বেষ, সমানভাবে প্রচণ্ড নারীবিদ্বেষ, আর্য চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব — এ সবই নীচ্‌এ-র রচনায় আছে ; এগুলি সবই প্রায় বিনা পরিশ্রমে ও স্বল্প মূল্যে খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় রচনাগুলির মধ্যে — যথা, 'জরথুস্ত্রের বাণী' (ইং অনু. Thus Spake Zarathustra), 'খ্রীস্ট-বিরোধী' (The Anti-Christ), 'পাপ পুণ্যের ওধারে' (Beyond Good and Evil), 'নৈতিকতার বংশানুচরিত' (The Genealogy of Morals), 'উষা' (The Daybreak) এবং সর্বোপরি, 'শক্তির এষণা' (Will to Power)। একমাত্র 'উষা' ছাড়া এর সব ক'টি বইই সুলভ সংস্করণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা মূল জার্মানে পড়তে চান তাঁদের কাছেও নীচএ কোনো সমস্যা ন'ন, কারণ তাঁর গদ্য হেগেল কিংবা হাইদেগারের গদ্যের মতো দুরূহ ও দুষ্পাচ্য নয়। খানিকটা শোপেনহাওয়ারের প্রভাবে ও খানিকটা ফরাসি সাহিত্যের আওতায় থাকার ফলে নীচ্‌এ অতিশয় সুললিত গদ্য লিখে গেছেন। অধিকন্তু দার্শনিক রচনার প্রচলিত শৈলীকে বর্জন ক'রে, নীচএ এক খাপছাড়া ক্ষ্যাপাটে শৈলী গ্রহণ করেন, যার ফলে তাঁর রচনা থেকে — সপ্তদশ শতকের ফরাসি ভাবুক লা রশ্‌ফুকোর (La Rochefoucauld) 'বচন' বা Maximes-এর মতো — যে কোনো কয়েকটি পঙ্‌ক্তি অনায়াসে তুলে ও উদ্ধৃত ক'রে স্বার্থসিদ্ধি করা যায়। অ্যাডলফ হিটলার যখন নিজেকে নীচ্‌এ-র শিষ্য বলে দাবি করেছিলেন, কিংবা তাঁর নাৎসি অনুচরেরা যখন তিরিশের দশকে তাঁদের দলগত প্রচারকার্যে নীচ্‌এ-র একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তখন তাঁদের খুব বেগ পেতে হয় নি।

বেশ কিছু দিন নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভুগে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, প্রায় উন্মাদ অবস্থায় নীচ্‌এ মারা যান। এবং এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তৎকালীন প্রবীণ ও নবীন

দার্শনিকেরা – যথা, বের্গসন বা রাসেল, ডিল্‌থী বা হুসের্‌ল – নীচ্‌এ-কে কোনো গুরুত্ব দেননি, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীচ্‌এ-র প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল তৎকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে। যে প্রথম গোষ্ঠী নীচ্‌এ-র দ্বারা প্রভাবিত হন তাঁরা সকলেই ছিলেন মহান লেখক – যথা বর্নাড শ, আঁদ্রে জিদ্‌, ডব্লু বি ইয়েট্‌স, হেরমান হেসে, স্টেফান গেয়র্গে ইত্যাদি। এঁদের রচনায় বা ব্যক্তিগত জীবনে এমন কিছু নেই যা নিন্দনীয় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। তারপর ১৯১৪-তে লাগল প্রথম মহাযুদ্ধ ও নীচ্‌এ-রও কপাল পুড়ল। এই যুদ্ধে জয়ী হল ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবং হারল জার্মানি এবং এই দুই শিবিরে – বিজিত ও বিজেতাদের দেশে – শুরু হল শক্তির এক উন্মাদ আরাধনা; এলেন এক মুঠো তরুণ লেখক যাঁরা নীচ্‌এ-র রচনায় পেলেন ঠিক যেটি তাঁরা খুঁজছিলেন : দুর্বলের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা, নারী-বিদ্বেষ, যুদ্ধকে গৌরবান্বিত করা, ন্যায়-অন্যায় বোধের লোপ এবং সেই সঙ্গে ইহুদি-বিদ্বেষের মশলা তো আছেই। প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আমি অন্তত তিন জন লেখকের নাম করছি যাঁরা নীচ্‌এ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে 'গুরু'র বদনামই করেছেন বেশি। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্‌-বিপ্লব রাশিয়ার মাঝারি গোছের ঔপন্যাসিক মিখাইল আর্জিবাশেফ, যাঁর লেখা এখন আর কেউ পড়ে না, কিন্তু যাঁর উপন্যাসগুলি (যদিও ১৯১৪-র আগে লেখা) প্রথম যুদ্ধের পর ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে অবিশ্বাস্যভাবে জনপ্রিয় হয়, এবং দু'জন ফরাসি লেখক দ্রিয়ো লা রোশেল্‌ ও অঁরি দ মতেরলাঁ—যাঁদের পাঠক এখনো অনেক।

[ঐ তিন লেখকের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি :

(ক) ১৯০৫-এর প্রথম রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় যে সব তরুণ নৈরাশ্যে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েন তাঁদের মধ্যে আর্জিবাশেফ ছিলেন অন্যতম। সে-সময়ে তিনি নীচ্‌এ-র রচনাবলি পড়ে যা বুঝেছিলেন তারই পরিণতি তাঁর প্রধান ও বিখ্যাত উপন্যাস 'স্যানিন'। এই কাহিনীর নায়ক স্যানিনের কাছে ন্যায়-অন্যায়, বিধি-নিষেধ – এ সবই কিছু প্রচলিত ধারণার সমষ্টি মাত্র যা মানুষের কামনা বাসনা বা তার স্বাধীনতা অহোরাত্র অবদমিত করছে। যেহেতু মানুষ মাত্রই একা এবং মুক্ত, তার কাছে সব কিছুই – এমনকি ভ্রাতা-ভগিনীর পারস্পরিক কামনা পর্যন্ত – সহজে গ্রহণীয়। উপন্যাসে নীচ্‌এ-র নাম একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। ১৯২৭-এ আর্জিবাশেফের মৃত্যু ঘটে বিদেশে, কারণ রুশ বিপ্লবের কিছুদিন পরেই তাঁকে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিতাড়িত করা হয়। ১৯১৪-তে 'স্যানিনে'র ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করেন লণ্ডনের Martin Secker; এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই অনুবাদের মোট চোদ্দটি মুদ্রণ হয়েছিল। এখানে এটাও জানানো বোধ হয় প্রয়োজন যে পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে – যখন আমরা কলকাতায় কলেজের ছাত্র – 'স্যানিনে'র বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল 'মাসিক বসুমতী'তে। বিস্ফোরক বারুদে ঠাসা ঐ বিপজ্জনক উপাখ্যানকে

বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠকদের হাতে তুলে দেবার দুঃসাহসের জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীকে প্রশংসাই করতে হয়।

খ) পিয়ের দ্রিয়ো লা রোশেল্ (Pierre Drieu la Rochelle, ১৮৯৩-১৯৪৫) প্রথম যুদ্ধে সৈনিক হয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। শোনা যায় অতি শৈশবে ইনি নীচ্এ-র রচনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যুদ্ধের পর প্রথমে এঁর কিছু কবিতা, পরে কয়েকটি উপন্যাস বেরোয়। ১৯৩২-এ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আমন্ত্রণে ইনি আর্জেনটিনায় যান ও সেখানে উদীয়মান লেখক বর্হেস-এর মুখে এক বলিভিয়ান ডিক্টেটরের কাহিনী শুনে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অশ্বারোহী' (L'Homme a Cheval) লিখতে মনস্থ করেন। সম্ভবত এটাই দ্রিয়োর সবচেয়ে নীচীয় রচনা, অন্তত দ্রিয়ো নীচ্এ পড়ে যা বুঝেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হবার কিছু আগেই জার্মান নাৎসিবাদের আকর্ষণে দ্রিয়ো ফ্যাসিস্ট হন এবং ১৯৪০-এ প্যারিসের পতনের পর তিনি সক্রিয়ভাবে নাৎসিদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন ও যুদ্ধের শেষে, ১৯৪৫-এ আত্মহত্যা করেন। অসামান্য মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী এই ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ বুৎপত্তি সম্পন্ন ছিলেন; অলডাস্ হাক্সলি প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল এঁর। এবং ইনি তরুণ জাক্ লাকাঁ (Jacques Lacan)-কে ফ্রয়েড-পাঠে প্রথম প্রবুদ্ধ করেছিলেন।

(গ) দ্রিয়োর মতো অঁরি দ মতেরলাঁ (Henry de Montherlant), ১৮৯৬-১৯৭২)-ও সৈনিক হয়ে প্রথম যুদ্ধে যান। ফিরে এসে লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'স্বপ্ন' (Le Songe); নীচ্এ-র দর্শনকে উপরিগতভাবে পাঠ ক'রে ও তাকে লঘুকরণ ক'রে এই উপন্যাসটি ও তাঁর অন্য অনেক রচনাই লেখা হয়েছে। শক্তি-পূজারী ও চরম নারীবিদ্বেষী মতেরলাঁ-র চিন্তা ছিল পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট এবং তাঁর এই চিন্তা বহুভাবে তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় মতেরলাঁ অবশ্যই নাৎসিদের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন নি, কিন্তু যুদ্ধকালীন অধিকৃত ফ্রান্সে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যার একটির বক্তব্য ছিল নাৎসি স্বস্তিকাকে সূর্যের প্রতীক হিসাবে আহ্বান করা, অন্যটির মধ্যে ছিল তাঁর বিজিত স্বদেশবাসীর প্রতি জঘণ্য ঘৃণা। ১৯৭২-এ মতেরলাঁ অন্ধ হয়ে যেতে শুরু করেন এবং এই পরিস্থিতি মেনে না নিতে পেরে ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বরে আত্মহত্যা করেন।]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন অস্তিত্ববাদের জনপ্রিয়তা চরমে উঠল, অনেক তরুণ দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী আবার নতুন করে নীচ্এ-র রচনা পাঠে আগ্রহী হলেন এবং যদি ওয়াল্টার কাউফ্‌মান ও এইচ ব্ল্যাকহ্যাম প্রমুখ ব্যক্তিরা নীচ্এ-কে অস্তিত্ববাদের অন্যতম আদি প্রতিনিধি হিসাবে ধরে থাকেন তাহলে তার পিছনে যথেষ্ট সংগত কারণ আছে। অন্যান্য অস্তিত্বকেন্দ্রিক ভাবুকদের মতোই নীচ্এ ছিলেন অধিবিদ্যার পরম শত্রু এবং এই অধিবিদ্যাকে আক্রমণের জন্য

নীচ্‌এ যে রণকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন তা পাশ্চাত্ত্য দর্শনে খুবই অভিনব এবং এইখানেই নীচএ-র সঙ্গে জাক দেরিদার আত্মীয়তার মূল সূত্রপাত। ফ্রিডরিশ নীচ্‌এ-ই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে অধিবিদ্যার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে ভাষার মধ্যে এবং ভাষার ও অধিবিদ্যার উৎপত্তি এমন এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে, যা থেকে মানুষী সত্তা বা তার নিরন্তর পরিবর্তনশীল অস্তিত্বকে মুক্ত করা প্রায় দুঃসাধ্য; এ-সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকাটা অপেক্ষাকৃতভাবে শ্রেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, হাইদেগার ও দেরিদার উপর নীচ্‌এ-র প্রভাব অসামান্য, যদিও হাইদেগার নীচ্‌এ-র উপর লিখিত তাঁর বিশাল গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন যে নীচ্‌এ শেষ পর্যন্ত তাঁর পরম শত্রু অধিবিদ্যার খাঁচা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য বিচার এ-প্রবন্ধে অবান্তর হবে। অধিবিদ্যার খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই মূল সমস্যা এবং সেটাই দেরিদার প্রশ্ন।

তাঁর দার্শনিক জীবনের প্রথম দিকে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে, নীচ্‌এ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন যা গত কুড়ি বছর ধরে বহু ফরাসি ভাবুককে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। এ-প্রবন্ধটি জানা থাকলে আমাদের দেরিদা-পাঠ কথঞ্চিৎ সহজ হতে পারে। অতিশয় স্থললিত গদ্যে লিখিত এই প্রবন্ধের শিরোনাম অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ: 'অর্থনৈতিক অর্থে সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা' (Erkenntnis theoretische Einleitung uber Warheit und Luge im Aussermoralischen Sinne)। একথা আমি বহুবার শুনেছি যে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত অস্কার লিভি কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত, নীচ্‌এ-র সমগ্র রচনার মধ্যে এ-প্রবন্ধটি আছে। কিন্তু নানা কারণে সে-অনুবাদের কোনো পুনর্মুদ্রণ হয় নি এবং প্রথম সংস্করণ কুত্রাপি নজরে পড়ে না। জার্মানি থেকে প্রকাশিত নীচ্‌এ-র রচনাবলির প্রত্যেকটি সংস্করণে প্রবন্ধটি অবশ্যই আছে এবং প্যারিসিয় প্রকল্পকে Aubier-Flammarion মূল রচনাটি ও তার ফরাসি অনুবাদ সমেত 'দার্শনিকের বই বা-খাতা' (Das philosophenbuch) নামে প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধটির বিশাল ও প্রায় ভয়াবহ শিরোনামায় ঘাবড়ে যাবার কোনো কারণ নেই, কারণ এর বস্তুবক্তব্য যেমন অবক্র, তেমনই সহজ নীচ্‌এ-র গদ্য। আজ এই প্রবন্ধটির প্রধান মূল্য ততটা নীচ্‌এ-র নীতি-সংক্রান্ত চিন্তা নয়, যতটা সত্যমিথ্যা যাচাই সম্পর্কে তাঁর গাঢ় সংশয়; অর্থাৎ আমাদের কাছে সমস্যাটা মূলত যাকে দর্শনে বলা হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বা epistemological। তাঁর তারুণ্যেই নীচ্‌এ-র এ-প্রত্যয় হয়েছিল যে যে-ধরনের এক সহজাত প্রবৃত্তি (instinct)-র তাড়নায় নরনারী আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের ব্যবস্থায় তৎপর থাকে, ঠিক তেমনি এক প্রবল প্রবৃত্তি মানুষকে অহোরাত্র সত্য-সন্ধানে প্ররোচিত করছে—যে প্রবৃত্তি থেকে পশুপক্ষীরা একেবারেই মুক্ত; একেই নীচ্‌এ

'সত্যসন্ধানের প্রবৃত্তি' (Tribe zur Warheit) নামে ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যঙ্গের কোনো প্রয়োজন হতো না, যদি সত্য বলে আদৌ কিছু থাকত এবং সেই সত্যকে মননের সাহায্যে নির্ণীত করা যেত। কিন্তু নীচ্‌এ-র মতে তা হবার নয়। কারণ, বাহ্যজগতের বা বস্তুনিচয়ের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সত্য, যাকে নীচ্‌এ বলেছেন 'বস্তুর রহস্যময় X' (das ratselhafte X des Dings) তার স্বরূপ নির্ণয় কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একটি গাছ বা উটের কাছে গাছ বা উট কী, তা আমাদের চিরকালই অজ্ঞাত রয়ে যাবে। এখানে কাণ্টের প্রভাব লক্ষণীয়। যেহেতু অসম্ভব সাধন সম্ভব নয়, মানুষ ভাষার সাহায্যে প্রতিটি বস্তুর নামকরণ ক'রে ভাষাকে বা ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দকে এক একটি রূপক (metaphor)-এ পরিণত করেছে। একটি উড়ন্ত প্রাণী ও 'পাখি' নামে একটি উচ্চারিত শব্দ বা লিখিত দু'টি অক্ষর – এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সত্যকারের যোগাযোগ নেই। তাই স্বভাবতই নীচ্‌এ নিজেকে শুধিয়েছেন : 'ভাষা কি সকল বাস্তবের কোনো যথাযথ প্রকাশ ?' (Ist die Sprache der adequate Ausdruck aller Realitaten ?[২]) – নীচ্‌এ-র মতে এ-প্রশ্নের জবাব নঞর্থক হতে বাধ্য।

আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা তত বিপজ্জনক বলে মনে হয় না, কিন্তু বস্তুত ভাষা গোড়া থেকেই রূপক বা রূপকাশ্রয়ী হওয়ার ফলে এর মধ্যে, আমাদের অজান্তে, অধিবিদ্যা এসে বাসা বেঁধেছে যা থেকে মিষ্টিসিজ্‌ম খুব বেশি দূরে নয়। এটা অনেকের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতে পারে। সুতরাং একটা উপমা নেওয়া যাক – যে উপমাটি নীচ্‌এ নিজে ব্যবহার করেছেন। অরণ্যে অনেক গাছ এবং সে গাছে হাজার হাজার পাতা আছে। প্রত্যেকটি পাতা অন্য সব পাতা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র, কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা 'পাতা' বা 'das Blatt' শব্দটি গ্রহণ ও ব্যবহার করছি সে মুহূর্তে এই বিশেষ শব্দটি একটি ধারণা বা concept-এ রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থাৎ এই ভাবে, প্রত্যেকটি ধারণার মূলে রয়েছে, যাকে নীচ্‌এ বলেছেন, 'পৃথক বস্তুর অভেদ সাধন' (Gleichsetzen des Nichtgleichen) ; বস্তুগত বা ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে হয় আমাদের পরিত্যাগ (fallenlassen) কিংবা আমাদের স্বেচ্ছাকৃত বিস্মৃতি (vergessen)-র মধ্য দিয়ে ভাষার প্রয়োগে জন্ম নিচ্ছে এক একটি ধারণা বা concept। এই ধারণাগুলি যখন একবার জমাট বেঁধে, বহু শতাব্দীর ব্যবহারে, কঠিন হয়ে যায় তখন এরা এমন এক রূপে (vorstellung) প্রতীয়মান হয় 'যেন প্রকৃতির মধ্যে (অসংখ্য) পাতার বাইরে এমন কিছু আছে যা হবে "পাতাটি", এক ধরনের আদিরূপ যার অনুসরণে অন্য সব পাতাদের বয়ন, রূপায়ণ, পরিমাপ, রং, কুঞ্চন, চিত্রায়ন সাধিত হবে' (als ob es in der Natur ausser den Blatten etwas gabe, das "Blatt" ware, etwas eine Urform, nach der alle Blatter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefarbt, gekrauselt,

bemelt waren...)।[৩]

এটা লক্ষণীয় যে এ-প্রবন্ধে কোথাও প্লেটোর নামোল্লেখ নেই, কিন্তু আক্রমণের বস্তু বা ব্যক্তি কে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রতিটি ধারণা যা ছাড়া ভাষা সম্ভব নয়, তা হল বস্তুনিচয়ের 'আদিরূপ' (urform), যার দ্বারা জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও আমাদের বোধ সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। একেই নীচ্‌এ বলেছেন 'বিমূর্ত চিন্তা বা বিমূর্তনের প্রভুত্ব' (die Herrschaft der Abstraktionen)। অর্থাৎ আমরা প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্তে যে-ভাষা ব্যবহার করি তারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে অধিবিদ্যার বীজ; একটি আদর্শ পাতা বা একটি আদর্শ বাড়ি ইত্যাদি। নীচ্‌এ-র আগে এ ব্যাপারে, এইভাবে কেউ চিন্তা করেছেন বলে শোনা যায় নি। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রায় একশ বছর পরে, জাক দেরিদার বিশ্লেষণে ভাষা ও অধিবিদ্যার অন্তর্নিহিত সম্পর্ককে আরো দৃঢ়ভাবে করায়ত্ত করার চেষ্টা হয়েছে। যদি ভাষা হয় বিমূর্তন এবং বিমূর্তন হয় অধিবিদ্যার জরায়ু তাহলে সেই বিমূর্তন সম্ভব হয় তখনই যখন আমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বস্তু বা ব্যক্তির পার্থক্য বা নানাত্বকে লোপ করি। দেরিদীয় চিন্তায় এই পার্থক্য বা difference একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে এটা দেখা প্রয়োজন যে কিভাবে ভাষার মধ্যে এক ধরনের পার্থক্য সর্বদা ক্রীড়ারত—যে-পার্থক্য ব্যতিরেকে ভাষার অস্তিত্ব অসম্ভব।

বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্ব বা linguistics-এ একটা রীতিমতো বিপ্লব ঘটেছে বলা যেতে পারে। যে রাশি রাশি শব্দপুঞ্জকে আমরা এ যাবৎ শুধু দৈনন্দিন আত্মপ্রকাশ ও লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে ধরে এসেছি, সে মাধ্যমের মূল চরিত্রটি কি তা আমরা জেনেছি খুবই সম্প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইয়োরোপের কয়েকজন অসামান্য মনীষীর সহায়তায়। মার্কিন ভাবুক এডওয়ার্ড সপির (Edward Sapir)-ই প্রথম এটা লক্ষ করেন যে ভাষা মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং মানুষের সামাজিক আচার ব্যবহার, তার ধ্যানধর্ম বা তার দৈনন্দিন প্রতিন্যাস নির্ধারিত হচ্ছে তার মাতৃভাষার আঙ্গিক ও তার সংবিধানের দ্বারা। সপিরের ভক্ত ও স্বদেশবাসী বেঞ্জামিন লি হোয়র্ফ (Benjamin Lee Whorf) যিনি তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন আমেরিকার হোপি ইণ্ডিয়ানদের ভাষার গবেষণায়, তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে যান। আমরা শুধু ভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিতই নই, এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কোনো অনুবাদ আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন হোয়র্ফ।[৪] কিন্তু যে ব্যক্তি ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তায় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছেন এবং আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনাকে প্রায় রাতারাতি বদলে দিয়েছেন তিনি অবশ্যই বিখ্যাত সুইস পণ্ডিত ফ্যার্দিনা সস্যুর (Ferdinand Saussure. ১৮৫৭-১৯১৩)। জেনেভা

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন ইনি; কিছুদিন প্যারিসেও পড়িয়েছেন। ১৯১৫-তে, তাঁর মৃত্যুর পর, প্রকাশিত Cours de la linguistique générale একটি আলোড়নকারী রচনা—যদিও এ-আলোড়ন ঘটেছে বইটি প্রকাশ হবার অনেক পরে, যখন দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্ট আন্দোলন শুরু হল ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ভিত্তিতে।

খুবই সংক্ষেপে সস্যুরের কয়েকটি প্রধান বক্তব্য এখানে বিবৃত করা যেতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা রাশি রাশি শব্দের সমষ্টি নিয়ে গঠিত। এই শব্দগুলি কোনো বস্তু বা বক্তব্যের প্রতীক (symbol) নয়, কারণ সাধারণত প্রত্যেকটি প্রতীকের সঙ্গে বস্তু বা ধারণার একটি সূক্ষ্ম যোগাযোগ আছে, যেমন আইন বা বিচারালয়ের প্রতীক হতে পারে দাঁড়িপাল্লা, কারণ পক্ষপাতশূন্য বিচার আর তুলে ধরা দাঁড়িপাল্লার ছু'টি সমান দিকের মধ্যে অর্থগত সাদৃশ্য বা যোগাযোগ স্পষ্ট। কিন্তু উচ্চারিত শব্দ ও তার নির্ধারিত বা গৃহীত অর্থের মধ্যে —যাকে সস্যুর বলেছেন অর্থকারক (signifier) ও কৃত অর্থ (signified)এ-ছু'য়ের মধ্যে—আদৌ কোনো যোগাযোগ নেই; সেই কারণেই পৃথিবীতে এত অসংখ্য ভাষা। উচ্চারিত বা লিখিত শব্দ 'বাড়ি' ও চার দেওয়াল ও একটি ছাদ-বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনো গুহ্য আধিভৌতিক সম্পর্ক নেই; ঐ বস্তুটির নাম হাঁড়ি কিংবা 'ছুরি' হতেও পারত। সস্যুরের মতে ঐ চার দেয়ালের বস্তুকে 'বাড়ি' আখ্যা শুধুমাত্র একটা কাজ চালানো, মনগড়া (arbitrary) ব্যাপার। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ফ্রিডরিশ নীচএ সস্যুরের আগেই চিন্তা করেছিলেন শব্দ ও তার কৃত অর্থের যোগাযোগশূন্যতা নিয়ে। কিন্তু যেহেতু সস্যুর ছিলেন মূলত ভাষাতাত্ত্বিক—তিনি এই প্রত্যয়গুলো আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তিনিই প্রথম এটা লক্ষ করেন যে উচ্চারিত বচন (la parole) থেকে জন্ম হচ্ছে ভাষার (la langue); ভাষা হল পদ্ধতিবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেওয়া বচন, কিন্তু এই ভাষা ছাড়া বচনের কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, অর্থাৎ এ দুই-ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এবং ভাষার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যে রাশি রাশি শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রত্যেকটিই অন্য শব্দ থেকে পৃথক এবং এই পার্থক্য না থাকলে ভাষার সৃষ্টি অসম্ভব হতো। 'আমি বাড়ি যাব'—এই উক্তির অর্থকরণ সম্ভব শুধু এই কারণে যে 'আমি', 'বাড়ি' ও 'যাব' এই তিনটি ধ্বনির পার্থক্য। শব্দ যদি প্রতীক না হয় তাহলে শব্দ কী? সস্যুরের মতে প্রতিটি শব্দ এক একটি চিহ্ন বা sign এবং এই চিহ্নের চর্চাকে স্ট্রাকচারালিস্টরা আখ্যা দিয়েছেন চিহ্নতত্ত্ব বা Semiology। উপরন্তু সস্যুর আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এটাও লক্ষ করেছেন যে যদি ভাষার অস্তিত্ব সম্ভব হয় প্রতিটি শব্দের অন্তর্নিহিত পার্থক্যের ভিত্তিতে তাহলে এই পার্থক্যের কোনো সদর্থক (positive) দিক নেই, কারণ ভাষা সৃষ্টির আগে অর্থকারক ও কৃত অর্থ, এ দুয়েরই কোনো অস্তিত্ব ছিলনা।[৫] অর্থাৎ ভাষার

মূল উপাদান চরিত্রগতভাবে নঞর্থক (negative)। সুতরাং (নীচএ-র মতে) যে বস্তু বা ব্যক্তিদের পার্থক্যকে ধ্বংস ক'রে বিমূর্তনের সাহায্যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে (সস্যুরের মতে) সেই পার্থক্য বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ক্রীড়ারত থেকে ভাষাকে কথোপকথন বা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে সম্ভব করছে। সমস্যাটা অভিনব।

বহুবিধ কারণে এই বক্তব্যগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত, তাঁর দার্শনিক জীবনের শুরুতেই দেরিদা এটা বুঝেছিলেন যে যদি ভাষার প্রতিটি স্তরে অধিবিদ্যা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সেই অধিবিদ্যাকে আক্রমণ করার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র হওয়া উচিত ভাষা ও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি।

যদিও ফ্যার্দিনা সস্যুরের বিরুদ্ধেও দেরিদা অধিবিদ্যার অভিযোগ এনেছেন—এবং সে-প্রসঙ্গ আমরা যথাসময়ে আলোচনা করব—তথাপি সস্যুরীয় চিন্তা যে দেরিদাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯৬৮-র গোড়ায় ফরাসি দর্শন সমাজে দেরিদা যে বক্তৃতা দেন সেটাই পরে 'স্থগন' (La Diffe´rance) নামে একাধিক জায়গায় প্রকাশিত ও বিখ্যাত হয়েছে। দেরিদার সবচেয়ে মূল্যবান প্রবন্ধগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। এবং এটা এখানে সরাসরি উল্লেখ করা বোধ হয় শ্রেয় হবে যে দার্শনিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত এই বক্তৃতা খুব সহজে বোধ্য নয়। একটু বেশি মনোযোগ সহকারে একাধিক বার পাঠ না করলে প্রবন্ধটি কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। ফরাসিতে দু'টি বিশেষ্য আছে যার উচ্চারণ এক, কিন্তু লিখন ও অর্থ এক নয়। পার্থক্য বা la difference ও স্থগন বা স্থগিত রাখা, la difte´rance; উচ্চারণ কালে এর পার্থক্য ধরা অসম্ভব, কিন্তু লিখলে শেষোক্ত শব্দে রোমান 'e'র বদলে বসছে 'a'; প্রথমেই এটা প্রমাণ হয় যে কোনো ভাষাই বিশুদ্ধভাবে ধ্বন্যাত্মক বা phonic নয়। যদি মিশরীয় হাইরোগ্লিফ বা চৈনিক লিখন পদ্ধতি হয় চৈত্রিক (graphic) তাহলে ক্ষেত্রবিশেষে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলিও তাই। আরো বক্তব্য আছে। অর্থকারক ও কৃত অর্থের মধ্যে যে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই, সস্যুরের এ-বক্তব্য দেরিদা ষোল আনাই মেনে নিয়েছেন এবং এ দু'য়ের যে কোনো সদর্থক বা positive দিক নেই, এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই দেরিদার। বস্তু যেখানে অদৃশ্য বা অনুপস্থিত তার জায়গায় আসছে চিহ্ন, যে চিহ্নের দ্বারা বস্তুর ধারণাকে আমরা ব্যক্ত করি। বস্তুর উপস্থিতি এখানে এখন স্থগিত হচ্ছে; সুতরাং চিহ্নের সাহায্যে অর্থকরণ এক প্রকারের স্থগন। সাধারণত এটা ধরে নেওয়া হয় যে যে-চিহ্ন বস্তুর উপস্থিতিকে স্থগিত রাখছে তার (অর্থাৎ সে চিহ্নের) চিন্তা আমরা করতে পারি শুধু বস্তুর সেই উপস্থিতিকে কেন্দ্র ক'রে যে এখানে উপস্থিত নয়, যার উপস্থিতি স্থগিত রয়েছে। এই চিন্তা—যাকে দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন ধ্রুপদী

চিহ্নতত্ত্ব (Semiologie classique) — এটাই প্রমাণ করে যে চিহ্ন বা sign বস্তুর অনুপস্থিতিতে বস্তুকে বদল (substitute) করছে। দেরিদা এটা মানতে রাজি নন এবং এখানেই ফরাসি চিহ্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ। চিহ্নতাত্ত্বিকরা — যাঁদের মধ্যে রোলাঁ বার্থ থেকে উমব্যার্তো একো (Umberto Eco) পর্যন্ত অনেকেই আছেন — সকলেই সস্যুরের ভাবশিষ্য। যদিও এঁরা সকলেই প্রচলিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমালোচনা বা ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে, কিন্তু যে কোনো চিহ্নের পশ্চাতে এক ধরনের সাহিত্যিক বা সামাজিক অর্থ এঁরা দেখতে অভ্যস্ত। সে ক্ষেত্রে প্রতীয়মান চিহ্ন দ্বিতীয় স্থান নিতে বাধ্য। অর্থাৎ মূল বক্তব্য দূরে কোথাও রয়েছে। এতাদৃশ্য চিন্তাধারার পিছনে দেরিদা দেখছেন অধিবিদ্যার প্রেত এবং চিন্তাকে এই প্রেতের হাত থেকে মুক্ত করাই দেরিদার অভিপ্রায়।

বস্তুত ভাষার মধ্যে কী ঘটছে? প্রথমত, অধিকাংশ শব্দই বহুলার্থক (polysemic)। বাড়ির অর্থ শুধু বাড়ি নয়, বাড়ি মানে পরিবারও বটে ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, শব্দ বা বাক্যের অর্থকরণ সম্ভব শুধু গতির মধ্যে; অর্থকরণ কোনো অনড় ব্যাপার নয়। দেরিদার মতে: 'স্থগিত রাখা যা এটা দেখায় যে অর্থকরণের গতি শুধু সম্ভব তখনই যখন প্রত্যেকটি তথাকথিত উপস্থিত উপাদান (শব্দ) উপস্থিতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, নিজের মধ্যে পূর্ববর্তী উপাদানের ছাপ ধরে রেখে এবং পরবর্তী উপাদানের দ্বারা ইতিমধ্যেই খনিত (বা রেখাংকিত) হয়ে, এবং এই ছাপ ভবিষ্যৎকে যতটা অতীতকে ঠিক ততটাই উল্লেখ করছে এবং বর্তমানের সৃষ্টি করছে তাকে উল্লেখ ক'রে যা সে নয়।'[৬]

আমার এই শ্রীহীন বঙ্গানুবাদের জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। যাই হোক, মূল সমস্যাটি কি? ব্যাপারটা অনেকটা 'রিলে রেস'-এর মতো হচ্ছে, অর্থাৎ অতিশয় দ্রুতগতিতে কোনো একটি বস্তু ক্রমাগত হাত বদল হতে হতে ছুটে আসছে। একটি বাক্যের (উচ্চারিত বা লিখিত) মধ্যেকার কোনো শব্দেরই নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, এমনকি কোনো অস্তিত্বই নেই। প্রতিটি শব্দ মুহূর্তের জন্য উপস্থিত হচ্ছে তার অগ্র-পশ্চাৎ-এর শব্দগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। ধরা যাক একটি মামুলি বাক্য: 'আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাব'; এই উক্তির কোনো শব্দেরই পৃথক ভাবে কোনো মূল্য নেই, এর অর্থকরণ মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব হচ্ছে শুধু তখনই যখন প্রতিটি শব্দ তার আগের ও পরের শব্দের অর্থে নির্ধারিত হয়ে এক মুহূর্তের জন্য তার অর্থের একটা ভগ্নাংশ মাত্র দিচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে ফিরে আসবার আগে আর এক বার তরুণ সার্ত্র-এর কথা উল্লেখ করা দরকার।

যদিও দেরিদার ইংরেজ বা ফরাসি ব্যাখ্যাকার কেউ কেউ কালে-ভদ্রে সার্ত্র-এর নামোল্লেখ করেন, দেরিদার মার্কিন শিষ্যশিষ্যারা সার্ত্র সম্পর্কে আশ্চর্যকর ভাবে মৌন। তাছাড়া সকলেই এখন বৃদ্ধ সার্ত্র-এর সহায়তায়, তরুণ সার্ত্রকে ভুলে

যেতে মনস্থ করেন।

তরুণ সার্ত্র্‌ মানুষী চৈতন্যের যে ব্যাখ্যা 'অহং-এর অতিক্রমণে' দিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেরিদার ভাষাতাত্ত্বিক চিন্তা ও শব্দের ব্যাখ্যার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য রয়েছে। যদি মানুষী চৈতন্য হয় (সার্ত্রের মতে) শূন্য এবং যদি তা পূর্ণ ও অর্থময় হয় শুধু বহিরাগত অভিজ্ঞতার চাপে, তাহলে মানুষের ব্যবহৃত ভাষায় প্রতিটি শব্দ (দেরিদার মতে) শূন্য বা অস্তিত্বহীন এবং তা মুহূর্তের জন্যে অস্তিত্বে আসে মাত্র পারিপার্শ্বিক শব্দগুলির সহায়তায়।

পার্থক্য ও স্থগন—এই দুই বৈশিষ্ট্য শব্দকে নিরন্তর প্রয়োজনীয় করছে। এ দুয়ের মধ্যে চলছে যাকে দেরিদা বলেছেন 'খেলার গতি' (un mouvement de jeu)।

দেরিদার মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অনড়, রূপান্তরহীন অর্থ বা অর্থ নামক কোনো বস্তুকে শব্দের পিছন থেকে সরিয়ে দিয়ে, অধিবিদ্যার খুঁটিকে আলগা ক'রে, ভাষার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং এটা প্রমাণ করা যে যেহেতু কোনো শব্দেরই এক ও অনন্য কোনো অর্থ বা স্বর (univocity) নেই, যেহেতু শব্দের অর্থ পদে পদে স্থগিত হচ্ছে তার পার্থক্য ও ভাষার অন্তর্নিহিত গতিশীলতার জন্য, লিখিত বা উচ্চারিত ভাষার কোনো এক ও অনন্য অর্থ না থাকতেও পারে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, তরুণ সার্ত্রের নাস্তিবোধকে দেরিদা ভাষার আলোচনায় প্রয়োগ ক'রে প্রায় চরমে এনেছেন।

জাক দেরিদার প্রত্যেকটি উক্তি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত হবে না। 'আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাব'—এই উক্তির কোনো দ্বিতীয় অর্থ নেই, সেটা আমরা জানি এবং দেরিদাও জানেন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা নিয়ে দেরিদার কোনো শিরঃপীড়া নেই। তাঁর অন্বেষণের মূল ক্ষেত্র হল আমরা যাকে বলি আর্টস্‌, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাকে বলা হয় 'লিব্‌রল আর্টস' এবং ফরাসিরা যাকে বলেন 'সিয়ঁাস্‌ উম্যান্‌' (sciences humaines), অর্থাৎ, দর্শন তো বটেই—ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক রচনা ইত্যাদি প্রায় নিজের অজান্তে, আধিবিদ্যক ঐতিহ্যের শিকার হয়েছে। বলা বাহুল্য, গণিত ও শুদ্ধ বিজ্ঞান বহু পূর্বেই পৃথগন্ন হয়েছে; তারা ইতিহাস বা দর্শনের ভাষা ব্যবহার করে না; তাদের নিজস্ব পারিবারিক চিহ্ন আছে—যথা $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ বা $E=mc^2$ ইত্যাদি।

লিব্‌রল আর্টসের বিশাল পরিবার; তাদের শাখা-প্রশাখাও প্রচুর এবং এ-ব্যাপারে দেরিদা খুবই সজাগ ও সচেতন। তাই একাধারে তিনি যেমন প্লেটো বা হেগেলের তীক্ষ্ণ সমালোচক, অন্যধারে তেমনি তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবুক জঁা জাক রুশো, নৃতাত্ত্বিক লেভি-স্ত্রস (Le´vi-Strauss) বা ভাষাতাত্ত্বিক ফ্যার্দিনা সস্যুরকেও রেহাই দেন না।

প্রথমেই ধরা যাক ফ্যার্দিনা সস্যুরের কথা, যাঁর দেদীপ্যমান মনীষার প্রতি আমি ইতিপূর্বেই শ্রদ্ধা জানিয়েছি। এঁর প্রতি দেরিদার শ্রদ্ধা কিছু কম নয় এবং এটা আমরা দেখেছি যে কিভাবে সস্যুরের কয়েকটি আবিষ্কারকে দেরিদা তাঁর চিন্তায় কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এটাও দেরিদা দেখিয়েছেন, কিভাবে সস্যুরের মতো বিশাল প্রতিভা কয়েকটি ঐতিহাসিক আবিষ্কার সত্ত্বেও, সেই আবিষ্কারগুলির যৌক্তিক পরিণতির হাত থেকে পালিয়ে সেই সনাতনী অধিবিদ্যার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

জাক দেরিদার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রচনা 'দ লা গ্রামাতোলজি' বা 'গ্রামাটোলজি প্রসঙ্গে'। এই গ্রন্থের ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – শিরোনাম 'ভাষাতত্ত্ব ও গ্রামাটোলজি' (linguistique et grammatologie) – জুড়ে আছে ফ্যার্দিনা সস্যুরের কয়েকটি আশ্চর্যকর উক্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা, যা একবার বোধগম্য হলে দেরিদার বিখ্যাত ডিকন্‌স্ট্রাক্‌শান (Deconstruction) বা 'নিরলংকরণ' ব্যাপারটি অনেক সহজ হবে। আমি একথা পূর্বেই বলেছি যে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সস্যুর এটা বুঝেছিলেন যে অর্থকারক ও কৃত অর্থের মধ্যে আদৌ কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই; ওটা একটা মনগড়া ব্যবস্থা মাত্র; এমনকি সস্যুর এটাও বুঝেছিলেন এ দুয়ের কোনো সদর্থক (positive) দিক নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও, ঐ একই রচনায়, সস্যুর এ-চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন নি যে উচ্চারিত ভাষা (langue, language) হল বিশুদ্ধ এবং তার লিখিত রূপ (écriture, writing) সর্বতোভাবে অশুদ্ধ এবং, এমনকি বিপজ্জনক। 'একমাত্র উচ্চারিত রূপের মধ্যেই আছে বস্তু', 'উচ্চারিত শব্দ এমনই প্রগাঢ়ভাবে লিখিত রূপের সঙ্গে যুক্ত যে শেষোক্ত প্রধান ভূমিকা (le role principal) দখল ক'রে বসেছে।' 'লিখন পেয়েছে এক গুরুত্ব যাতে তার কোনো দাবি নেই (elle n'a pas droit)। এমনকি (বিখ্যাত ভাষাবিদ্) বপ্‌ (Bopp)-ও তফাত করতে পারেন নি দু'য়ের মধ্যে ও তাঁর অনুসারীরা একই ফাঁদে পড়েছেন।' 'কিন্তু লেখার দৌরাত্ম্য যায় আরো দূর' ইত্যাদি। এই উক্তিগুলি সবই আছে সস্যুরের ঐ বিখ্যাত বইটির গোড়ার দিকে।[৭]

এখন প্রশ্ন এই, কিসের এই আতংক, এই ত্রাস, এই শিহরন? লিখিত ভাষার এমন কি বিষ আছে যা উচ্চারিত ভাষাকে সংক্রামিত করতে পারে, তার শুচিতাকে আবিল করে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন দেরিদা এবং বিশদ ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন যে কিভাবে লিখিত ভাষার প্রতি সস্যুরের এই ভীতি একটা যুগসঞ্চিত আধিবিদ্যক ঐতিহ্যের অংশ মাত্র। উচ্চারিত ভাষার উচ্চারক এখানে উপস্থিত এবং তাঁর এই উপস্থিতি উচ্চারিত ভাষাকে উপস্থাপিত করছে কোনো এক নিগূঢ় সত্যের বেদীতে। পক্ষান্তরে, লিখিত ভাষার বাচক বা লেখক লেখার পশ্চাতে অনুপস্থিত – হয়ত বহুদূরে প্রবাসী, হয়ত মৃত। এই

রিক্ততা বা শূন্যতা যা যে কোনো আধিবিদ্যক চিন্তায় কলুষ মাত্র, তা ক্রমাগত বাহির থেকে বলাৎকার করছে উচ্চারিত বচনের শুচিতার উপর। খ্রীস্টিয় ধর্মতত্ত্বে Verb বা প্রথম প্রণব – ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী – একাধারে উচ্চারিত অন্যধারে তার পশ্চাতে দিব্যশক্তির উপস্থিতি আর দৈনন্দিন ব্যবহৃত উচ্চারিত শব্দের তথাকথিত নিষ্কলুষ পবিত্রতা—এ দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্ম কোনো যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছেন দেরিদা। তাছাড়া খ্রীস্টিয় পাপবোধ তো আছেই। দেরিদার মতে, 'পাপকে প্রায়শই আখ্যায়িত করা হয়েছে – যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে মাল্‌ব্রাঁশ ও কাণ্ট অন্যতম – আবেশের (la passion) অন্তস্তলে আত্মা ও দেহের স্বাভাবিক সম্পর্কের বৈপরীত্য সাধন (inversion) হিসাবে। সস্যুর এখানে নির্দেশ করছেন বচন ও লিখনের স্বাভাবিক সম্পর্কের বৈপরীত্যের প্রতি'।[৮] এবং দেরিদা এটাও আমাদের জানাচ্ছেন যে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যে চিরকালই লিখনকে প্রতিভাত (sensible) বস্তু—যথা দেহ, জড় পদার্থ ইত্যাদির সঙ্গে একীকৃত ক'রে তাকে আত্মা, নিঃশ্বাস, প্রণব ও পরমার্থের (Logos) বাইরে রাখা হয়েছে। অবশ্য এর মূলে আছেন পাশ্চাত্ত্য অধিবিদ্যার জনক ও আদিগুরু প্লেটো নিজে। অর্থাৎ বচনকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র এবং লিখনকে অশুচি ও বিপজ্জনক বিবেচনা করাটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা নির্দোষ ব্যাপার বলে মনে হয়, বস্তুত তা নয়।

তাছাড়া, এর পিছনে রাজনৈতিক কারণও আছে। দেরিদার ধারণা, সস্যুরের মধ্যে রয়েছে 'সেই ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য (Fidélité a la tradition) যা সর্বদাই লেখাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিপজ্জনক বলাৎকারের (la violence fatale) সঙ্গে যুক্ত করেছে'।[৯] এই চিন্তা রুশোর হাতে চরমে পৌঁছেছে। অর্থাৎ যা কিছু স্বাভাবিক, প্রকৃতিগত, তাই ভালো এবং সভ্যতার সৃষ্টি মানুষকে নিরন্তর অসুখী ও নিষ্পিষ্ট রেখেছে—এই জাতীয় প্রত্যয় থেকে লিখিত ভাষার প্রতি ভয় ও ঘৃণার যুগ্ম উৎপত্তি হতে পারে। রুশোর একটি অতিশয় অখ্যাত প্রবন্ধ 'Essai sur l'origine des langues' (ভাষাসমূহের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধ)-এর মধ্যেও লিখিত ভাষাকে পরম অবজ্ঞার সঙ্গে একটি পরিশিষ্ট বা supplement হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। উচ্চারিত ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার ঐতিহ্য প্লেটো থেকে সস্যুরে এসে থেমে যায় নি। এমন কি খুবই সম্প্রতি, ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্টদের কুল-পুরোহিত, নৃতাত্ত্বিক ক্লোদ্‌ লেভি-স্ত্রস্‌ তাঁর বহুপঠিত 'বিষণ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডল' (বা Tristes Tropiques)-এ একই প্রত্যয় ধ্বনিত করেছেন। 'দ লা গ্রামাতোলজি'র সর্বাংশ জুড়ে আছে রুশো ও লেভি-স্ত্রসের ধারণার আলোচনা ও সমালোচনা। এই প্রবন্ধের ক্ষেত্র সীমিত, সুতরাং সেই সমালোচনার বিষদ বিবরণ দেবার লোভ আমি সংবরণ করছি। কিন্তু যে-বক্তব্যকে জাক দেরিদা পৌনঃপুনিকভাবে আমাদের সামনে এনেছেন ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন সেটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এবং সেটি এই যে উচ্চারিত ও লিখিত ভাষার মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ

প্রভেদ নেই; এ দুয়েরই আইন ও পদ্ধতি, বিধি-নিষেধ ও সংবিধান একই। কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ নেই এটা ধরে নেবার যে একটি অন্যটি অপেক্ষা শ্রেয়, পবিত্রতর বা বেশি মূল্যবান। লেখাকে বিপজ্জনক হিসাবে বিবেচনা করার পশ্চাতে অবশ্য থাকতে পারে কোনো গূঢ় রাজনৈতিক বা সামাজিক অভিসন্ধি, কিংবা ধর্মীয় ব সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কোনো গোপন যোগসাজস বা complicity, যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেরিদা দিয়েছেন প্লেটোর উপর লিখিত তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে। আমরা যথাসময়ে সে-প্রসঙ্গে ফিরে আসব।

মোট কথা, ফ্যার্দিনা সস্যুরের প্রসঙ্গে দেরিদার আলোচনা থেকে এটা সহজেই প্রতীয়মান হল যে তাঁর মতো এক অসাধারণ ভাবুকও ঐতিহ্যাশ্রয়ী চিন্তা ও তার সংলগ্ন অধিবিদ্যার খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। অতএব যদি চিহ্নতত্ত্বে কোনো কাজ না হয়, তাহলে ভাষাতত্ত্বও উল্লেখ্যভাবে ফলপ্রসূ হবে না। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন এক নতুন পদ্ধতির, যার সাহায্যে রচনার মধ্যে নিহিতা অধিবিদ্যার বীজ সম্পর্কে অন্তত আমরা সজাগ ও সচেতন থাকতে পারি। এই নতুন পদ্ধতি বা বিজ্ঞানকেই দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন 'গ্রামাটোলজি' বা রচনার তন্ন তন্ন বিচার। এই নামটির আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্য দেরিদার নয়। উনিশ শতকের বিখ্যাত ফরাসি আভিধানিক লিত্রে (Littre) তাঁর অভিধানে 'গ্রামাটো-লজি'র কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৫২-তে শিকাগো শহরে I. J. Gelb নামে এক মার্কিন পণ্ডিত 'A study of writing: the foundations of Grammatology' নামে একটি বই প্রকাশ করেন, যদিও এ-লেখকের চিন্তাও ছিল মূলত ঐতিহ্যকেন্দ্রিক এবং এঁদের কথা দেরিদা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং প্রয়োজন এক নতুন গ্রামাটোলজির যার একমাত্র রণকৌশল হবে ডিকন্‌স্ট্রাকশন বা নিরলংকরণ।

এ ব্যাপারে দেরিদার অধিকাংশ টীকাকারই একমত যে ডিকন্‌স্ট্রাকশন ধ্বংস নয়, যদিও অধিবিদ্যাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য এর মধ্যে নিহিত। কোনো রচনাকেই অবশ্য আক্ষরিক অর্থে ধ্বংস করা যায় না। বহু শতাব্দীর আধিবিদ্যক চিন্তার দ্বারা আলোচনার ভাষা দূষিত; সেই ভাষাকে নতুন ক'রে সংস্কার ক'রে এবং তা থেকে অধিবিদ্যাকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা অসম্ভব ব্যাপার। জাক দেরিদা ইয়োরোপীয় চিন্তার কবলে নেই, সুতরাং যা অসম্ভব তাকে সাধন করার দিবাস্বপ্ন না দেখে দেরিদা এক নতুন পদ্ধতি নিয়েছেন। যে-ভাষায় চিরকাল দর্শন (অর্থাৎ অধিবিদ্যা) আলোচিত বা লিখিত হয়েছে সেই ভাষা ব্যবহার ক'রে, সেই ভাষার অন্তস্তলে পৌঁছে তাকে ভিতর থেকে আক্রমণ চালিয়ে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে উদ্‌ঘাটন ক'রে এটা প্রকাশ করা যে লেখক বা ভাবুক যা বলতে চাইছেন তার উল্টোটাই ব্যক্ত হচ্ছে। অধিকাংশ শব্দই বহুলার্থক (polysemic); তদুপরি, শব্দপুঞ্জের অভ্যন্তরীণ পার্থক্যের গতিতে বাক্যের অর্থ ক্রমাগত

স্থগিত হয়ে লেখক বা ভাবুকের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করছে। এ এক ধরনের ফাঁদ। প্লেটোর 'প্রোটাগোরাস'-এ সক্রেটিসকে এ ধরনের ফাঁদে পড়তে দেখা গেছে। গ্রীক অলংকার শাস্ত্রে 'আপোরিয়া' (Aporia) নামে একটি বিষয় আছে; আক্ষরিকভাবে এর অর্থ অনতিক্রম্য পথ। ভাষা—বিশেষত যে-ভাষাকে দার্শনিক আলোচনা কাজে ব্যবহৃত হতে হয়—তার মধ্যে সৃষ্ট যে গোলকধাঁধাঁ, যে কানাগলি থেকে আর বহির্গত হবার উপায় থাকে না, তাকেই গ্রীক আলংকারিকদের অনুকরণে দেরিদা আখ্যা দিয়েছেন 'আপোরিয়া'। দার্শনিক ভাষার অলংকারগুলিকে খুলে নিলে তার মধ্যে যে অর্থঘটিত সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেই খুলে নেওয়ার কাজকেই দেরিদা বলেছেন 'ডিকনস্ট্রাকশন', যার বাংলা আমি করেছি, 'নিরলংকরণ'। ভাষাকে শুধু নিরলংকৃত করাই নয়, একই শব্দের পরস্পর-বিরোধী অর্থের চাপে ভাবুক যে কিভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংস্থানগুলির সঙ্গে, নিজের অজান্তে, এক গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে পড়েন, এটাও ঐ দেরিদীয় পদ্ধতির একটা প্রধান অংশ। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি লিখিত ভাষার উপর সস্যুরের বিষোদ্গারকে দেরিদা কি অপরিসীম যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছেন যে সস্যুর নিজের অজ্ঞাতে একটি সামাজিক ভীতি ও কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষক। বস্তুত ডিকনস্ট্রাকশন কোনো 'যাদু' শব্দ নয় বা কোনো আধিভৌতিক গুহ্য মন্ত্র নয়। এবং দেরিদা, দার্শনিক হিসাবে, কোনো বিশাল দার্শনিক পরিকল্পনা (বা system)-এর জনকও নয়। তিনি মূলত প্রকাশিত রচনা নিয়ে কারবার করেন এবং তাঁর পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে রাচনিক (textual)। নিরলংকরণের প্রধান অবলম্বন একটি রচনাকে গভীর ও তীব্র মনোযোগ সহকারে পাঠ এবং দেরিদার রচনার সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন পাঠক হিসাবে দেরিদার মনোযোগ কি অসামান্য।

দেরিদার একমাত্র সমস্যা পাশ্চাত্ত্য অধিবিদ্যাকে নিয়ে। ভারতীয় দর্শনের কোনো উল্লেখ তাঁর বা তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের কোনো রচনায় থাকে না, বা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। কিন্তু এটা এখানে অতিশয় স্পষ্টভাবেই জানানো প্রয়োজন যে অধিবিদ্যার কোনো জাতি বা বর্ণ নেই। বাস্তব জীবনের গ্লানি. দুঃখ বা বৈক্লব্য থেকে পালিয়ে, কল্পনার সাহায্যে অন্য এক মধুময় জীবন গড়ে তোলার অভ্যাস কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে প্রোথিতমূল। জাক দেরিদার গুরু স্থানীয়, ফ্রিড্‌রিশ নীচ্‌এ যখন এই পলাতকী চিন্তাকে আক্রমণ করেছিলেন তখন কিন্তু তিনি ভারতের শংকর ও তাঁর unio mystica-কেও রেহাই দেন নি।[১০]

অধিবিদ্যার যে সকল উপাদান সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, দেরিদা সেগুলিকে নিতান্তই পাশ্চাত্ত্যের ব্যাপার বলে ধরে নেন, কিন্তু অধিবিদ্যার মূল চরিত্রটি জাগতিক এবং আমার এই উক্তির সমর্থনে আমি কঠোপনিষদের দু'টি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত ক'রে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নির্ণয় করছি।

শিশু নচিকেতার সঙ্গে যমের কথোপকথন কালে নির্গুণ ব্রহ্মের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা অবশ্যই বেদান্তের মূল কাঠামো বা সারমর্ম। সে-সম্পর্কে নতুন কোনো টীকা নিষ্প্রয়োজন ; উপনিষদকার বারংবার বলছেন যে ব্রহ্মোপলব্ধির প্রধান অন্তরায় সংসারের প্রতি অত্যাসক্তি ইত্যাদি, কিন্তু নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে আর একটি অন্তরায়ের কথা বলা হয়েছে যা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য :

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চণ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥

—কঠোপনিষদ (২।১।১০ ও ২।১।১১)

এই দু'টি শ্লোকে আমরা আলোচ্য সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছি। শুধু সংসারে আসক্তিই নয়, সর্বভূতে বিদ্যমান ব্রহ্ম, যিনি এখানে তিনিই সেখানে—যে তা না দেখে ব্যক্তি বা বস্তুনিচয়ের পার্থক্য বা নানাত্ব দেখে, যে এর মধ্যে (ইহ) শুধুই নানাত্ব (নানেব=নানা+এব) দেখে সে মৃত্যুর পর আবার মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মৃতই থাকে বা—শেষোক্ত শ্লোকে—এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুর দিকে যায়। সব অধিবিদ্যার এক রা। যে কোনো বিমূর্ত চিন্তা বা concept যার মধ্যে অধিবিদ্যা বা আধিবিদ্যক সত্তার জন্ম হচ্ছে তার মূলে আছে যাকে নীচ্‌এ বলেছিলেন 'পৃথক বস্তুর বা পার্থক্যের অভেদ সাধন' (Gleichsetzen des Nichtgleichen)। আমাদের উপনিষদকারও প্রচলিত পদ্ধতি ধরে এগিয়েছেন ; যারা জগতে প্রতিভাত বস্তুর পার্থক্য বা নানাত্বই শুধু দেখে (বা যারা দেরিদার difference-এর মধ্যে রয়েছে) তাদের অভিশাপ দিয়ে মৃত্যুমুখে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে ঐ দু'টি শ্লোকে উপনিষদকার এমনি দ্বন্দ্বে (contradiction)-র সৃষ্টি করেছেন যার ফাঁদে তিনি নিজের অজান্তে আটকে পড়েছেন। যে ভাষায় তিনি এই তুরীয় ব্রহ্মজ্ঞানকে সাধারণ্যে এনেছেন তা কি সম্ভব যদি ঐ ভাষার প্রতিটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য বা নানাত্ব না থাকত ? শুধু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বা গুহ্য ওঁকারের মাধ্যমে কি যম ও নচিকেতার কথোপকথন সম্ভব হতো ? যদি এক মৃত্যু থেকে আর এক মৃত্যুতে যাবার আশংকায় আমরা উপরোক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দের নানাত্ব না দেখতাম, তাহলে তার কোনো অর্থই হতো না। যদি নানাত্ব হয় মৃত্যু, তাহলে সেই 'মৃত্যু'র সাহায্যেই ব্রহ্ম নামক 'জীবনে'র আলোচনা সম্ভব।

প্লেটোর যুক্তিবিন্যাস ও রচনাশৈলীর সঙ্গে বেদান্তের লিখনভঙ্গির কোনো সাদৃশ্য নেই বললেই চলে। এটা অবশ্যই ফ্রিডরিশ নীচ্‌এ জানতেন, তথাপি তিনি তাঁর 'শক্তির এষণা'র ১৪১ বিভাগে—The Will to Power, Section

141 — প্লেটো ও বেদান্তকে পরস্পরের সম্পূরক বলেছেন। সুতরাং, এইবার বেদান্ত পরিত্যাগ ক'রে, আসুন আমরা দেরিদার অনুসরণে প্লেটোর সকাশে যাই।

১৯৬৮-তে ফরাসি স্ট্রাকচারালিস্টদের গোষ্ঠীগত পত্রিকা তেল্‌কেল্ (Tel Quel)-এ দেরিদার অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'প্লেটোর আয়ুর্বেদভবন'বা La Pharmacie de Platon দু'ক্ষেপে প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'বিক্ষেপণ' (La Dissémination) নামক প্রবন্ধ-সংকলনে স্থান পেয়েছে। প্রায় বছর দশেক আগে, প্রবন্ধটি প্রথম পড়তে শুরু করার পর আমার ধারণা হয়েছিল যে এটি একটি প্রায় ডিটেকটিভ উপন্যাস। এক ধূর্ত গোয়েন্দার মতো দেরিদা প্লেটোর পিছনে ধাওয়া করেছেন তাঁর (প্লেটোর) ব্যবহৃত প্রায় প্রত্যেকটি শব্দকে বিশ্লেষণ ক'রে। আমার ধারণা — এবং এটি অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত মত — আজ পর্যন্ত দেরিদার তাবৎ প্রকাশিত রচনার মধ্যে এটিই তীক্ষ্ণতম ও সর্বাধিক সুখপাঠ্য। এমনকি তত্ত্বগত-ভাবে যাঁদের এই প্লেটো-বিরোধী রচনাটি ভালো লাগার কথা নয় — যেমন ব্রিটিশ লেখিকা ও অক্সফোর্ডে দর্শনের অধ্যাপিকা এবং প্লেটোর অনুরাগিণী শ্রীমতী আইরিস মার্ডক্ — তাঁরাও অনেকে প্রবন্ধটিকে বলেছেন 'brilliant'।[১১]

তাঁর 'ফীড্রাসে' প্লেটো লিখন বা লিখিত রচনাকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করার জন্য একটি মিশরী রূপকথার সাহায্য নিয়েছেন। উত্তর মিশরের রাজা থামুস (Thamus)-কে যখন থয়থ (Theuth) নামে এক দিব্য পুরুষ ও নোক্রাটিস-এর আঞ্চলিক দেবতা উপহার হিসাবে লিখিত ভাষা দিতে চাইলেন, তখন রাজা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে সেই উপহার প্রত্যাখ্যান করলেন। সক্রেটিসের জবানীতে প্লেটো ঐ প্রত্যাখ্যানকে অতি প্রশংসনীয় ও সাধু সংকল্প বিবেচনা ক'রে 'ফীড্রাসে'র অন্তিম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন কেন ও কিভাবে লিখিত ভাষা উচ্চারিত ভাষার তুলনায় নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য।[১২]

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে কিভাবে এই লিখন-বিরোধী মনোভাব পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে রুশো, সস্যুর ও লেভি-স্ত্রস্ পর্যন্ত পৌঁছেছে। দেরিদা কিভাবে প্লেটোর যুক্তিগুলির প্রত্যেকটিকে খণ্ডন করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অবশ্যই এ-প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর কয়েকটি মূল বক্তব্যের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। যে কোনো রূপকথার প্রতি প্লেটোর ছিল পরম অবজ্ঞা; সুতরাং 'ফীড্রাসে' যদি তিনি রূপকথার সঙ্গে লিখিত ভাষাকে জড়িয়ে থাকেন তাহলে তার পশ্চাতে আছে প্লেটোর নির্ভেজাল চাতুরী, যা দেরিদার মতে, অনেক প্লেটো-বিশারদই ধরতে পারেন নি। কথ্য ভাষা, অবশ্যই, প্লেটোর মতে, শ্রেয় — তার কারণ ঐ ভাষা একটি সন্তান, যার পিতা অর্থাৎ তার উচ্চারক নিজে স্বয়ং উপস্থিত এবং প্রয়োজন হলে তার সন্তানকে অর্থাৎ কণ্ঠনিঃসৃত বক্তব্যকে সমালোচকদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন। প্লেটোর

এই পিতৃরূপী রূপক (metaphor)-কে দেরিদা একটা নির্দোষ, গুরুত্বহীন অলংকার হিসাবে নেন নি। খ্রীস্টিয় ধর্মতত্ত্বে পরমার্থ বা Logos পরম পিতা (God the father)-এর মুখনিঃসৃত বাণী। প্লেটো অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ান ছিলেন না, কিন্তু তাঁর উক্তির সঙ্গে খ্রীস্টিয় ধর্মতত্ত্বের যে চমৎকার মিশ্রণ উত্তরকালে ঘটেছিল তার ইঙ্গিত এখানে ইতিমধ্যে রয়েছে। সমস্যাটা শুধু ধর্মতাত্ত্বিক নয়, এর রাজনৈতিক তাৎপর্য সহজবোধ্য। গণতন্ত্রের পরম শত্রু ও দার্শনিক-রাজা নামক ডিক্টেটরের উদ্ভাবক প্লেটোর কাছে পিতা, পিতারূপী ডিক্টেটর, ডিক্টেটর-রূপী পিতা, পিতা, যিনি রক্ষক ও পরিত্রাতা – এ সব ক'টি অর্থই ঐ একটি রূপকের চারপাশে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সুতরাং পিতার এই উপস্থিতি প্লেটোনিক রাজনৈতিক ও আধিবিত্মক চিন্তার বহু অংশ নিয়ে আছে। অন্য এক প্রসঙ্গে দেরিদা আমাদের স্মরণ করিয়েছেন যে কিভাবে আমরা সকলেই পিতৃপুরুষদের নামের (patronymic) বোঝা আজীবন বয়ে বেড়াই। পিতৃপুরুষরা অবশ্য সকলেই 'পুরুষ' এবং তাঁদের লিঙ্গকেন্দ্রিক (phallocentric) উপস্থিতি এমন কি আমাদের পরিবারগত নামের মধ্যেও জাজ্বল্যমান। সুতরাং যে লিখিত ভাষার পশ্চাতে পিতারূপী লেখক শারীরিকভাবে হাজির নেই সেই অনাথ ভাষা শুধুই একটি লিখিত ভাষা (il n'est plus, pre´cise´ment, qu'une e´criture) এবং সেই হেতু, পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার জনক প্লেটোর কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বস্তু। কিন্তু মুশকিল এই যে লিখনের রূপক প্লেটোর ঘাড়ে চেপে বসেছে যার হাত থেকে প্লেটোর কোনো মুক্তি নেই। ঐ 'ফীড্রাস'-এরই এক জায়গায় তিনি (বা সক্রেটিস) বলছেন যে আর এক ধরনের যোগাযোগ আছে যা 'শ্রোতার আত্মার অন্তস্তলে লিখিত থাকে', অর্থাৎ যে লেখাকে বা লিখিত ভাষাকে তিনি অপসারিত করতে এতই প্রচেষ্ট, তারই রূপক একাধিক বার এই রচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আমাদের উপনিষদকার মৃত্যুর রূপক ব্যবহার করেছেন ব্রহ্ম নামক জীবনের ব্যাখ্যাকালে। দেরিদার মতে লিখিত রচনার এই রূপক যা লিখন-বিদ্বেষী প্লেটো ব্যবহার করেছেন তা প্লেটোর যুক্তিকে সংক্রামিত ক'রে তাঁর বক্তব্যকে ধ্বংস করেছে। 'রূপকত্ব সংক্রমণের যুক্তি ও যুক্তির সংক্রমণ। বদ লেখা, ভালোর কাছে হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাষাতাত্ত্বিক নির্দেশের একটি আদর্শ রূপ ও সারবস্তুর নকল।'[১৩] অর্থাৎ সমীকরণের যে দিকটিকে অবাঞ্ছিত ও অকিঞ্চিৎকর পরিগণিত ক'রে তাকে বিনষ্ট বা অপসারিত করার চেষ্টা চলছে সে-দিক ব্যতিরেকে তথাকথিত ভালো দিকের কোনো অস্তিত্ব নেই।

শব্দের বহুলার্থ কিভাবে একটি দার্শনিক রচনার কেন্দ্রে ব্যাখ্যাগত (hermeneutic) সংকটের সৃষ্টি করে তার আলোচনাও 'প্লেটোর আয়ুর্বেদভবনে'র একটা মূল্যবান অংশ। 'ফীড্রাসে' প্লেটো লিখিত ভাষাকে চিহ্নিত ও বিশেষিত করার জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। দেরিদা ধ্রুপদী গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত

এবং প্লেটো যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা হল 'ফার্মাকন্', যার অর্থ বহুবিধ এবং দু'টি অর্থ পরস্পরবিরোধী, ওষুধ ও বিষ। এ দুই বিরোধী অর্থ প্লেটোর রচনায় এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে উত্তরকালের যে কোনো অনুবাদকের পক্ষে এ এক সমস্যা। অনুবাদকেরা অনেকেই তাঁদের বুদ্ধি অনুযায়ী এবং এক-একটি পরিচ্ছেদে অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে অনুবাদ করেছেন। মূলত ফার্মাকন্ ওষুধই হোক আর বিষই হোক, সর্বদাই বহিরাগত উপাদান—যা শরীরের উপর প্রয়োগ করা হয় কোনো বিশেষ কারণে। তার কোনো 'নিজস্ব, নির্ধার্য গুণ (vertu propre et dé-finissable) নেই'। যদি দেরিদীয় চিন্তায় ভাষার বা শব্দের অন্যতম প্রধান চরিত্র হয় তার অনির্ধারণীয়তা তাহলে ফার্মাকন্ অবশ্যই একটি আদর্শ শব্দ যার অর্থ ক্রমাগতই ওষুধ ও বিষের মধ্যে টানাপোড়েন করছে, যে বহিরাগত এবং যাকে প্রয়োজনবোধে আবার বহির্গত করা হচ্ছে। কোনো বস্তুকে দেশ বা গ্রাম বা এমনকি চৈতন্যের চৌহদ্দি থেকে বহির্গত করার সুপ্ত বাসনা এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

ফার্মাকনের সঙ্গে ধ্বন্যাত্মকভাবে যুক্ত আর একটি শব্দ আছে ধ্রুপদী গ্রীকে, যার কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই 'প্লেটোর আয়ুর্বেদভবনে'। ফার্মাকোস্ বা বলির পাঁঠা (ইংরেজিতে the scape-goat, ফরাসিতে le bouc émissaire) কিংবা যাদুকর। তৎকালীন গ্রীসে এই ফার্মাকোস্-এর কী ভূমিকা ছিল? দীর্ঘ আলোচনা ক'রে দেরিদা দেখিয়েছেন যে এই ভূমিকা বিশেষ অর্থপূর্ণ।

যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম দেরিদা পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে দু'জন জগদ্বিখ্যাত। 'The Golden Bough'-এর লেখক জেম্‌স ফ্রেজার ও গ্রীক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বিদুষী জেন্ হ্যারিসন। ফ্রেজারের গ্রন্থে আমরা জানতে পারি যে প্রাচীন এথেন্সে মে মাসে, থারগালিয়ার উৎসব কালে দুই ব্যক্তিকে—একজন নারী ও অন্যজন পুরুষ—নগরীর বাইরে নিয়ে এসে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হতো। গ্রীসের অন্যান্য শহরে—যথা আবডেরা প্রভৃতিতেও—এই প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৪] জেন হ্যারিসন বলেছেন যে কোনো নরহত্যা হতো না, এটা ছিল শুধুই 'a ceremony of physical expulsion'।[১৫]

দেরিদার মূল সমস্যা অবশ্যই নৃতত্ত্ব বা ধর্মের ইতিহাস নয়। লিখিত ভাষার প্রতি এই ভয়মিশ্রিত ঘৃণাকে প্লেটো পরম চাতুর্যের সঙ্গে অধিবিদ্যার কাঠামোতে বসিয়েছেন; বক্তব্য খুবই সহজ ও সরল : 'You mean the living and animate speech of a man with knowledge, of which written speech might fairly be called a kind of shadow.' (ফীড্রাস, পেঙ্গুইন সংস্করণ, পৃ ৭৪)। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা একটি নির্দোষ দার্শনিক খেলা নয়। এর পশ্চাতে আছে লিখিত ভাষার বিস্ফোরক শক্তির প্রতি ভয়; পিতৃরূপী ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা, প্রচলিত ধ্যানধারণা—যার প্রতি চরম রক্ষণশীল প্লেটোর

ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—তার বিরুদ্ধে কোনো অভ্যুত্থান বা ঐ জাতীয় কোনো সম্ভাবনার আশংকা।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—কি অধিকারে, কোন যুক্তির প্রত্যাদেশে দেরিদা ফার্মাকনের পিছনে দেখলেন আহত ও বহিষ্কৃত ফার্মাকোস্ বা বলির পাঁঠাকে? লিখিত, মুদ্রিত রচনায় আছে রাশি রাশি অক্ষরের সারি, আর তার মাঝে আছে রচনার শূন্য শুভ্র ক্ষেত্র; সেই শূন্যতাকে কিভাবে পূর্ণ করলেন দেরিদা এই ফার্মাকোস্ দিয়ে? এ-প্রশ্নের জবাব দেরিদা নিজেই দিয়েছেন। রচনাকে কেন্দ্রচ্যুত করা ডিকনস্ট্রাকশন বা নিরলংকরণের একটি প্রধান কাজ এবং তার প্রক্রিয়া বহুবিধ। যদি উক্ত শব্দটি রচনায় কোথাও নাও থাকে তাহলে একই ধরনের শব্দের একটি শৃঙ্খল প্রস্তুত ক'রে আমরা আলোচ্য রচনার মধ্যে একটি 'অনুপস্থিত' শব্দের উপস্থিতি ধরে নিতে পারি। প্লেটোর রচনা অন্য সব রচনার মতোই ভাষার সঙ্গে (এ ক্ষেত্রে ধ্রুপদী গ্রীক ভাষার সঙ্গে) এক বা অন্য অর্থে যুক্ত। 'ফার্মাকন্' শব্দটি শুধু একই গোষ্ঠীর অন্যান্য সব শব্দের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমনকি একই মূলের বা মূল থেকে উৎপন্ন সব অর্থের সঙ্গেও জড়িত। 'এক কথায় আমরা মনে করি না যে নিশ্চিতভাবে প্লেটোর রচনা বলে এমন কিছু আছে যা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যার একটি ভিতর ও বাহির আছে।'[১৬]

অধিবিদ্যায় কল্পিত জগৎ শূন্য। সমানভাবে শূন্য তার ভাষা ও তার নিজেকে ব্যক্ত করার ক্ষমতার ভাণ্ডার। তাই অধিবিদ্যা বারবার ব্যবহার করে দৃশ্যমান জড় জগতের ভাষাকে, ধার নেয় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত রূপকগুলিকে। জড় জগৎ ব্যতিরেকে তার কোনো অস্তিত্বই নেই—'প্লেটোর আয়ুর্বেদভবন' বা 'La Pharmacie de Platon'-র এটাই প্রধান বক্তব্য। কিন্তু সে-সঙ্গে দেরিদা এটাও দেখিয়েছেন যে যে-ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য অধিবিদ্যার জনক, তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতাও চরমে উঠেছিল। যা আপাত-দৃষ্টিতে একটি দার্শনিক কথোপকথন মাত্র, তা থেকে থারগালিয়ার নৃশংস মহোৎসব খুব দূরে ছিল না।

প্লেটো তাঁর সাধারণতন্ত্র থেকে কবিদের বিতাড়িত করেছিলেন এই কারণে—যদি প্রতিভাত, দৃশ্যমান জগৎ হয় একটি অদৃশ্য আদর্শ জগতের বিচ্যুত অনুকরণ তাহলে কবিরা সেই অনুকরণের পুনরায় অনুকরণ ক'রে প্লেটো-কল্পিত আদর্শ বা মহাসত্য থেকে দুই দু'বার দূরীভূত। অর্থাৎ প্লেটো এবং তস্য শিষ্য অ্যারিস্টটলের চিন্তায় এটা সরাসরি ধরে নেওয়া হচ্ছে যে কবিতা বা অন্য যে কোনো শিল্পই বাহ্যজগতের অনুকরণ এবং এই চিন্তা যার মূলে আছে প্লেটোর অধিবিদ্যা, গত তেইশ বা চব্বিশ শতাব্দী ধরে মোটামুটি বিনা দ্বিধায় গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দেরিদার সঙ্গে এ-জাতীয় চিন্তার কোনো আত্মীয়তা

নেই এবং এই চিন্তা বা অনুকরণ (বা mimesis)-এর এই তত্ত্বকে আক্রমণ করার মানসে দেরিদা স্তেফান মালার্মের একটি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত রচনাকে আশ্রয় ক'রে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। মালার্মের উক্ত প্রবন্ধটির নাম মিমিক্ (Mimique) বা 'মূকাভিনয়'।[১৭]

রচনাটি আয়তনে খুবই ছোট ও চরিত্রে অভিনব। এই ক্ষুদ্র ও প্রায় অখ্যাত রচনাটির উপর দেরিদার অতিশয় দীর্ঘ প্রবন্ধ, যার শিরোনাম 'জোড়া বৈঠক' (La double séance) বিশেষ অর্থপূর্ণ ও নানাবিধ কারণে মূল্যবান। মালার্মের রচনাটি একটি মূকাভিনয়ের বর্ণনা। ফরাসি রঙ্গমঞ্চের একটি কমিক টাইপ —ক্লাউন বা ভাঁড় পিয়েরো (Pierrot) তার দ্বিচারিণী স্ত্রীকে বিছানায় বেঁধে রেখে পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দিয়ে হত্যা করছে—এটাই ঐ মূকাভিনয়ের বস্তু-বক্তব্য। এই অভিনয় যা সর্বাংশেই আঙ্গিক ভঙ্গি বা মুদ্রার সাহায্যে চলছে, তার কোনো লিখিত রচনা নেই; নেই কোনো সূত্রধর বা কোনো অদৃশ্য অর্থের আরোপ। প্রতি মুহূর্তে মূক তার নিজের মনোগত অঙ্গভঙ্গির ব্যবহারে বর্ণনাকে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ করছে। এটাই এই রচনার বৈশিষ্ট্য এবং জাক দেরিদা কি তাৎপর্য এই রচনার মধ্যে পেয়েছেন তা বুঝতে খুব পরিশ্রম করতে হয় না। প্লেটো অ্যারিস্টটলের ধ্রুপদী নন্দনতত্ত্ব মালার্মের এই রচনায় পৌঁছে অন্তর্হিত হয়েছে। মাইমেসিস বা অনুকরণের কোনো স্থান এখানে নেই—কারণ এ অভিনয়ের পিছনে নেই কোনো রচনা বা তার অর্থের উপস্থিতি। যদি Logos হয় ধর্মীয় অর্থে পরমার্থ—দেরিদীয় রচনায় তা শুধুই অর্থ। প্রতিটি রচনা বা শিল্পকর্মের পিছনে কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকবেই বা থাকতে হবে, এই বোধ বা বিশ্বাস, যাকে দেরিদা বা উত্তর-স্ট্রাকচারালিস্টদের অনেকেই বলেন 'অর্থকেন্দ্রিকতা' (logocentrism) তা থেকে মালার্মের রচনাটি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এই মুক্তির কি দার্শনিক তাৎপর্য থাকতে পারে?

যদি প্লেটো তাঁর 'সাধারণতন্ত্রে' কবিদের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকেন, তাঁর অন্য একটি রচনা 'ফিলেবাস'-এ (Philebus) তাঁর সুর কিঞ্চিৎ নরম। এই রচনায় সক্রেটিস বলছেন, মানুষের আত্মার অন্তস্তলে এমন কিছু নিগূঢ় সত্যের স্মৃতির তলানি পড়ে আছে যা কোনো 'ভালো' শিল্পী বা 'ভালো' চিত্রকর 'ভালো' মাইমেসিস-এর সাহায্যে জাগ্রত করতে পারেন। অর্থাৎ 'ভালো' মাইমেসিস নামে কোনো বস্তু প্লেটোর চিন্তায় আছে যার কর্তব্য হল হৃদয় নামক গ্রন্থে ভালো অর্থাৎ অদৃশ্য তথা আদর্শ জগতের কথা লিখে দেওয়া। অর্থাৎ প্লেটোর মতে সাহিত্য বা শিল্পকর্ম এক নিগূঢ় তত্ত্ব বা অর্থের (Logos) দ্বারা শৃঙ্খলিত—যদি অবশ্য তাকে, প্লেটোর অর্থে, ভালো ও অনুমোদনীয় হতে হয়। প্লেটোর এই চিন্তা তাঁর মৃত্যুর বহু পরে—বহু শতাব্দীর শেষেও নানারূপে এখনো জীবিত ও সক্রিয়। মালার্মের এই ক্ষুদ্র রচনাটি অর্থের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত

এবং দেরিদা আমাদের এটাও জানাচ্ছেন যে মূক যদি সততই নিজের মন থেকে অঙ্গভঙ্গির সৃষ্টি ক'রে দর্শকদের হাসি ও অস্বস্তির উদ্রেক করেন তার মানে অবশ্যই এই নয় যে সে তার আত্মার অন্তস্তল থেকে কোনো গুহ্য অর্থের ব্যাখ্যায় লিপ্ত – যেহেতু এই মূকাভিনয়ে একটা কাহিনীর রূপরেখা অবশ্য আছে – অর্থাৎ স্ত্রীহত্যা – যে কোনো প্লেটোনিক মিস্টিসিজ্‌ম থেকে এই অভিনয় (বা মালার্মের রচনা) মুক্ত থাকতে পেরেছে। দেরিদার 'জোড়া বৈঠকে'র শুরুতেই প্লেটোর 'ফিলেবাস'-এর কিয়দংশ ও মালার্মের রচনাটি পাশাপাশি মুদ্রিত করা হয়েছে এবং যেহেতু দেরিদার মতে কোনো রচনাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং প্রতিটি রচনাই অন্য রচনার সঙ্গে এক বা অন্য অর্থে যুক্ত (এ-প্রসঙ্গ আমি উপরে, প্লেটোর 'আয়ুর্বেদভবনে'র আলোচনাকালে উত্থাপিত করেছি), সে-কারণে দেরিদার অনেক টীকাকারের মতে দু'টি ভিন্ন রচনার এই একত্রে মুদ্রণ দেরিদার আন্তঃরাচনিকতা বা Inter texluality-র অনুসরণে সাধিত হয়েছে। এ-ব্যাপারে দেরিদার ঐ টীকাকারদের সঙ্গে আমার কোনো দ্বিমত নেই।

কিন্তু দেরিদার এই প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে যা তাঁর টীকাকাররা লক্ষ করেন না এবং যা এই প্রসঙ্গে আমি অবশ্য-আলোচ্য বলে মনে করি। 'জোড়া বৈঠকে' সমস্যাটা শুধু প্লেটো বা তাঁর চিন্তা নয়। এই প্রবন্ধে একাধিকবার হেগেলকে টেনে আনা হয়েছে। হঠাৎ হেগেল এ-প্রসঙ্গে এলেন কেন ? তাঁর 'ফেনোমেনোলজি অফ মাইণ্ড-এ' হেগেল অন্তর ও বাহিরের পর্দার রূপক ব্যবহার করেছেন, তার সঙ্গে 'ফিলেবাস'-এ প্রদত্ত প্লেটোর বক্তব্যের কোনো বিশেষ পার্থক্য নেই। এই সাদৃশ্য অবশ্যই এই প্রবন্ধে হেগেলের উল্লেখের একটি কারণ, কিন্তু তার অন্যান্য কারণও সম্ভব এবং অর্থপূর্ণ।

ফরাসি সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন যে বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বহু পণ্ডিত ও ভাবুক এই ধারণা পোষণ ক'রে এসেছেন যে মালার্মে ছিলেন হেগেলিয়ান ; জঁা ইপোলিৎ বা হর্বর্ট ম্যারকুসা প্রমুখ হেগেলীয় দার্শনিকদের এই ধারণার ফলে মালার্মে-সমালোচনা বহুলাংশে হেগেল-আশ্রয়ী হয়ে উঠেছিল। এমনকি মালার্মের সবচেয়ে বড় ভারতীয় শিষ্য ও আধুনিক ভারতীয় বাংলা কাব্যের এক দিকপাল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত এই বিশ্বাসের কবলিত হন। মালার্মের 'ফনের অপরাহ্ন' (L' Apres-Midi d'un Faune)-এর যে বঙ্গানুবাদ সুধীন্দ্রনাথ করেছেন ('ফনের দিবাস্বপ্ন' নামে) তার সংলগ্ন ভাষ্যে তিনিও মালার্মেকে হেগেলের শিষ্য পর্যায়ে তুলেছেন।[১৮] কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের সমর্থনে শুধু এটাই বলা যায় যে তিনি হেগেলকে মূলত বৈনাশিক হিসাবে বিবেচিত করেছেন, যেহেতু শেষোক্তের বিচারে বিশুদ্ধ সত্তা আর নির্বিকার নাস্তি তুল্যমূল্য.। কিন্তু মুশকিল এই যে চৈতন্যের এই বিনাশ বা নির্বিকার নাস্তি, হেগেলীয় দর্শনে একটা ধাপ মাত্র। যে পরিস্থিতিকে হেগেল আখ্যা দিয়েছেন 'আউফ্‌-

হেবুং' (Aufhebung), অর্থাৎ যে পরিস্থিতি থিসিস-অ্যান্টিথিসিসের সংঘাতে নাকচ হয়ে আরো উন্নত অবস্থার দিকে উত্থিত হয়, সেই পরিস্থিতির মধ্যে সত্তার নির্বিকার নাস্তিও অস্তিত্ব পেয়ে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে অ্যাবসল্যুটের গর্ভে নিহিত হয়। তাঁর যৌবনে কিছুদিন মালার্মে ফরাসি অনুবাদে হেগেল পড়েছিলেন ও সাময়িকভাবে হয়ত হেগেলের দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয়ে থাকবেন, কিন্তু ১৮৬৯-এর পর (মালার্মের বয়স তখন সাতাশ) প্রকাশিত মালার্মের রচনার সঙ্গে হেগেলীয় চিন্তার কোনো যোগাযোগ আর ছিল না। সম্ভবত এটাই দেরিদার প্রতিপাদ্য; প্লেটোর চিন্তার সঙ্গে হেগেলীয় দর্শনের সাদৃশ্যের প্রতি নির্দেশ ক'রে দেরিদা সম্ভবত এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মালার্মের হেগেল-ভক্তি একটা কিংবদন্তি মাত্র।

মালার্মের সঙ্গে দেরিদার আত্মীয়তার বহু সংগত কারণ আছে। যেমন, মালার্মের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য পোল ভালেরির প্রতি দেরিদার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। মালার্মের শেষ দিকের কাব্য – যেমন ভালেরি-র সমগ্র রচনা – নাস্তি ও শূন্যতায় গভীরভাবে চরিত্রায়িত; এই নাস্তিকে অতিক্রম করার কোনো প্রচেষ্টাই মালার্মে বা ভালেরি-র রচনায় নেই; নেই কোনো হেগেলীয় আউফ্‌হেবুং-এর ইঙ্গিত এবং মালার্মের যে বৈনাশিকতার কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করেছেন, দেরিদার দার্শনিক রচনায় তার প্রভাব বা ছাপ সহজে প্রতীয়মান। মালার্মের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও দুরূহ রচনা তাঁর গদ্য কবিতা Igitur বা ইজিতুর, যার মধ্যে এই নাস্তিবোধ ও শূন্যতা প্রায় চরমে পৌঁছেছে এবং এই বিচিত্র ও বিখ্যাত রচনাটির উপর এক বিখ্যাত ব্যক্তির কয়েকটি অভিমত আমি এখানে উল্লেখ করছি। এই বিখ্যাত ব্যক্তিটি কবি পোল ক্লোদেল (Paul Claudel)। প্রগাঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও উগ্র ক্যাথলিক এই কবিও তাঁর যৌবনে মালার্মের শিষ্য ছিলেন। বিশের দশকের গোড়ার দিকে ক্লোদেল একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন, 'বিপন্ন ইজিতুর' (La Catastrophe d'Igitur) শিরোনামে; তিনি মালার্মের এই রচনার মধ্যে হেগেলীয় অধিবিদ্যা বা অন্য কোনো ধর্মতত্ত্বের প্রভাব না দেখে অতিশয় সহজ ভাষায় মূল বক্তব্যটি তুলে ধরেছিলেন এবং এ-প্রবন্ধটি আজও – ষাট বছর পরে—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সেই কারণে অবশ্যপাঠ্য। ক্লোদেলের মতে, 'মালার্মেই প্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেকে স্থাপিত করেছিলেন বাহ্যজগতের মুখোমুখি: এই জগৎকে কোনো দর্শনীয় বস্তু (spectacle) হিসাবে নয়…একটি লিখিত রচনা (un texte) হিসাবে ধরে নিয়ে এবং এই প্রশ্ন ক'রে "এর অর্থ কি" ?'[১৯] এবং 'কবি ইতিমধ্যেই সারমর্ম (essentiel) জেনেছেন…বাহ্যিকতার সেই বিশাল যন্ত্রের (la copieuse machine des apparences) তলায়, বস্তুত, আছে শুধু শূন্যতা, অনুপস্থিতি (vacances, absence); নির্মল দৃষ্টিপাত (un regard pur) করেছেন তিনি দানবের উপর। ইজিতুরের অভিযান শেষ হল।'[20]

বস্তুত, ইজিতুরের অভিযান এখনো শেষ হয় নি। ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও উগ্র ক্যাথলিক ক্লোদেলের এমন ধারণা হয়েছিল যে মালার্মের পর ঐ শূন্যতা বা নাস্তিবোধ থেকে ফরাসি চিন্তা রক্ষা পাবে। ঐ একই প্রবন্ধে ক্লোদেল লিখেছিলেন : 'আমরা এই সাংঘাতিক অসাড়ত্ব (ce fatal engourdissement) থেকে বেরিয়ে এসেছি।' যদি বস্তুনিচয়ের পিছনে শূন্যতার উপলব্ধি হয় 'সাংঘাতিক অসাড়ত্ব' তাহলে সেই অসাড়ত্বের কেন্দ্রে ফরাসি চিন্তা ক্রমাগতই ফিরে গেছে। মালার্মের ইজিতুর সম্পর্কে ক্লোদেল যে কথাগুলি বলেছেন তার প্রায় সব ক'টিই জাক দেরিদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেরিদার সামনেও বাহ্যজগৎ একটি লিখিত রচনা, আর সেই রাচনিক ক্ষেত্রে রাশি রাশি অক্ষরের পশ্চাতে দেরিদা দেখছেন শুধু অর্থের শূন্যতা, অনুপস্থিতি। এই কারণে দেরিদার বিরুদ্ধে এসেছে বিনাশবাদ বা nihilism-এর অভিযোগ ; সে-প্রসঙ্গে আমি একটু পরে ফিরে আসব।

জাক দেরিদার শিষ্য-শিষ্যারা মানুন বা নাই মানুন, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে দার্শনিক চিন্তায় দেরিদার হাতেখড়ি হয়েছিল তরুণ অস্তিত্ববাদী সার্ত্রের শিক্ষায়। বিশুদ্ধ চৈতন্য আর নাস্তি শুধু অভেদই নয়, পক্ষান্তরে, যে মুহূর্তে চৈতন্য সক্রিয় হচ্ছে—এবং সক্রিয় হওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় নেই—সে মুহূর্তে তার ধ্বংস হচ্ছে, তার লোপ হচ্ছে নাস্তির গর্ভে।[২১] হুসের্লীয় চিন্তার বিরুদ্ধে লিখিত ঐ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি বছর দশেক আগে প্যারিসে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সার্ত্র-শিষ্যা শ্রীমতী সিল্‌ভি ল বঁ-র সম্পাদনায়। ঐ নতুন সংস্করণের সম্পাদিকা এটা স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন, তরুণ সার্ত্র ও দেরিদার গোড়ার দিককার একটি প্রবন্ধের বক্তব্যের আশ্চর্যকর সাদৃশ্য।[২২] ব্যাপারটাকে সার্ত্র-শিষ্যার গুরুভক্তির নজির বিবেচনা ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মানুষী চৈতন্যকে সম্পূর্ণভাবে নঞর্থক বিবেচনা ক'রে তাকে নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার, সার্ত্রের আগে, একমাত্র ভারতীয় বৌদ্ধ নাগার্জুন ব্যতীত আর কেউ করেন নি এবং এটা আমার ব্যক্তিগত মত নয়।[২৩] কিন্তু এটাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে যদি তরুণ সার্ত্রের গভীর প্রভাব দেরিদার উপর পড়ে থাকে, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ সার্ত্রের চিন্তার সঙ্গে জাক দেরিদার কোনো যোগাযোগ নেই। বস্তুত, প্রৌঢ় বা হিউম্যানিস্ট সার্ত্রের বিরুদ্ধে দেরিদার কিছু বক্তব্য আছে।

নাস্তির প্লাবনে মজ্জমান তরুণ সার্ত্র, যুদ্ধের পর, প্রথমে হিউম্যানিজ্‌ম ও পরে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদ—বা এক ধরনের মার্কসবাদের খুঁটি আঁকড়ে ধরে রক্ষা পেয়েছিলেন। ১৯৪৫-এ প্রদত্ত বক্তৃতা, L'Existentialisme est un humanisme-এ যে হুসের্লীয়-কার্তেসীয় বক্তব্যগুলিকে সার্ত্র একদা পরিত্যাগ করেছিলেন, সেগুলিকে সামান্য বদল ক'রে, সার্ত্র আবার সেখানেই ফিরে যান।[২৪] এই ফিরে যাওয়ার পিছনে যুক্তির কোনো অবশ্য অভাব ছিল না। কারণ, যদি

হিউম্যানিজ্‌ম হয় মানুষী চৈতন্যের অবাধ স্বাধীনতা ও স্বরাটত্ব ও তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দাবি ইত্যাদি—তাহলে এক ধরনের প্লেটোনিস্ট-কার্তেসীয় চিন্তায় বিশ্বাস রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা অনেকের কাছে খুব সহজবোধ্য না হতেও পারে, কারণ অনেকেই, এমনকি কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও, মনে করেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলেই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। যাই হোক, সার্ত্রের বক্তৃতার দু'বছর পরে, ১৯৪৭-এ হিউম্যানিজ্‌ম সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে জানিয়ে হাইদেগার প্রকাশ করলেন তাঁর 'হিউম্যানিজ্‌ম প্রসঙ্গে চিঠি'। বইটির ইংরেজি অনুবাদ, Letter on Humanism খুবই সহজপ্রাপ্য। এ বইটিতে হাইদেগার সরাসরিভাবে নিজেকে সার্ত্র ও তাঁর হিউম্যানিস্ট নিনাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ক'রে এটাই দেখাতে সচেষ্ট হলেন যে হিউম্যানিস্ট চিন্তাগুলি, যথা মানুষ যুক্তিশীল, মানুষ সৃজনশীল, মানুষ তার স্বীয় বুদ্ধিবলে স্বীয় ভাগ্যের নিয়ন্ত্রাতা ইত্যাদি মূলত মনুষ্যচরিত্রের উপর কিছু প্রাক্‌-বিশ্লেষণী (a priory) সারত্ব (essence) আরোপ করা ব্যতীত আর কিছু নয় এবং ঐ আরোপণ প্লেটোনিজ্‌মের নামান্তর মাত্র।

হিউম্যানিজ্‌মের বিরুদ্ধে দেরিদার সমালোচক-দৃষ্টি মূলত হাইদেগারের অনুসরণকারী; পার্থক্য এই যে যদি হাইদেগারের উক্ত রচনায় কয়েক চামচ মিস্টিক উপাদান রয়ে থাকে, তা থেকে দেরিদার বক্তব্য একেবারেই মুক্ত। ১৯৬৮-তে নিউইয়র্কে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় এই আলোচনা দেরিদা করেন যা পরে Les Fins de I'homme নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত; fin অর্থ শেষ, কিন্তু বহুবচনে fins শব্দের অর্থ উদ্দেশ্যও হতে পারে। এই আলোচনার মূল বক্তব্য অবশ্যই জাঁ পল সার্ত্রের শেষ দিককার দার্শনিক মতামত। প্রবন্ধের প্রাক্কালে দেরিদা এটি আমাদের পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি তরুণ সার্ত্রের রচনার মনোযোগী পাঠক ও অনুরাগী—যে তরুণ সার্ত্র একদা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'বিবমিষা'য় হিউম্যানিস্টদের তীক্ষ্ণ ও নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করেন একটি স্বয়ংশিক্ষিত (autodidacte) ব্যক্তি বা হিউম্যানিস্ট-এর চিত্রণে; এই ব্যক্তির জ্ঞানক্ষুধা এমনই ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী যে ইনি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিশ্বের সব লেখকদের রচনা পাঠ ক'রে জ্ঞানমার্গের (প্রায় হেগেলীয়) অ্যাবসল্যুটে উন্নীত হবার চেষ্টা করেন। 'আর যাই হই, আমি হিউম্যানিস্ট নই'—বলেছিলেন 'বিবমিষা'র কথক একদা। এ-সবই দেরিদা উল্লেখ করেছেন। তিনি এটা আরো দেখিয়েছেন যে যুদ্ধচলাকালে সার্ত্রের যে বৃহৎ ডক্টরাল থিসিস 'অস্তি ও নাস্তি' (L'etre et le ne'ant) নামে প্রকাশিত হয় তার মধ্যেই সার্ত্রের উত্তরকালের রূপান্তর, অর্থাৎ হিউম্যানিজ্‌মের, বীজ নিহিত ছিল। এই থিসিসে 'নিজের মধ্যে হওয়া' (etre en soi) ও 'নিজের জন্য হওয়া' (etre pour soi)-র যে সংশ্লেষ (বা synthesis)-এর প্রচেষ্টা হয়েছে তা ইতিমধ্যেই কার্তেসীয় 'কজিটো' (cogito) অর্থাৎ অধিবিদ্যার লক্ষণাক্রান্ত; এই

সংশ্লেষ ব্যতিরেকে অবশ্যই কোনো হিউম্যানিস্ট মতাদর্শ টিকতে পারে না।

Cogito অর্থাৎ 'আমি চিন্তা করি'; কিন্তু এই 'আমি' ইচ্ছা করলেই চিন্তা করা ছেড়ে দিতে পারি না; এই 'আমি' তার নিজস্ব শূন্যতা থেকে মুক্তির জন্য চিন্তা করতে বাধ্য। এই চিন্তার কোনো বিকল্প নেই, একমাত্র নাস্তির মধ্যে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া এবং এই নাস্তি-কে ভাষায় বর্ণনা করা, বুদ্ধির আয়ত্তে আনা অসম্ভব। সুতরাং চিন্তা করা বা না করা 'আমি'-র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সেক্ষেত্রে এই 'আমি'-কে এক কাল্পনিক স্বাধীনতার অধিকারী করা, এই 'আমি'র উপর স্বরাটত্ব আরোপ করার পিছনে আছে ঈশ্বর হওয়ার বা ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছে; এটাই সার্ত্রীয় হিউম্যানিজ্‌ম (বা অন্যান্য কারখানায় প্রস্তুত সব হিউমানিজ্‌ম)-এর মূল কাঠামো এবং একেই দেরিদা বলেছেন—'মানুষ ও ঈশ্বরের আধিবিদ্যক একীকরণ' (l'unité métaphysique de l'homme et de Dieu)। সার্ত্র ও অন্যান্য সব হিউম্যানিস্টরা নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। দেরিদার মতে 'নিরীশ্বরবাদ এই মূল কাঠামোর কিছুই বদলাতে পারে না' (L'athéisme ne change rien a cette structure fondamentale)।[২৫]

বক্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য। এটা অবিদিত নয় যে ঈশ্বরের সঙ্গে হিউম্যানিস্টদের খুবই অপ্রণয়। কিন্তু যদি তাঁরা সদর দুয়ারে খিল দিয়ে থাকেন ঈশ্বরের প্রবেশকে ব্যাহত করার জন্যে, তাঁদের খিড়কি দিয়ে ঈশ্বরের প্রবেশ অব্যাহত।

যদি রাজাকে খুন ক'রে রাজা সাজার প্রচেষ্টায় অধিকাংশ রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে ঈশ্বরকে সরিয়ে ঈশ্বর হওয়ার ঐকান্তিক কামনা হিউম্যানিজ্‌ম ও সামগ্রিকভাবে মনুষ্যজাতির কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে নি। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, গর্বোদ্ধত ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রে, ছয় মিলিয়ন নিরস্ত্র ইহুদিকে (পুরুষ, নারী ও শিশু) গ্যাস চেম্বারে পুরে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটা ওখানেই মেটে নি। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড, লেবানন, কাম্পুচিয়া, পাঞ্জাব, শ্রীলংকা ও মনুষ্য সভ্যতার আঁতুড় ঘর ইরাকে তো রক্তস্রোত বইছেই। মানুষ যুক্তিশীল ও সৃজনশীল, এ প্রত্যয় আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত নয়। কিংবা ধরা যাক পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীয় রেনেশাঁসের কথা। এই রেনেশাঁস সম্পর্কে জাঁ পল সার্ত্র-এর কণামাত্র দুর্বলতা ছিল না। কিন্তু অন্য হিউম্যানিস্টদের আছে। রেনেশাঁসের কয়েকজন অসামান্য মনীষী অবশ্যই আছেন, যথা গ্যালিলিও বা লেওনার্দো দা ভিঞ্চি; এঁদের মতো প্রতিভা উত্তরকালে খুব বেশি আর আসে নি। কিন্তু ঐ একই রেনেশাঁসের বৈধ সন্তান ছিলেন নিকোলো মাকিয়াভেলি, যিনি রাষ্ট্রনায়কদের শিখিয়েছিলেন কিভাবে নীতি-দুর্নীতির বোধকে পরিত্যাগ ক'রে ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে আয়ত্তে আনতে হয় এবং যিনি বহুবিধ অবতারে যুগে যুগে জন্মেছেন। কিংবা রিমিনির

দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুঃশাসক মালাতেস্তা যিনি হাসতে হাসতে নরহত্যা করতেন, কিংবা ফ্রান্‌চেশ্‌কো চেঞ্চি (Cenci) যিনি তাঁর আত্মজাকে শয্যাসঙ্গিনী করেছিলেন এবং যাঁর জীবনীকে অবলম্বন ক'রে বড় গল্প ফেঁদেছেন স্তঁদাল বা নাটক লিখেছেন শেলী। রেনেসাঁসের ভক্তরা অবশ্যই ঐ যুগের আদর্শ হিসাবে ধরে নেন শুধু গ্যালিলিও কিংবা ভিঞ্চিকে। যা মানবিকতার বিকাশ নয়, যা শুধু ক্ষমতালোভীদের ধূর্ত কূটনীতি, যা যুক্তি নয়, যা শুধু উন্মাদনা, যা সৃজনশীলতা নয়—যা আত্মধ্বংসী বিকার মাত্র, তা আমাদের মনঃপূত বা রুচিসম্মত না হতে পারে, কিন্তু সেগুলিকে বর্জন ক'রে কোনো সুস্থ জীবনদর্শন সম্ভব নয়। মাকিয়াভেলি, মালাতেস্তা ও চেঞ্চিকে বর্জন ক'রে শুধু গ্যালিলিও ও লেওনার্দোকে বেছে নেওয়ারই নাম প্লেটোনিজ্‌ম; এরই মূলে আছে আধিবিদ্যক ঐতিহ্যের কামড়।

এ কথাগুলো অবশ্যই হাইদেগার বা দেরিদার নয়। কিন্তু যে দার্শনিক যুক্তির সাযুজ্যে তাঁরা হিউম্যানিজ্‌মকে সমালোচনা করেছেন তা থেকে উপরোক্ত বক্তব্যগুলো স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে আসে। মূল সমস্যাটি এই যে মানুষের এমন কোনো নিজস্ব প্রাতিস্বিক সত্তা আছে কিনা যা অনড়, অটল এবং যা বহিরাগত অভিজ্ঞতার চাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। উনিশ শতকের পজিটিভিজ্‌ম (positvism), যার জন্ম হয়েছিল তৎকালীন ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দ্রুত অগ্রগতি, প্রসার ও তার অন্তর্বর্তী আশাবাদে, বিশ্বাস করত এমন এক প্রাতিস্বিক সত্তায়। আধুনিক হিউম্যানিজ্‌ম সেই পজিটিভিজ্‌মেরই একটি প্রশাখা।

কার্ল মার্কস-ই প্রথম এই বিশ্বাস বা অহমিকার মূলে আঘাত ক'রে এটা দেখান যে মানুষী চৈতন্য, তার প্রবৃত্তি এবং তার মনন বাইরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিয়ামকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যার উপর মানুষের কোনো নিরংকুশ ক্ষমতা নেই। ফ্রয়েডীয় চিন্তায় মানুষের সচেতন মনের স্বাধীনতা নাম মাত্র; তার তলায় অবচেতন স্তরে যে অবদমিত ইচ্ছা বাল্যাবধি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তারই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া মানুষের ব্যবহার ও প্রতিন্যাসের মূলে কর্মরত রয়েছে। এবং আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে কিছু সংখ্যক মার্কিন ভাষাতাত্ত্বিক এটা বারংবার ঘোষণা করেছেন যে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা একটা অলীক ব্যাপার, কারণ যে-ভাষার মাধ্যমে আমরা চিন্তা বা তার প্রকাশ ক'রে থাকি তার গঠন ও সংবিধান আমাদের চিন্তার পরিচালক। অর্থাৎ মানুষ তার স্বীয় ভাগ্যের নিয়ন্ত্রাতা—এ-বক্তব্য কথঞ্চিৎ নাটকীয় বটে, কিন্তু যুক্তি ও ভিত্তিহীন। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটিকে কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করা যেতে পারে।

ধরা যাক ব্রিটেনে প্রবাসী এক ভারতীয়ের কথা, যাকে বলা হল জাক দেরিদার উপর ভারতীয় কোনো ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখতে, যেটি প্রকাশিত হবে ভারতেরই একটি পত্রিকায়। ব্রিটেনে এবং ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার

আছে ; এ দুই দেশের প্রধান মন্ত্রীরা নির্বাচিত এবং এ-দেশগুলিতে দেরিদার উপর প্রবন্ধ লিখলে থানায় গিয়ে জবাবদিহি করার আশংকা নেই। কিন্তু এটাই কি সব ? প্রবন্ধটি লিখতে বসে দেখা গেল যে দেরিদা এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন, কোনো ভারতীয় ভাষাতেই যাদের কোনো প্রতিশব্দ নেই। সুতরাং প্রবন্ধটি ঠিক যেভাবে লিখলে এই ব্যক্তি খুশি হতেন তা না করতে পেরে, ভারতীয় সেই ভাষাটির সামর্থ্য অনুযায়ী প্রবন্ধকে অন্যভাবে ঢেলে সাজাতে হল। অর্থাৎ এডওয়ার্ড সপির যা বলেছেন সেটাই ঠিক : আমরা আমাদের ভাষার হাতের ক্রীড়নক মাত্র ('...are very much at the mercy of the particular language which has become the medium of expression')।[২৬]

মানুষের আছে এমন এক নিশ্চল, শক্তিশালী সত্তা যা এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মতো বাইরের আঘাতকে সর্বদাই প্রতিরোধ করতে পারে—এমন ধারণায় আমাদের অহমিকা প্রশ্রয় পায় ও আমাদের ইউটোপীয় স্বপ্নের রসদ জোটে। আধুনিক ফ্রান্সের আর এক বিখ্যাত দার্শনিক, মিশেল ফুকো যাঁর নামোল্লেখ আমি এখনো পর্যন্ত এ-প্রবন্ধে করি নি, অতিশয় স্পষ্টভাবেই এটা জানিয়েছেন যে মানুষ বা 'মানুষে'র ধারণা (concept) একটা খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার এবং সে ধারণা এখন অবলুপ্তির পথে। একাধিক ব্যাপারে ফুকোর সঙ্গে দেরিদার গুরুতর মতানৈক্য ঘটেছে, কিন্তু 'মানুষে'র ধারণা যে অবলুপ্তির পথে এবং নরকেন্দ্রিক (anthropocentric) চিন্তা যে ধ্রুপদী অধিবিদ্যার অবশিষ্ট তলানি, এ বিশ্বাসে দেরিদা, ফুকোর-ই মতো, প্রোথিতমূল।

জাক দেরিদা, ঠিক এই মুহূর্তে ফ্রান্সের সর্বপ্রধান ভাবুক এবং তিনি অতিশয় পরিশ্রমী লেখকও বটে। গত কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি লিখেছেন পনেরো-ষোলটি বই ; বেশ কিছু প্রবন্ধ এবং মাত্র কয়েক মাস আগে—১৯৮৭-র ডিসেম্বরে, তাঁর আরো দু'খানি বই একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দেরিদার প্রত্যেকটি বক্তব্যের আলোচনা এ-প্রবন্ধে সম্ভব হয় নি। মাত্র কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য এখানে তুলে ধরেছি এবং আলোচিত বক্তব্যগুলি থেকে, আশা করি, এই বস্তুবক্তব্য পরিস্ফুত হয়েছে যে আমরা যাকে দার্শনিক রচনায় সত্য, সারবস্তু বা পরমার্থ আখ্যা দিতে অভ্যস্ত, মূলত তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শব্দের অর্থ যদি ক্রমাগতই স্থগিত থাকে, যদি ভাষা হয় রূপক এবং দার্শনিক রচনায় যদি এই রূপকত্ব হয় যুক্তির সংক্রমণ বা সংক্রমণের যুক্তি এবং যদি আধিবিদ্যক ভাবুকেরা তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট এবং ভাষার অন্তর্নিহিত ফাঁদে ক্রমাগত আটকে পড়েন এবং যদি তাঁদের প্রকাশিত বা ব্যক্ত উক্তি তাঁদের অভিপ্রেত বক্তব্যের বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই যে প্রায়

পঁচিশ শতাব্দীর দৌরাত্ম্যের পর ইয়োরোপীয় অধিবিদ্যা জাক দেরিদায় পৌঁছে এখন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ; এটাই দেরিদীয় ডিকন্‌স্ট্রাক্‌শনের একমাত্র লক্ষ্য।

স্বভাবতই এই কারণে দেরিদার বিরুদ্ধে বিনাশবাদ বা nihilism-এর অভিযোগ এসেছে এবং যদি আমি দেরিদার রচনা বুঝে থাকি তাহলে, আমার ধারণা, দেরিদাকে এই অভিযোগ থেকে মুক্ত করা সহজ নয়। ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক বিনাশবাদের বীজ দেরিদার রচনায় সহজে প্রতীয়মান। সমস্যাটি কিঞ্চিৎ অভিনব। যদি আমরা লিখিত উক্তির পশ্চাতে কোনো নির্ধারিত ও স্পষ্ট অর্থের উপস্থিতি দেখি, তাহলে আমরা অধিবিদ্যার ফাঁদে পড়তে বাধ্য। পক্ষান্তরে যদি আমরা অর্থের উপস্থিতিকে সরিয়ে সে-স্থান শূন্য রাখি, বিনাশবাদের অভিযোগ সেক্ষেত্রে অনিবার্য। এ দু'য়ের মধ্যে দেরিদা কোনো রফা করেন নি, যদিও তিনি বিনাশবাদের অভিযোগকে প্রসন্নচিত্তে নিতে পারেন নি এবং এটাও এখানে উল্লেখ্য যে এই শূন্যতা ও বৈনাশিকতা সত্ত্বেও দেরিদার হাস্যোজ্জ্বল রচনার কোথাও কোনো হতাশা বা নৈরাশ্যের অন্ধকার নেই, বরং কুসংস্কারী ধর্মতত্ত্বকে পরাজিত করার একটা আনন্দ আছে। অর্থাৎ যা দর্শনের আত্মহত্যা, তা আত্মহত্যার দর্শন নয়। এই উক্তির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমি মিখাইল আর্জিবাশেফ নামে এক অনতিবিখ্যাত রুশ লেখক ও তাঁর উপন্যাস 'স্যানিনে'র উল্লেখ করেছি। এই একই লেখকের আর একটি উপন্যাস প্রথম যুদ্ধের পর ইংরেজি ও ফরাসি অনুবাদে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে ; উপন্যাসটির নাম 'চরমে'* (ইংরেজি অনুবাদ : 'On the brink')। ঘটনা ঘটছে প্রাক্‌-বিপ্লব রাশিয়ার একটি ছোট প্রাদেশিক শহরে, যেখানে জীবনের যাবতীয় কামনা-বাসনার শূন্যতা ও অস্তিত্বের অর্থহীনতার উপলব্ধিতে কিছু তরুণ বুদ্ধিজীবী এক এক ক'রে আত্মহত্যা করতে শুরু করল ; যে দু'-একজন নরনারী আত্মহত্যার এই মড়ক থেকে নিজেদের রক্ষা করলেন তাঁরাও অস্তিত্বের এক মাত্র অর্থ খুঁজলেন প্রেমহীন যৌনক্রিয়ার মধ্যে। জাক দেরিদার মতো মিখাইল আর্জিবাশেফও ছিলেন নীচ্‌এ-র শিষ্য, কিন্তু তাঁর রচনায় নীচ্‌এ-পাঠের ফল হয়েছিল অন্যরূপ।

জাক দেরিদার পাঠক ও শিষ্য-সংখ্যা যেমন ইদানীং ক্রমবর্ধমান, তাঁর বিরুদ্ধে তেমনই সমালোচনাও হয়েছে প্রচুর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সমালোচনা দেরিদার বিরুদ্ধে হয়েছে তার অধিকাংশের সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। ব্রিটেনে যে আলোচনা হয়েছে বা হচ্ছে তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ জুড়ে

---

* Michel Artzybachev, *A l'extreme limite* (Traduction ; Jacques Povolozky) Paris, Bernard Grasset, 1913.

আছে নিছক গালাগাল, কটুকাটব্য বা ইংরেজদের চরিত্রগত বিদেশী-ভীতি (xenophobia) বা বিদেশী চিন্তার প্রতি অবিশ্বাস ও অসহনীয়তা।

ধরা যাক, প্রবীণ ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক অ্যান্টনি বার্জেসের কথা। বছর আট-দশ আগে তিনি 1985 নামে একটি চটুল উপন্যাস বাজারে ছাড়েন ; বইটি একটি 'ডিস্‌টোপিয়া', যা হল ইউটোপিয়ার উল্টো, অর্থাৎ বীভৎস ভবিষ্যতের কল্পনা। এই বইটিতে কল্পনা করা হয়েছে যে জেনারেল জাক দেরিদা ও তাঁর লেফটেনান্ট কর্নেল গায়ত্রী চক্রবর্তী ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করেছেন। এটা অবশ্যই বৃদ্ধ বার্জেসের শৌণ্ড প্রগল্‌ভতা হিসাবে অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু যাঁকে অগ্রাহ্য করা যায় না তিনি জর্জ স্টাইনার, ইংরেজি ভাষায় জীবিত সাহিত্য-সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

১৯৮৫-র নভেম্বর মাসে, স্টাইনার কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেসলি স্টিভন্‌স বক্তৃতা দেন ; বিষয় ছিল কবিতার অর্থোদ্ধার। বক্তৃতার একটি বিরাট অংশ পরবর্তী সপ্তাহের *Times Literary Supplement*-এ প্রকাশিত হয় ; প্রকাশিত অংশে দেরিদার নামোল্লেখ মাত্র একবার, কিন্তু সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল ডিকন্‌স্ট্রাক্‌শন। দেরিদীয় পদ্ধতিকে স্টাইনার তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সংক্ষিপ্তভাবে বুঝিয়ে দিয়ে এটা স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন : 'Let me say at once that I do not perceive any adequate logical or epistemological refutation of deconstructive semiotics।'[২৭] অর্থাৎ, সোদ্দা কথা, দার্শনিক যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে দেরিদা অনাক্রম্য। তাঁর চিন্তায় এমন কোনো যুক্তির গহ্বর নেই যার মধ্যে তাঁকে ফেলা যায়। কিন্তু স্টাইনার এখানেই থামেন নি। 'এই বিনাশবাদের জবাব চাই'—বলেছেন তিনি : 'The summons of nihilism demand answer.' কী জবাব স্টাইনার দিচ্ছেন সেটাই এখন দ্রষ্টব্য। তাঁর মতে কবিতা বা রচনার যেন (as if) কোনো অর্থ আছে এটা আমাদের ধরে নিতেই হবে এবং এই ধরে নেবার পর, স্টাইনার তাঁর বক্তৃতায় ধীরে ধীরে, এক গাঢ় মিস্টিসিজ্‌মের দিকে এগিয়েছেন এবং এটাই তাঁর বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য।

> ....The mystery of poetic, artistic creation and that of vital reception are never wholly secular. A dread sense of blasphemy in regard to the primal act of creation, of illegitimacy in the face of God, inhabits every moment of spirit and of composition in Kafka's work.[২৮]

এবং, It may be the case that nothing more is available to us than the absence of God. Wholly felt and lived, the absence is an agency and ***mysterium tremendum***.[২৯]

বক্তব্যগুলি এমনই সহজ যে এর উপর কোনো বিশদ টীকা নিষ্প্রয়োজন। কবিতাকে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা কিছু নতুন নয়। স্টাইনারের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই জানেন যে প্লেটোর 'ইয়ন' ও 'ফীড্রাস' থেকে শুরু ক'রে অঁরি ব্রেমঁ-র কাব্য ও প্রার্থনাকে যুক্ত করা পর্যন্ত এ-প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে। অর্থাৎ দেরিদা যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন স্টাইনার তাকেই আবার ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তৎপর। এ-বিবাদের কোনো সমাধান নেই। আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে : হয় mysterium tremendum-এ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে প্রতি মুহূর্তে ধরে নেওয়া 'যেন' কবিতার বা অন্যান্য রচনার কোনো নির্ধারিত অর্থ আছে, কিংবা মিস্টিসিজ্‌ম ও অধিবিদ্যাকে বর্জন ক'রে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকা যে আমাদের সামনে, মুদ্রিত রচনার ক্ষেত্রে নিয়ত এক অর্থের লুকোচুরি চলছে ভাষার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অজস্র ফাঁদের চারপাশে।

দর্শনের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। হেগেলের পর অধিবিদ্যার পক্ষে আর এগনো সম্ভব নয়। কিন্তু বহু শতাব্দীর রাজত্বের পর অধিবিদ্যা এমন এক সংক্রামিত ভাষার জাল রেখে গেছে যার হাত থেকে আমাদের অদূর ভবিষ্যতে কোনো মুক্তি নেই। এই সচেতনতা হয়ত আমাদের কিঞ্চিৎ নম্র ও বিনীত করবে; কোনো একটি রচনা পাঠ করা মাত্রই তার তাৎক্ষণিক মর্মোদ্ধারের উদ্দাম উন্মাদনা থেকে আমরা হয়ত বিরত থাকতে পারি। দেরিদীয় দর্শনের বোধ হয় এটাই প্রথম ও প্রধান শিক্ষা।

মালার্মের সঙ্গে দেরিদার মানসিক আত্মীয়তা ও মালার্মের মহান শিষ্য ভালেরির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও সপ্রশংস অভিমত, এদু'য়েরই নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। মালার্মে ও ভালেরির কাব্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে নাস্তিবোধ সঞ্চারিত রয়েছে, একাধারে সেই নাস্তিবোধ ও অন্যধারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার ফরাসি অস্তিত্ববাদের শিক্ষা – এ দুইয়ের চরম যৌক্তিক পরিণতি হয়েছে দেরিদার দার্শনিক চিন্তায়। হতে পারেন দেরিদা জন্মসূত্রে ইহুদি, কিন্তু তিনি মূলত ভূমধ্যসাগরীয় ফরাসি। হাইদেগারের প্রতি তাঁর এত অনুরাগ সত্ত্বেও, দেরিদার চিন্তা হাইদেগারীয় মিস্টিসিজ্‌ম থেকে মুক্ত। ফ্রিডরিশ নীচ্‌এ-র ক্ষ্যাপাটে রচনা-শৈলীকে দেরিদা প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তা গ্রহণ করেন নি। তীক্ষ্ণ ল্যাটিন যুক্তিনিষ্ঠার সাহায্যে জাক দেরিদা তাঁর চিন্তা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে এক নতুন দিকে ঘুরিয়েছেন। যদি এ-চিন্তা বিনাশবাদী হয় তাহলে সেই বিনাশবাদ কোনোভাবেই দেরিদার দর্শনকে কলুষিত করে না। যে কোনো নতুন ভাবনা, যে কোনো নতুন বিশ্লেষণ-পদ্ধতির গর্ভে নিহিত থাকে ধ্বংসের বীজ। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ দর্শন অনেকের কাছেই বৈনাশিক রূপে দেখা দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষে মার্কসীয় চিন্তা কিছু কম বৈনাশিক ছিল না। ফ্লব্যার-কে নীচ্‌এ আখ্যা দিয়ে-

ছিলেন বৈনাশিক।

আমি দেরিদার মোহান্ধ শিষ্য অবশ্যই নই, কিন্তু তাঁর একজন অনুরাগী পাঠক। আমি এ-বিশ্বাসে আস্থাশীল যে দেরিদার রচনায় বা তাঁর নিরলংকরণ পদ্ধতির মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ও সদর্থক দিক আছে। দার্শনিক রচনা তো বটেই— এমনকি ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনার আপাত বৈজ্ঞানিক নির্মোকের তলায় অধিবিদ্যা বা ভাববাদের যে উপস্থিতি প্রায়শই লুকিয়ে থাকে এবং যা অনেকের কাছেই খুব সহজে অনুমেয় নয়—তা দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন'-পদ্ধতির সাহায্য সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত হতে পারে। এর জন্য অবশ্যই যে কোনো রচনা পাঠকালে আমাদের প্রয়োজন অভিনিবেশ ও সংবীক্ষণের।

বস্তুত, জাক দেরিদা কোনো নতুন কথা বলেন নি, বা বলার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতি থেকে আমরা শিখতে পারি কি ভাবে কোনো একটি রচনা আমরা গভীর যত্নসহযোগে পাঠ করতে পারি এবং কোন যুক্তিতে কোনো একটি রচনা—বিশেষত সাহিত্যিক সৃষ্টি—পাঠ করা মাত্রই তাঁর মর্মোদ্ধারের তাৎক্ষণিক উদ্দীপনা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি।

যদি আড়াই হাজার বছরের অব্যাহত দাপটের শেষে পাশ্চাত্ত্যের অধিবিদ্যা ও ভাববাদ দেরিদীয় বিশ্লেষণের আবর্তনে নিজেদের সৃষ্ট ফাঁদে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তার জন্য কোনো শোকার্ত বিলাপের কারণ নেই। কারণ ভাববাদ মাত্রই জীবন-বিমুখ এবং সে-কারণে মানুষী চিন্তার পরম শত্রু।

স্বীকৃতি

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ফরাসি বুদ্ধিজীবী তিয়েরি মোলনিয়ে (Thierry Maulnier) একটি প্রবন্ধ লেখেন এই শিরোনামায় : 'Jean-Paul Sartre et le suicide de la littérature' অর্থাৎ 'জঁ পল সার্ত্র ও সাহিত্যের আত্মহত্যা'। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'লা তাব্‌ল রঁদ (La Table Ronde ; February, 1948) পত্রিকায়। সেই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার বর্তমান প্রবন্ধের কণামাত্র যোগাযোগ নেই কোথাও। তা ছাড়াও, ১৯৪৮-এ দেরিদা ছিলেন একজন অখ্যাত আঠারো বছরের যুবক। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধের নামকরণ কালে আমি মোলনিয়ে-র উক্ত প্রবন্ধটির শিরোনামের দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছি।

—

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত পারিভাষিক প্রতিশব্দ :

অতিক্রমণ	transcendence

অতীন্দ্রিয়	supra-sensible
অদ্বিতীয় স্বর	univocity
অধিবিদ্যা	metaphysics
অনির্ধারণীয়তা	undecidability
অভেদ	identity
অর্থ	logos, meaning
অর্থকরণ	signification
অর্থকারক	signifier
অর্থকেন্দ্রিক	logocentric
অহং	ego
আধিবিদ্যক	metaphysical
আন্তঃবাচনিকতা	inter textuality
আবেশ	passion
আভিধানিক (অভিধান প্রণেতা)	lexicographer
উচ্চারিত ভাষা	spoken language
উপস্থিতি	presence
এষণা	will
কথক	narrator
কৃত অর্থ	signified
চিহ্ন	sign
চিহ্ন তত্ত্ব	semiology
চিহ্নতাত্ত্বিক	semiologist, semiotician
চৈতন্য	consciousness
দ্বন্দ্ব	contradiction
নকল	simulacrum
নঞর্থক	negative
নরকেন্দ্রিক	anthropocentric
নাস্তি	negation
নাস্তি	nothingness
নিরলংকরণ	deconstruction
পরমার্থ	Logos
পরিশিষ্ট	supplement
প্রতিন্যাস	attitude
প্রণব	Verb

পিতৃরূপ	father figure
প্রাতিস্বিক	individual
বচন	speech, la parole
বহুলার্থক	polysemic
ব্যাখ্যাগত	hermeneutic
বিমূর্তন	abstraction
বিক্ষেপন	dissemination
মনগড়া ব্যবস্থা	arbitrary
মাধ্যম	medium
যোগসাজস	complicity
রাচনিক	textual
রাচনিক ক্ষেত্র	textual space
রূপক	metaphor
রূপকত্ব	metaphoricity
লিখন	writing, l'écriture
লিঙ্গকেন্দ্রিক	phallocentric
সদর্থক	positive
সারত্ব	essence
স্থগন	deffering, la différance
সংশ্লেষ	synthesis

এই প্রবন্ধে, হেগেল-ব্যবহৃত আউফ্‌হেবুং (Aufhebung)-এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি নি। এ-শব্দের কোনো যথার্থ ইংরেজি বা ফরাসি প্রতিশব্দআজও পাওয়া যায় নি। ব্রিটিশ বা মার্কিন ভাবুকরা সাধারণত আউফ্‌-হেবুং অর্থে sublation ও sublimation শব্দ দু'টি ব্যবহার করেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. Jacques Derrida, *Of Grammatology*, trans. Gayatri Chakravorty Spivak, John Hopkins University Press, 1976, পৃ ix – lxxxvii.

২. F. Nietzsche, *Das Philosophenbuch*, Paris (Aubier-Flammarion), 1969, পৃ ১৭৬।

৩. তদেব, পৃ ১৮০।

৪. Benjamin Lee Whorf, ***Language, thought and reality***, Massachusetts, 1962.
সমগ্র বইটিই মূল্যবান। 'The relation of habitual thought and behaviour to language' (পৃ ১৩৪) প্রবন্ধটি বিশেষভাবে পাঠ্য।

৫. 'Even more important : a difference generally implies positive terms between which the difference is set up ; but in language there are only differences ***without positive terms***. Whether we take the signified or the signifier, language has neither ideas nor sounds that existed before the linguistic system...' – Ferdinand Saussure, ***Course in general linguistics*** (Trans. Wade Baskin), London, Fontana, 1974, পৃ ১২০।

৬. Jacques Derrida, ***Marges de la philosophie,*** Paris, (Les Editions de Minuit), 1972, পৃ ১৩।

৭. Ferdinand Saussure, প্রাগুক্ত, পৃ ২৪, ২৫ ও ৩১।

৮. Jacques Derrida, ***De la Grammatologie***, Paris (Les Editions de Minuit), 1967, পৃ ৫২।

৯. তদেব, পৃ ৫৩।

১০. F. Nietzsche, ***Zur Genealogie der Moral***, Munchen (W. Goldman Verlag), পৃ ১২০-২১।
(ইংরেজি অনুবাদ, ***On the Genealogy of Morals***, New York (Vintage), 1969. পৃ ১৩২-৩৩।

১১. Iris Murdoch, ***The Fire and the Sun : Why Plato banished the artists,*** Oxford, 1978, পৃ ১৩১।

১২. Plato, ***Phaedrus and Letters***, VII & VIII, Penguin Classics, পৃ ৯৫-১০৩।

১৩. Jacques Derrida, ***La Disse'mination***, Paris, Edition du Seuil, 1972, পৃ ১৭২।

১৪. J. Frazer, ***The Golden Bough,*** Macmillan (paperback) ; 1957, পৃ ৭৫৮।

১৫. Jane Harrison, ***Prolegomena to the Study of Greek Religion,*** London, Merlin Press, 1980, পৃ ১০৮।

১৬. ***La Disse'mination***, পৃ ১৪৯।

১৭. মালার্মের 'Mimique,' প্লেইয়াদ্‌ সংস্করণে মালার্মের সমগ্র রচনাবলিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাছাড়া, রচনাটি গালিমার (Gallimard), Collec

tion Poésie সিরিজে প্রকাশিত মালার্মের Igitur, Divagations, un coup de dés'-এর মধ্যেও স্থান পেয়েছে।

১৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্যসংগ্রহ (ভূমিকা ও সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসু), কলিকাতা, নাভানা, ১৯৬২, পৃ ৩০৩।

১৯. Paul Claudel, ***Positions et propositions***, Paris, Gallimard, 1928, পৃ ২০৩।

২০. তদেব, পৃ ২০৫।

২১. J-P Sartre, ***La Transcendence de l'Ego***, Paris Vrin, 1978, পৃ ২৮।

২২. তদেব, পৃ ২৬।

২৩. Never in the thought of the West has the Self been so pervaded by negation. One would have to go to the East, to the Buddhist philosopher Nagarjun (circa 200 A.D) with his doctrine of ***Anatman***, the insubstantiality of the Self, to meet as awesome a list of negations as Sartre draws up.' – William Barrett, ***Irrational Man***, New York, পৃ ২৪৭।

২৪. এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Joseph P. Fell, ***Heidegger and Sartre***, Columbia University Press, 1979, পৃ ১৫২-৮৪।

২৫. Jacques Derrida, ***Marges de la Philosophie***, পৃ ১৩৮।

২৬. বেঞ্জামিন্ লি হোয়র্ফ কর্তৃক উদ্ধৃত। B. L. Whorf, প্রাগুক্ত রচনা, পৃ ১৩৪।

২৭. George Steiner, 'A new meaning of meaning', in ***The Times Literary Supplement***, Nov. 8, 1985, পৃ ১২৬২।

২৮. তদেব, পৃ ১২৭৫।

২৯. তদেব, পৃ ১২৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি

যাঁরা দেরিদা সম্পর্কে আরো বেশি জানতে চান তাঁদের জন্য নিম্নলিখিত বই-গুলো বিশেষভাবে অনুমোদনীয় :

১. Paul de Man, ***Blindness and Insight***, London, Methuen, 1983. এই বইটির সপ্তম পরিচ্ছেদ অত্যন্ত মূল্যবান :

২. Rudolph Gasche´, *The Tain of the Mirror : Derrida and the Philosophy of Reflection*, Harvard University Press, 1986.

৩. John Llewyn, *Derrida on the threshold of sense*, London, Macmillan, 1986.

৪. Christopher Norris, *Deconstruction, theory and practice*, London, Methuen, 1982.

৫. Christopher Norris, *Derrida*, London, Fontana Modern Masters Series, 1987.

৬. John Sturrock (ed.), *Structuralism and since : from Le´vi-Strauss to Derrida*, Oxford University Press, 1979.

জাক দেরিদার সদ্য প্রকাশিত (December 1987) দু'খানি বই, Psyche´ এবং De le´sprit-এর কোনো ইংরেজি অনুবাদ এখনো প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত রচনাগুলি প্রায় সবই ইংরেজি অনুবাদে লভ্য। এই অনূদিত গ্রন্থগুলির পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে ক্রিসটোফার নরিসের উপরোক্ত বই দু'টির শেষে।

অশোক মুখোপাধ্যায়

বাংলা পরিভাষা

কিছু জিজ্ঞাসা

পরিভাষা বলতে আমরা বুঝি বিশিষ্টার্থবোধক শব্দ যা বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। কিংবা বিশেষ বস্তু, বস্তুধর্ম, প্রক্রিয়া, ধারণা ইত্যাদি বোঝায়। পরিভাষার উদাহরণ – বিশেষ্য, যৌগ, জারণ, রাগ (সংগীতের), দ্বিবীজপত্রী, পাথুরি ইত্যাদি। অনেক শব্দের কেবল পারিভাষিক ব্যবহারই আছে – বিশেষ্য, মূলত্রাণ, আখর, চতুর্দশপদী, বিস্তিজাল, বকযন্ত্র, ত্রৈরাশিক। অনেক শব্দ সাধারণভাবে এক বা একাধিক অর্থে ব্যবহার হতে পারে, আবার পারিভাষিক ব্যবহার পেয়ে যেতে পারে বিশিষ্ট অর্থে। একই শব্দের এই দুই জাতীয় অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য থকেতেই পারে, কিন্তু তারা কখনোই এক নয়। 'আলাপ' কথাটার কয়েকটি অর্থ আছে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতে 'আলাপ' বিশেষ অর্থবহ পারিভাষিক শব্দ। গুণ, ভাগ, যোগ, বিয়োগ (সবই গণিতের) ; রোধ, ক্ষমতা শক্তি, কার্য (পদার্থবিজ্ঞানে) ; মুদ্রা (অর্থনীতি) ; আহ্নিক, সন্ধ্যাহ্নিক, সন্ধ্যা (উপাসনায়) ; রূপ, বিমূর্ত (শিল্প-সাহিত্যে) – এইসব শব্দের পৃথক অর্থ থাকলেও বন্ধনীবদ্ধ প্রসঙ্গগুলিতে তাদের বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও স্বীকৃত অর্থ বা দ্যোতনা আছে। পারিভাষিক শব্দের প্রতিশব্দ হয় না এবং এদের অর্থ বা মানে করতে হলে সূত্র বা সংজ্ঞা লিখতে হয়। প্রয়োজনবোধ ছবি আঁকতে হয়, কিংবা সাহায্য নিতে হয় গাণিতিক বা অন্য ধরনের সংকেতের। এক অনুচ্ছেদে দশবার লেখার দরকার হলে প্রতিবারই ঐ শব্দটিই লিখতে হবে – রচনার একঘেয়েমি কাটানোর জন্য একবার 'রোধ' অন্যবার 'বাধা' লেখা চলবে না, কারণ পদার্থবিজ্ঞানে 'রোধ' ও 'বাধা' সমার্থক নয়। সর্বনামের ব্যবহার অবশ্য করা যেতে পারে।

জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শব্দ ভাষায় আসে, ও একইভাবে আসে পরিভাষা। আমাদের ভাষাতেও এসেছে – লোকসভা, বিধানসভা, বিধায়ক, বিচ্ছিন্নতাবাদ যে অর্থে আজ আমরা ব্যবহার ক'রে থাকি, তা আগে ছিল না। কিছু লোক মিলে সভা করলেই তা লোকসভা হবে না, আর জনসভা ও লোকসভা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস বোঝায়। লোকসভা পারিভাষিক শব্দ, জনসভা নয়। গ্রামের লোকে সভা ক'রে 'কাল থেকে তোমার ধোপা নাপিত বন্ধ' এই বিধান দিলেও –

সে সভা বিধানসভা নয়। এতকাল ছিল যিনি বিধান দেন তিনিই বিধায়ক –অর্থটি আজও আছে, কিন্তু বিধায়ক-এর আজ একটি নতুন অর্থ হয়েছে– বিধানসভার সদস্য। এর থেকে কংগ্রেসি বিধায়ক, সিপিএম বিধায়ক, নির্দলীয় বিধায়ক। এখানে নির্দলীয় শব্দটির ব্যবহারও পারিভাষিক অর্থে–কিছুদিন আগেও যাকে বলা হত 'স্বতন্ত্র'। কিন্তু ওই নামে একটি রাজনৈতিক দল এসে যাওয়ায় নির্দলীয় শব্দটি এসে গেল গোলমাল এড়াতে।

বাংলা ভাষায় নাকি জ্ঞানচর্চা করা খুবই দুঃসাধ্য – কারণ বাংলায় পরিভাষা নেই। কথাটা নেহাত অর্বাচীন নয়, গত এক দেড়শো বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে। এই অভিমত আংশিক সত্য এবং বড় অংশটাই অসত্য। বাংলায় পরিভাষা নেই কথাটা ঠিক নয়। ব্যাপারটা হল, যে দেশে যে বিদ্যার চর্চা হয়েছে, যে জিনিস আছে তার প্রকৃতি, পরিবেশ, সামাজিক আচার-আচরণে, ধর্মে, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, সে দেশের ভাষায় তার জন্য শব্দ পাওয়া যায়–তা সে সাধারণ শব্দই হোক আর পারিভাষিকই হোক। এটা আমাদের দেশ ও আমাদের ভাষা বাংলা সম্বন্ধেও বলা চলে। বাংলা শব্দ সম্ভারের মধ্যে আমাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকে ধরে রাখা যাবে নিঃসন্দেহে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে আমাদের সংগীত বিষয়ক কিছু পরিভাষা নেওয়া যেতে পারে। তান, লয়, মীড়, পকড়, আলাপ, গৎ, জোড়, ঝালা, রাগ, তেহাই, তাল, সবই তো প্রকাশ করা যায় সহজেই। অন্যদিকে কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকার ইংরেজি করা যায় না সহজে। 'নায়িকা'রও কি ইংরেজি হয়? গুরু-শব্দটা তো এক বিখ্যাত উদাহরণ এই প্রসঙ্গে। আয়ুর্বেদ, প্রতিপদ, দ্বাদশী, নবমী, ত্র্যহস্পর্শ, মলমাস, লগ্ন, স্নান-যাত্রা, সমিধ, আহুতি, অঞ্জলি-র কি স্বাভাবিক সহজ ইংরেজি আছে? কিংবা ছাঁদনাতলা, শুভদৃষ্টি, ফুলশয্যা, গায়েহলুদ? এরা সবাই তো পরিভাষা। বিছানায় দু'টো ফুল রেখে ঘুম লাগালে কি আর ফুলশয্যা হল? গায়ে হলুদ মাখলেই কি হবে গায়েহলুদ? এই সব আমাদের দেশে আছে–তাই আছে জুতসই বাংলা শব্দ। আবার আগে ছিল না, পরে হয়েছে, এমন জিনিসের জন্যও দরকারি শব্দ হাজারে হাজারে আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঢুকেছে – তাদের আর বিদেশী বলে চেনা যায় না। মুসলমান শাসনের আমলে রাজকার্য, বিচার ব্যবস্থার জন্য প্রচুর শব্দ এসেছে – মোকদ্দমা, উকিল, সমন, জেরা, খারিজ, দরবার, দেওয়ান ইত্যাদি। এগুলো যে বাংলা নয়, তা জানতে বাঙালি ছেলেমেয়েদের বিশেষভাবে শিখতে হয়–না জানলেও ক্ষতি নেই কিছু। মুসলমান ওস্তাদরাও ভারতীয় সংগীতে অনেক জিনিস যোগ করেছেন – সেই সঙ্গে ভাষাতেও – বন্দিশ, সেতার, দিলরুবা, মিরজাব, জমজমা। তাই আমাদের ধ্যান-ধারণা, জিনিসপত্র, পশুপাখি, গান-বাজনা, সাহিত্য, কৃষিকর্ম সব কিছুর জন্যই বাংলা শব্দ আছে–হতে পারে তার উৎস সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ফরাসি, পোর্তুগিজ, ইংরেজি। সত্যিই ক্ষতি হয়

নি কিছু এতে।

আবার এটার পরিভাষা নেই, ওটাকে লেখা যায় না বাংলায় – এই রকম হৈ-হল্লারও কারণ আছে। বিদেশ থেকে আমদানি করা ভাবনা, জিনিসপত্র, বিদ্যা, জীবনযাপনের পদ্ধতি, এবং এখন যাকে বলে 'নো হাউ' – এসব নিয়ে বলতে লিখতে গেলে আমাদের ভাষায় অসুবিধে হয়। হয়ত বা কিছু শব্দকে আমরা অনুবাদ ক'রে নিতে পেরেছি – অনেকগুলোকেই পারি নি। না-পারাগুলোর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। বিদেশে জ্ঞানচর্চার শাখা-প্রশাখা বাড়ছে, বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে। সেখানে পরিভাষাও তৈরি হচ্ছে অবিরত। রাশি রাশি বই, পত্র-পত্রিকা, যন্ত্রপাতি আসছে। একই সঙ্গে স্ফীত হচ্ছে আমাদের পরিভাষার সমস্যা।

আমরা যতই স্বদেশী, দেশীয় বলে গানটান গাই না কেন, আমাদের এখনকার জীবনযাত্রার প্রণালী, স্কুলে কলেজে যা লেখাপড়া করি, সবই বিদেশী। গ্রামের বহুলোকের জীবনযাপন প্রণালীতে হয়ত বিদেশী প্রভাব ততটা পড়ে নি, যতটা হয়েছে শহরে, কিন্তু তাদের ওপর প্রভাবটা বাড়ছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে সবই বিদেশের জিনিস। তবে এ প্রসঙ্গটায় পরে আসা যাবে।

পাকাবাড়ি বলতে যা বোঝায় তা এদেশে ছিল না – তাই কেবলমাত্র পাকা বাড়ির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এমন শব্দ আমাদের ভাষায়ও ছিল না। কাঁচা বাড়িতে লাগে, কিংবা কাঁচা-পাকা দু'রকম বাড়ির জন্যই দরকার এমন শব্দ কিন্তু আমাদের আছে। ছাদ, সিঁড়ি, চাল, দোচালা, চারচালা, মটকা, মুদনি, থাম, বেড়া, ছাউনি সবই পাই। পাওয়া যায় না শিক (ফার্সি), সিমেণ্ট ('বিলিতি মাটি' নিশ্চয়ই মান্য শব্দ নয়), লিণ্টেল, কংক্রিট, জানালা (পোর্তুগিজ), সিলিং, রেলিং। পাই না ঘরের মধ্যের চেয়ার, টেবিল, সোফা, ডিভান, ড্রয়ার, আলমারি। পাই না স্নানঘর (নেহাতই আক্ষরিক অনুবাদ – ক্ষতি নেই কিছু তাতে) এবং পাইপ, বেসিন, সিংক, প্যান, কমোড, সিসটার্ন। দেশী শব্দে পাই না বিছানা, বালিশ, চাদর, গদি। কেনই বা শয্যা, উপাধান ছেড়ে বিছানা, বালিশে অভ্যস্ত হওয়া গেল, তার উত্তর পাওয়া মুশকিল। আমাদের পরনে প্যাণ্ট, শার্ট, ব্লাউজ, শায়া, শেমিজ, জুতো, মোজা, কোট, সোয়েটার। সঙ্গে মানিব্যাগ, হাতব্যাগ। দেশী ধুতি, শাড়ি অবশ্যই আছে। (ধুতির ব্যবহার অবশ্য কমে এসেছে, শাড়ির দিনও বোধহয় শেষ হয়ে এল)। রান্নাঘরের বাসনপত্র, থালা, বাটি, হাতা, খুন্তি, বেড়ি, উনুন সবই আমাদের। কিন্তু কাপ, প্লেট, ডিশ, সসপ্যান, জগ (জাগ), ফ্রিজ, কুকার, গ্যাসলাইটার বিদেশী। ভাবতে অবাকই লাগে ঘরের মধ্যেই কী পরিমাণ বিদেশী ব্যাপারের অবস্থান। কিন্তু এ নিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ো কারো ভাষা সমস্যা হয়েছে বলে শোনা যায় নি। বিদেশী শব্দগুলোও স্বরূপে বা ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে মিশে গেছে আমাদের ভাষা-দেহে। পণ্ডিতেরা

এর নাম দিয়েছেন 'লোন ওয়ার্ডস'। 'লোন' কেন জানি না, যখন শোধ করার দরকার নেই – 'গিফ্‌ট-ওয়ার্ডই' বা আপত্তি কি ?

আবার স্কুলে কলেজে (শব্দ দু'টিকে মনেই হয় না বিদেশী বলে) যা হয় তার সবটারই ভিত্তি বিদেশে। ওদের শব্দগুলি তাই অনুবাদ ক'রে নেওয়ার দায় থেকে যায় প্রতি পদে। কেমিস্ট্রি কিমিয়াবিদ্যা থেকে শুরু ক'রে এখন রসায়ন হয়েছে। তবে সুস্থিত হয় নি এখনো। রসায়নবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, রসায়নবিজ্ঞান সবই চলছে, যদিও উত্তরপদটি একরকম হলেই ভালো হতো। ফিজিক্সও তাই – পদার্থবিদ্যা, -বিজ্ঞান। জিওলজি – ভূবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা। ইক্‌নোমিক্স – অর্থনীতি, -শাস্ত্র, - বিদ্যা,-তত্ত্ব,-বিজ্ঞান। এইরকম ভাষাবিজ্ঞান,-তত্ত্ব,-শাস্ত্র,-বিদ্যা। অর্থাৎ মূল বিষয়ের নামকরণেই বিজ্ঞান, তত্ত্ব, শাস্ত্র, বিদ্যা, নীতি, সূত্র প্রভৃতি কোনটা কোথায় লাগাব, তাই স্থিরীকৃত নয়। কিন্তু যে শাস্ত্রের চর্চা এ দেশে আগে থেকেই হয়ে আসছিল, সেখানে এ বিভ্রান্তি নেই। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের সংখ্যাও কম নয়। এই সব বিদ্যার যে অংশ ভারতেই উদ্ভাবিত বা চর্চিত হয়েছে সেখানেও নেই পরিভাষার সমস্যা। সংকটের শুরু হয়েছে যখন বিদেশী ধ্যান-ধারণা বা বস্তুর বিদেশী নামের পরিবর্তন আমরা ঘটাতে চাইলাম তখন থেকে। আমদানি করা জ্ঞানবিজ্ঞান মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখানো পড়ানো বা চর্চা করার প্রয়োজন হল একটা সময়। উদ্দেশ্য মহৎ – দেশের সাধারণ মানুষ আধুনিক ও বিদেশী ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন, হয়ত সমৃদ্ধতর হবে বাংলা ভাষা, তার ভাণ্ডারের সঞ্চিত রতন বাড়বে। ইতিমধ্যে যে সব আরবি, ফারসি, পোর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজি, জার্মান কিংবা এদেশেরই অন্য ভাষার শব্দ আমাদের ভাষা-শরীরে ঢুকে গেছে – তাদের নিয়ে বিশেষ কোনো আপত্তি রইল না। অপেক্ষাকৃত নতুন শব্দের অনুবাদের চেষ্টা হতে লাগল, যাকে বলে কিনা পরিভাষা তৈরি। সে চেষ্টায় বা কর্মকাণ্ডের শেষ আজও হয় নি, বোধ করি হওয়ারও নয়।

বাংলা সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পরিভাষা নিয়ে ভাবেন নি এমন মানুষ পাওয়া দুঃসাধ্য। তাঁরা চেষ্টাও করেছেন সাধ্যমতো। কিন্তু গত শ'খানেক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে যে কর্মকাণ্ডটি চলছে, যার সঙ্গে সামিল হয়েছেন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা, সেই বাংলা পরিভাষার কেমন অবস্থা আজ ? কিন্তু তার আগে বিবেচনা করা যাক অন্য কয়েকটি প্রসঙ্গ।

যে জিনিস আমাদের দেশে ছিল না, বিদেশ থেকে বিদেশী নাম নিয়েই এদেশে এসেছে, কিন্তু পরে তার বাংলা অনুবাদ অথবা শব্দটির কোনো রূপান্তরিত রূপই এদেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে এমন তিনটি উদাহরণ নেওয়া যাক – ১. (ঘড়ির) কাঁটা ; ২. দমকল ; ৩. হাসপাতাল। কাঁটাওয়ালা ঘড়ি এদেশে ছিল না। ইংরেজিতে ঘড়ির কাঁটাকে বলা হয় 'হ্যাণ্ড'। কিন্তু কবে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি এর

নামকরণ করলেন কাঁটা। এর থেকে পাওয়া গেল একটি চমৎকার বিশেষণ/ক্রিয়া-বিশেষণ কাঁটায় কাঁটায়। ইংরেজরা ঘড়ির কাঁটাকে যেভাবে দেখেছেন, এদেশের লোক সে ভাবে না দেখে 'হাত'কে 'কাঁটা' বানিয়ে দিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইংরেজি ও সংস্কৃত জানা লোক সভাসমিতি, সেমিনার বা কমিটি ক'রে পরিভাষা প্রণয়ন করতে গেলে, ইংরেজি 'হ্যাণ্ড'-এর অনুষঙ্গ থেকে বেরোতে পারতেন না— এবং ওটি 'ভুজ' কিংবা 'বাহু' হয়ে আমাদের যন্ত্রণা দিত। 'ফায়ার ইঞ্জিন'-কেও কোনো অনামা অজানা লোক ক'রে গেছেন 'দমকল'। মনে হয় তোড়ে জল আসে যে কল (হিন্দি) থেকে, তার নিশ্চয়ই 'দম' (ফারসি) থাকবে বিস্তর—এই চিন্তা থেকেই 'দমকল' শব্দটি তৈরি। এর থেকে হয়েছে দমকল বাহিনী— ফায়ার বিগ্রেড। কোনো অসুবিধে হয় না এতে। বরং 'অগ্নিনির্বাপক বাহিনী'র থেকে 'দমকল বাহিনী' শুনতে অনেক বেশি বাংলা বাংলা লাগে। 'দমকল' একটি স্বাভাবিক পরিভাষার উদাহরণ, এতে আগুন কথাটা আসেই নি, যদিও ইংরেজিতে তা আছে। বলা বাহুল্য, কোনো পরিভাষা কমিটিই এভাবে চিন্তা করতে পারতেন না, এবং 'ফায়ার ইঞ্জিন' 'অগ্নিযান' গোছের কিছু একটা হতো তাঁদের হাতে। 'হসপিটাল'-এর পরিবর্তিত রূপ 'হাসপাতাল' বাংলা ভাষার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলা উচ্চারণ অনেক কিছুকেই সহজ ক'রে নেয়, কোনাকে গোল ক'রে ফেলে। বংশী হয় বাঁশি, পক্ষী থেকে পাখি, কর্ণ কান ইত্যাদি। সে প্রবণতাই হসপিটালকে বানায় হাসপাতাল, যা কিনা একেবারেই বাংলা শব্দ। শিক্ষিত বাঙালিরা, যারা ইংরেজিতে ভুল হলে লজ্জায় অধোবদন হন ও বাংলাটা 'খুবই আনসায়েন্টিফিক' বলে ভুল ক'রে গর্ব প্রকাশ করেন, তাঁরাও অন্তত হাসপাতাল, টেবিল, গেলাস, টিকিট বলার সময় ভুলভাবে ইংরেজি বলা হচ্ছে বলে মনে করেন না। এগুলো অনেকদিন আগেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে - আর জন্ম থেকেই কথাগুলো সবাই শুনে আসছেন। 'হসপিটাল' যখন হাসপাতালে পরিবর্তিত হচ্ছিল, তখন অবস্থাটা কেমন ছিল জানি না। প্রশ্নটা ওঠার কারণ 'জ্যাম' শব্দটির এইরকম একটা পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে—জাম। কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা যাঁরা হাসপাতাল, টেবিল বলেন, তাঁরা কিন্তু 'জাম' শব্দ-টাকে মানতে পারছেন না—জ্যামই বলতে চান। আর কোনো ইংরেজি শব্দ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কি কমে যাচ্ছে? যাদের শব্দ তাদের মতো করেই বলতে হবে, এ দায়টা কি আমরা ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছি? পারা গেলে দোষের নেই কিছু। তবে এখানে দু'টো শ্রেণী আবার হয়ে যাবে— যাঁরা 'জাম' বলবেন এবং দরকার লিখবেনও, আর যাঁরা 'জাম' এমনকি 'জাম্প'ও বলবেন ও সম্ভবত লিখবেন না, কারণ তাঁদের লেখার প্রয়োজন হয় না। রাস্তার 'বাম্প'-কে তাঁরা 'বাম্পার' এমনকি 'বাম্পেট', কিংবা 'বাম'-ও বলেন। ব্রেক-কে বলেন 'বেরেক', প্লেনকে 'পেলেন', প্লাগকে 'পেলাগ'—বলেন জীবিকার দায়ে।

আবার এঁদেরই মুখে হরদমই শোনা যায় 'টাইম, সাইজ, পিস', কিন্তু 'টেরাফিক, পেলাটফর্ম, বেলাকে কেনা'।

আমরা বেরেক, পেলেন প্রভৃতি শব্দ লিখছি বা বলছি এটা ভাবা যায় না, যদিও বাংলা উচ্চারণরীতিতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। পরান (প্রাণ,) ছিরি শ্রী – বিচ্ছিরি, বাঘ (ব্যাঘ্র), শিং (শৃঙ্গ), শাঁখ (শঙ্খ) – এই রকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। প্রাণ কেমন ক'রে পরান হল, ব্যাঘ্র কোন রীতিতে হল বাঘ, তার যুক্তি বা ব্যাখ্যা ভাষাতাত্ত্বিকরা দিয়েছেন। এই রূপান্তর যদি বাংলার স্বাভাবিক ঝোঁক হয় তবে তা আজও আছে নিশ্চয়ই। কান্দী-কে কাঁদি, বাঁশদ্রোণী-কে বাঁশধানি বলা হয় বাংলাতে। তাই 'বেরেক' বা 'পেলেন' নেহাতই অশিক্ষিতের উচ্চারণ এ কথা বলা চলে না কোনোমতেই। ব্যাঘ্র হল বাঘ, বম্ব থেকে এল বোমা, ব্রাশ থেকে বুরুশ, জাজকে জজ বানালাম, ম্যাসট্রোকে মাস্তুল, ভাণ্ডারকে ভাঁড়ার – তাহলে আপত্তি কেন 'বেরেকে'? বাংলা ভাষায় যে কারণে রাজ্ঞী হয়েছেন রানী, পক্ষী হয়েছে পাখি, সে প্রবণতা কি শেষ হয়ে গেছে? আগে যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন আর হবে না, অন্তত মান্যভাষায় নয় – এটাই কি ধরে নিতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর জটিল। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে বিদেশী শব্দ এখন যা আসছে তাকে বাংলার মতো ক'রে রূপান্তরিত ক'রে নেওয়া আর সমকালে হচ্ছে না। আজকের পরিভাষা প্রণয়নেও বিদেশী শব্দকে পরিবর্তিত ক'রে নেওয়া আর হচ্ছে না।

আবার অন্যদিকে আজ বাঙালি শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনা ইংরেজি ও বাংলা মিশিয়ে তৈরি হয়। তাঁরা হয়ত বিশুদ্ধ ইংরেজিতে ভাবেন না, কিন্তু ভাবনাটার মধ্যে কিছু ইংরেজি শব্দ থেকেই যায়। ভাবনাটা যেভাবে আসে তা কয়েকটি উদাহরণে দেখানো যায়। 'অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই রোগীর স্টেডি প্রগ্রেস হতে লাগল'। কিংবা, 'এখানে অ্যাকিউরেসিটাই বেশি ইম্‌পরট্যান্ট – অ্যাপ্রক্সিমেশন-এর কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' লিখতে যাচ্ছি বালায়, কিন্তু ভাবনাটা তৈরি হচ্ছে এইভাবেই – বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে। এরপর বাংলায় লেখা খুবই কঠিন। অ্যান্টিবায়োটিক না হয় রাখা গেল যেমন আছে তেমন, কিন্তু মুশকিল হয়ে যায় 'স্টেডি' কথাটা নিয়ে। ওটার বাংলা এক কথায় হয় না। ভাবনাটা যদি প্রথম থেকেই বাংলায় হতো তাহলে – 'অব্যাহতভাবে অবস্থার উন্নতি হতে লাগল', কিংবা 'রোগীর অবস্থার উন্নতি অব্যাহত রইল' ইত্যাদি অনেকভাবেই বলা চলত। কিন্তু ভাবনায় এসে গেছে 'স্টেডি প্রগ্রেস', তার যে 'প্রিসিশন ও ব্রিভিটি' তা বাংলা রচনায় রাখতে গেলে অসুবিধেতে পড়েন লেখক। পাঠক অবশ্যই লেখকের মনোভাব জানেন না – তাঁর একমাত্র দাবি বোঝার। কিন্তু লেখকের খুঁতখুঁতি দূর হওয়ার নয়। 'কনটেন্ট' তো ঠিকই আছে কিন্তু 'ফর্মে'র দিকটাও তো অবহেলার নয়। ঠিক

এই সমস্যাই আসে 'অ্যাকিউরেসি' শব্দটাতেও, কিংবা এ লেখাতেই ব্যবহৃত 'ব্রিভিটি' অথবা 'প্রিসিশন' শব্দ দু'টির ক্ষেত্রে। সাধারণ কথাবার্তায় আমরা এই জাতীয় শব্দ হরদমই বলে থাকি ইংরেজিতে। এবং সেটা বক্তা ও শ্রোতা দু'জনেই বোঝেন, আদান-প্রদানটা অনেক ভালো হয়। ভেবে দেখার বিষয়, 'স্টেডি' 'অ্যাকিউরেসি', এর কোনোটিই পরিভাষা নয় ও শব্দগুলি দিয়ে প্রকাশিত ভাব-গুলি যে বঙ্গভাষায় নেই, তাও নয়। 'স্টেডি প্রগ্রেস'কে ক্রমোন্নতি, উত্তরোত্তর উন্নতি বলা চলে। 'অ্যাকিউরেসি, 'অ্যাকিউরেট'-এর ব্যাপারটা একটু গোলমেলে —সূক্ষ্ম, ঠিক ঠিক, যথাযথ, একটুও হেরফের হবে না—প্রসঙ্গানুসারে নানান-ভাবে বলা যায়। ফর্ম ও কনটেন্ট-কে একটু ঘুরিয়ে কেমনভাবে বলতে চাই ও কী বলতে চাই এরকম ভেঙে বলার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ইংরেজি শব্দগুলোর মধ্যে যে ধরনের ভাব প্রকাশিত হচ্ছে ও যেভাবে হচ্ছে, তা বাংলাতে আসছে না। অথচ লেখক ভেবে বসে আছেন ইংরেজিতে—তাঁর ভাবনার ঐ অংশটা ইংরেজিতেই ভেবেছেন এবং সেটাই তাঁর অভ্যাস।

উল্টোটাও সমান সত্যি। অনেক বাংলা শব্দের ইংরেজি হয় না, বা হলেও ঠিক ঠিক হয় না। অভিমান, গুরু, আড্ডা ইত্যাদি উদাহরণ তো সবার জানা। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'স্বপ্নপ্রয়াণ', 'ডাগর', 'ডবকা', 'কেষ্টা ব্যাটাই চোর'-এর 'ব্যাটা'—এসবের ইংরেজি করা বেশ কঠিন। শব্দগুলি কিন্তু পারিভাষিক নয়। বাংলা পারিভাষিক শব্দের অনেক কিছুরই ইংরেজি অনুষঙ্গ নেই—তাদের অনুবাদও অসম্ভব : ত্রিভঙ্গ, রস, পটুয়া ইত্যাদি। আবার এঁটো, বাঁয়া, বৈরাগী, মাথার কাপড়-এর মধ্যেকার ভাব এতই বাঙালি যে অন্যভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। ধর্মীয় শব্দ বা এদেশের ফুলফল লতার নাম আনাই হচ্ছে না। এইরকম হাটুরে, দুলকি চাল, তামার টাট, চাঁদের কণা, বহুড়ি, মাথায় পুঁটে, দুধের চাঁছি, কণ্ঠি বাঁধা, ফ্যানসা ভাত (সবই 'পালকির গান' থেকে নেওয়া) এসবেরও ইংরেজি হয় না সরাসরি। সমস্যাটা উভয়ত। কিন্তু প্রচারটা এমনই, যেন আমাদের ভাষাটাই দীন হীন—ওতে কিছুই করা যায় না। সমস্যাটা অন্য জায়গায়—সাহেবদের জিনিস না জানলে আমরা যেন মূর্খ থেকে যাই, আমাদের জিনিস না জানলে সাহেবরা মূর্খ থাকে না। সাহেবদের ধ্যান-ধারণায় আমরা চলি, তাদের বিজ্ঞান পড়ি, তাদের তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি—এটাই মূল সমস্যা।

পরিভাষা প্রণয়ন বলতে আমরা সেই ঘটনাটা বুঝব, যেখানে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে ইংরেজি (প্রধানত) ও অন্য বিদেশী শব্দ আছে তার বাংলা (অথবা সংস্কৃত) করা, কিংবা বাংলায় গ্রহণীয় রূপ দেওয়া। এ কাজ অনেকদিন ধরেই চলছে তা আগেই বলা হয়েছে। বহু প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ এ কাজ করেছেন কিন্তু সমস্যা মেটে নি, ইদানীং বরং আরো বেড়েছে।

বিস্তৃততর হয়েছে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র—নতুন নতুন আবিষ্কার বা ধ্যান-ধারণার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শব্দ এসেছে অনেক, ফলে বিপাকে পড়েছি আমরা। অটোমেশন, ফিড ব্যাক, ভেক্‌টর গ্র্যাফিক্‌স, ফটো পলিমার, ডিকন্‌স্ট্রাক্‌শন, প্যারাডাইম, লজিকগেট—এসবের বাংলা কী হতে পারে তা নিয়ে আগে মাথা ঘামাতে হয় নি—আজ হচ্ছে।

এতাবৎকালের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় কিছু কাজ যে হয় নি তা নয়। মাস. ক্রস সেকশন, পোটেনশিয়াল-এর জায়গায় ভর, প্রস্থচ্ছেদ, বিভব-এর ব্যবহারে স্কুলের ছাত্ররা অনেকেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবে এরকম দৃষ্টান্ত বেশি দেওয়া যাবে না। নির্বাহী বাস্তুকার, আরক্ষা বাহিনী, আধিকারিক, অধিসূচনা. সামরিক প্রাক্‌কলন, আদিম ক্ষেত্রাধিকার, সমযোজন মস্ত্রক, কুর্মাণ্ডক, হৃদ্ধরা ঝিল্লি, অভিস্ফোট, বীজোপাঙ্গ, পিষ্টি, অচূড়পক্ষল প্রভৃতি হাজার হাজার পরিভাষা বাঙালি নেয় নি। যদিও এই পরিভাষা যাঁরা বানিয়েছেন তাঁদের প্রতি বাঙালি মাত্রেই শ্রদ্ধাশীল। তাই যখন দেখি ভর, প্রস্থচ্ছেদ, উপাচার্য, উচ্চ-ফলনশীল, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারে এসে গেছে, অথচ অন্য অনেকগুলোই আসে নি, তখন নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে গোলমালটা কোথায়।

প্রথমেই মনে হয়, বাংলায় যে প্রবণতায় বংশী বাঁশি হয়ে যায়, অর্থাৎ একটু গোলগাল ক'রে নেওয়ার যে ঝোঁক আছে, তাকে কোনো মর্যাদা দেওয়া হয় নি. পরিভাষা তৈরির সময়। সংস্কৃত শব্দেরই প্রাধান্য পরিভাষায়, যা নাকি আমাদের ভাষারীতি, বিশেষ ক'রে মুখের ভাষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয়ত, ভারি ভারি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে আমাদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির একটা অনুষঙ্গ আছে। ব্যঙ্গাত্মক রচনাতে, বিশেষ ক'রে পাণ্ডিত্যের ভানকারী অপণ্ডিতের বা ভণ্ডদের কথায় বার্তায় অনেক বড় শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়। এটা কেন হয়েছে জানি না, কিন্তু হয়েছে। তাই ভারি শব্দ মানুষের মনে একটা প্রতিকূল প্রতি-ক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে থাকতে পারে। কোনো অনভিপ্রেত কাজ ক'রে ছেলে বাড়ি এলে, স্বামী-স্ত্রীর মুখে শোনা যায় 'ওই যে তোমার সুপুত্র এলেন'। কেউ দেরি ক'রে এলে বলা হয়, 'এই যে এতক্ষণে আগমন হল'। বাগাড়ম্বর, যা কিনা ভালো জিনিস নয়, বলতেই বোঝায় বেশ কিছু সংস্কৃত শব্দ। 'এই যে সাগরের ফেনিল লবণাম্বুরাশি নীলাম্বর অভিমুখে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবোৎসাহে দিকদিগন্ত ধ্বনিত ঝংকৃত করিয়া…'। তাই অধীক্ষক, যানবাহন শুনলে কেমন যেন লাগে।

তৃতীয়ত, যে এবং যাঁদের মধ্যে আদান-প্রদানে পারিভাষিক শব্দ লাগে তাঁরা সবাই ইংরেজি বোঝেন, এবং ঐ সব শব্দসংক্রান্ত তাঁদের প্রাথমিক ধারণাটা ইংরেজিতেই হয়ে আছে। এক্ষেত্রে বরং বাংলাটাই তাদের কাছে 'বিদেশী শব্দ'। দু'জন চিত্রশিল্পী অর্থাৎ কিনা পেইন্টার কথা বললে, বলবেন, 'কম্পোজিশনটা একটু আনব্যালান্সড, কিন্তু ক্যানভাসের ওপর তুলির স্ট্রোকস বেশ ভালো।'

কিংবা, 'কোনো সিম্পলি সাপোর্টেট বিমে কনসেন্ট্রেটেড লোড দিলে, তার বেণ্ডিং মোমেণ্ট বার করা খুব কঠিন নয়'। অথবা, 'প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ব্যাংকে রাখলে এগারো পার্সেণ্ট পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায়'। বর্তমানে সব শিক্ষক তাঁদের 'পে-স্কেলে'র অপেক্ষায় আছেন, কেউ-ই 'বেতনক্রমের' অপেক্ষায় নেই। এই মিশ্রিত ভাষাটাই এখন মুখের ভাষা হয়ে গেছে। এই বিষয়টা সামান্য বিশদ করা যেতে পারে। অধুনা অনেক বাঙালি শিশুর হাতেখড়ি হয় ইংরেজিতে। তারা রং চেনে রেড, ব্লু, গ্রিন, পিংক নামে। পরে যদি লাল, নীল, সবুজ, গোলাপি শেখে—তবে তা বোঝে ওই রেড, ব্লু, গ্রিন-এর মাধ্যমে। আমরাও মিলিটারি, নিব, বেল্ট ইংরেজিতেই শিখেছি, এবং তখন অবশ্য জানতামই যে শব্দগুলো ইংরেজি। বাংলায় শিখলাম যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, সাংকেতিক, কিন্তু ম্যাট্রিকস, ক্যালকুলাস ইংরেজিতে। এই শব্দগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ বিশেষ কোনো কাজে লাগে না, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মিশ্রভাষার ব্যবহারটাই প্রচলিত হয়ে গেছে। ওসব বিষয়ে বাংলায় প্রবন্ধ লিখতে গেলেই পরিভাষার খোঁজ পড়ে, বলতে গেলে নয়। ওদিকে আমাদের কলেজি শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি —কিছু ব্যতিক্রম আছে। ভালো ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতেই পড়ে। পরিভাষা নেই বলে বাংলায় পড়ানো যাচ্ছে না এটা ধরে থাকলে কোনোদিনই হবে না। বাংলায় পড়ানো আরম্ভ ক'রে দিলে প্রয়োজনের চাপে পরিভাষা তৈরি হয়ে যাবে ঠিকই। ততদিন বাংলা হরফে চলতে পারে ইংরেজিটা বা অন্য বিদেশী শব্দাবলি। যেমন চলছে জানালা, খিলান, আপিল, বই, খাতা, পেনসিল, স্কুল, বাস, সুইচ, বালিশ, মোজা, টুপি, গামলা ইত্যাদি শত সহস্র শব্দ।

তবে যতই 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' বলে চিৎকার, সভা, শোভাযাত্রা, সেমিনার হোক, এ সত্যকে বাস্তবায়িত করা আমাদের দেশে যাবে না। অন্তত এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে এবং ঘটছে তা দেখে এই কথা মনে হচ্ছে। বাংলা তথা অন্য যে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় লেখাপড়া করার বিষয়টা ক্রমশই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশটা আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির পক্ষে অনুকূল নয়। দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর হওয়ায়, এমনকি ভারতের মধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে আদান-প্রদান বেড়ে যাওয়াতে, হয়ত অনেক কিছুই ভালো হয়েছে—মার খাচ্ছে আঞ্চলিক ভাষাগুলি। হিন্দি ও ইংরেজিরই কদর বেশি—বাঙালিদের মধ্যে হিন্দি লেখা ও শেখার প্রবণতা কম —তাই আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে ইংরেজিকে। 'স্পোকেন ইংলিশ' শেখার ক্লাসে ভর্তি হওয়ার ফর্ম নেওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সামনে যে লাইন হয়, তার দৈর্ঘ্য প্রতি বছর বাড়ছে। স্পষ্ট, পরিষ্কার ও শুদ্ধ বাংলাই কেবল বলতে পারলে দূরদর্শন নামক সর্বভারতীয় সমাজবিরোধী প্রতিষ্ঠানের কলকাতা কেন্দ্রেরও ঘোষক-ঘোষিকার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা

নেই, ইংরেজি বলতে ও জানতে হবে—কারণ ইংরেজি অনুষ্ঠানের ঘোষণা তো ইংরেজিতেই করতে হবে! আবারও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চতর শিক্ষা বাংলায় করার কথায় আসি। আগেই বলা হয়েছে এ হলে পরিভাষাও নিজের পথ ক'রে নেবে—প্রয়োজনের ধর্মই তাই। কিন্তু বাংলা মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্র পাওয়া যাবে তো? নিয়ম তো চালুই হয়ে গেছে, যে গবেষণাবৃত্তি পেতে গেলে সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় বসতে হবে। সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলো তো আর বাংলা, তামিল, তেলুগু, গুজরাতি-তে হয় না—হিন্দি বা ইংরেজিতে হয়। আই এ এস, আই পি এস, আই এফ এস, আই আর এস কি আর বাংলায় হবে? এর পর নাকি কলেজে চাকরি পেতে গেলেও সর্বভারতীয় পরীক্ষা দিতে হবে। যুবমানসে এ ধারণা ক্রমশই বদ্ধমূল হচ্ছে যে বাংলায় লেখাপড়া করলে ঠকতে হয়—রামকৃষ্ণ মিশনের লাইনে দাঁড়ানো যুবক-যুবতীদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। তাঁরা কেউ 'দাস-মনোবৃত্তি' 'কলোনিয়াল রেসিডিউয়র ব্যাকলাস' বা 'সাহেব দেখলেই পা চাটতে ইচ্ছে করে' এই মনোভাব থেকে ঐ লাইনে ভিড় করেন নি, নেহাতই জীবিকার দায়ে দাঁড়িয়েছেন। ওদেরই চোখের সামনে দিয়ে অনেকেই ইংরেজিতে লেখাপড়া ক'রে ত'রে গেছে জীবনে। ঠিক এই পরিবেশেই আমরা বাংলা পরিভাষা সংকলন ক'রে চলেছি, যার নমুনা 'ফুলব্লাড'-এর বাংলা করা হল পূর্ণরক্ত-সম্বন্ধ', কিংবা 'সমান পিতৃমাতৃক'; গ্র্যাণ্ড টোটাল 'মহাসমষ্টি'; সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন—'জনপালককৃত্যক প্রনিয়ম'।

ফিরে আসা যাক পূর্ব প্রসঙ্গে। প্রস্থচ্ছেদ, বিভব, ভর, অববাহিকা, ভঙ্গিল পর্বত প্রভৃতি শব্দ স্কুলের ছাত্ররা ব্যবহার করছে। ভারি শব্দ মাত্রই যে পরিত্যক্ত হবে তা বলা এখন আর যায় না। এটা দেখা গেছে যে এতাবৎ যে সব পরিভাষা চালানোর চেষ্টা হয়েছে—তার কিছু চলেছে এবং অন্য অনেক চলে নি। যে চলল সে কেন চলল—এ সমীক্ষাটা ক'রে দেখা হয় নি, কিন্তু এটা হওয়া প্রয়োজন। অনুমান করা হয়তো অসংগত হবে না যে জানা শব্দের সাদৃশ্য বা তাদের ব্যবহার পরিভাষাটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। প্রস্থ ও ছেদ দু'টো শব্দই স্কুলের ছেলেরা জানে। আবার ভর ও বিভব শব্দদু'টো সহজ শব্দ—যা চট করেই খাপ খায় আমাদের ভাষার সঙ্গে। আরো অনেক জিনিস ভাবা দরকার। বাঙালিরা কেন 'গবাক্ষ' ছেড়ে পোর্তুগিজ-ভাঙা 'জানালা' শব্দটা নিয়ে নিল—তারও কি কোনো ব্যাখ্যা মেলে? 'সংবাদ' কবে থেকে হল 'খবর'? কেনই বা 'হরতাল', 'ধর্মঘট' গত কয়েক বছরে 'বন্‌ধ'-এ পরিণত হল, যে পরিণতি সর্বাত্মক। খবরের কাগজে প্রতিদিনই বেতার, বিমানবন্দর শব্দ'দুটো দেখা সত্ত্বেও কেন মুখের ভাষায় তারা আজও রয়ে গেছে 'রেডিও' ও 'এয়ারপোর্ট'? (এই কথাটা আগে অবশ্য 'এরো-ড্রোম' ছিল)। কেনই বা ঢাকা শহর বিষয়ে সেই গল্পটি চালু হয়, যেখানে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বললে রিক্সাওয়ালা বোঝে না, শেষে 'ইউনিভারসিটি' বলার পর

উত্তর করে 'তাই কন কর্তা, ইংরাজি কন ক্যান বিশ্ববিদ্যালয়'। 'টুকরো' শব্দটা থাকতেও কেন সবাই বলেন 'মাছের পিস', 'এক পিস পাঁউরুটি'? অন্যদিকে আবার পঁচিশ বছর আগে 'লাইট' ও 'ফ্যান' এখন 'আলো' ও 'পাখা' হয়ে গেছে। যারা পরিভাষা তৈরি করছেন, তাঁরা 'শব্দকে' এই-ভাবে গ্রহণ বা বর্জনের কিংবা পরিবর্তনের প্রবণতার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করেছেন? না ক'রে থাকলে হবে না।

আমাদের স্কুলে যে বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল পড়ানো হয় তা কিন্তু অনেকদিন ধরেই বাংলায় পড়ানো হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর তো হবেই। ছোটরা এগুলো ছোট বেলা থেকেই বাংলায় শিখছে। গত পঞ্চাশ বছরে এজন্য প্রয়োজনীয় পরিভাষা-গুলি যথেষ্টই পরিণতি পাওয়ার কথা। হাতের কাছে বেশ কিছু অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানের বই আছে—একবার খুলে দেখা যাক। এখানে প্রতিটি বিশিষ্টার্থবোধক শব্দের সঙ্গে ইংরেজির লেজুড় লেগে আছে আজও—বল (force), স্থিতি (rest), গতি (motion), বায়ু (air), এমনকি বাতাসের ওজন (weight of air), পরিমাপ (measurement), পর্যবেক্ষণ (observation)। আর একটি বইতে—পাতার প্রকারভেদ (types of leaf), বীজত্বক (seed-coat), বীজপত্র (cotyledons) ইত্যাদি। ব্যাপারটা কী? এখানে যেসব বাংলা শব্দ আছে তা অতি পরিচিত, ব্যবহারেও আছে অনেকদিন। তবু কেন সঙ্গে ইংরেজি? এতে কি বাংলা সাবালক হবে! হয় যে নি তার প্রমাণ, পারিভাষিক শব্দ নয় —'বাতাসের ওজন আছে' এটা বোঝাতেও বন্ধনীতে লিখতে হয় (air has weight)। এই প্রসঙ্গে মনে হল এই স্কুলপাঠ্য অধিকাংশ বিজ্ঞান বইতে যা লেখা আছে তা অতি বিচিত্র। সে আলোচনার অবকাশ নেই এখানে।

ইংরেজির লেজুড় জোড়ার ব্যাপারটা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের বইতেই আছে—তা নয়, বাংলা ব্যাকরণ বইতেও ইংরেজি শব্দ লেখা হয় বন্ধনীতে। হাতের কাছের ছ'টি স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে তো তাই দেখছি। বর্ণ (letter), অক্ষর (syllable), বর্ণমালা (alphabet), তালব্যবর্ণ (palatals), ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (participle : verbal adjectives), প্রশ্নবাচক (interrogative), স্বরভক্তি (anaptyxis), অপিনিহিতি (epenthesis), পুরুষ (person), ধাতু (root), কাল (tense) ইত্যাদি। এটা হতে পারে যে বাংলা ব্যাকরণে অনেক কিছু আছে যা নাকি ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে ধার করা। সেখানে ইংরেজিটা দিলে কিছু সুবিধে হয়ত হতে পারে। কিন্তু পুরুষ, ধাতু, কাল-এর ধারণাও কি ইংরেজ আসার আগে আমাদের ছিল না? অন্য একটা যুক্তি হতে পারে—ছাত্রদের যেহেতু ইংরেজি-বাংলা দু'টো ভাষারই ব্যাকরণ পড়তে হয়, তাই বাংলার মধ্যে ইংরেজি দিয়ে দিলে দু'টোর মধ্যে একটা সমন্বয় করার সুযোগ শিক্ষার্থীদের থাকে। কিন্তু এ দায় কি কেবল বাংলাকেই বইতে হবে? একই কারণে কেন

ইংরেজি ব্যাকরণে থাকবে না বাংলা পরিভাষাটি ? এর কোনো উত্তর মেলে না। স্কুলের বই যাঁরা লেখেন তাঁদের কি কোনো সন্দেহ থেকে যায় যে শুধুমাত্র বাংলাটাই রাখলে ভালো ক'রে বোঝা যাবে না ? নাকি, বই যাঁরা লেখান, যাঁরা পাঠ্যক্রম তৈরি ক'রে দেন তাঁরাই এরকম নির্দেশ দিয়ে দেন, যে বন্ধনীতে ইংরেজিটা দিয়ে দিতে হবে। স্কুলেই যদি এই হাল হয়, তবে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তরে ?

আমাদের গ্রাম-গঞ্জের লোক বরাবরই তাঁদের মতো ক'রে শব্দ বানিয়ে নিয়েছেন এবং সেটাই ব্যবহার ক'রে থাকেন। সম্প্রতি একটি শব্দ হয়েছে 'শ্যালো'। শ্যালোর জলে চাষ হচ্ছে দিব্যি। লক্ষণীয়, 'শ্যালো টিউবওয়েল' কথাটার 'টিউবওয়েল' অংশটা একেবারেই বাদ গেছে—কেবল 'শ্যালো'-ই থেকেছে। আর এই সংক্ষেপীকরণ কোনো সভা ক'রে, সবার মতামত নিয়ে হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার চাষীদের মুখেই 'শ্যালো' কথাটা শোনা যায়। আরো লক্ষণীয় 'টিউব-ওয়েল' শব্দটি এবং জিনিসটি অতি পরিচিত, এবং তার বাংলা প্রতিশব্দ 'নলকূপ', শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কারো মুখের ভাষায় আসে নি। এতদিনেও না। 'নল-কূপ' লেখা হয়, সাজানো বক্তৃতায় কেউ কেউ বলেন,—মুখের সাধারণ কথা-বার্তায় কদাচ শোনা যায় না। শিক্ষিতেরা বা শহরের লোকেরা 'টিউবওয়েল'ই বলেন। গ্রামের লোক তাঁদের মতো ক'রে পরিবর্তন ক'রে নিয়েছেন, 'টিউকল,' 'টিপকল' 'চাপকল' বা শুধু 'কল'। আর যখন 'শ্যালো টিউবওয়েল' কথাটা পাওয়া গেল তখন দ্বিতীয় অংশটা বাদ হয়ে গেল। এটা কেন হয়, এসব ভাবনা পরিভাষা প্রস্তুতকারকদের ভাবা উচিত, কিন্তু ভেবেছেন বলে মনে হয় না।

গ্রামের মানুষের বা কাজের মানুষের আরো হাজার হাজার শব্দ আছে—কিছু নিজেদেরই শব্দ, কিছু ধার-করা শব্দকে পরিবর্তন ক'রে নেওয়া। বোল্ট—বল্টু; তির্যক থেকে তেওড়; সামন; পিছন; ভোমর; চর (burr); বাবরি (tur-nig); কোপ (depth of cut); যোগান (jigs); ঠাণ্ডা তার; গরম তার; ভাঁজাই; মিছিল ইত্যাদি অনেক আছে। 'থিকনেস' শব্দটির জুতসই বাংলা পাওয়া যায় না—'পুরু' কথাটা বিশেষণ, 'পুরুত্ব' বিশেষ শোনা যায় না। 'বেধ' কথাটায় ঠিক থিকনেস-এর ভাব নেই। কিন্তু কলে-কারখানায় কাজ করতে গেলে ঐ শব্দটি দরকার। ওঁরা বলেন 'দল'—খুবই সুন্দর। র‍্যাঁদা দিয়ে দলটা মার তো—মরা মরা তিনসুতো'। উল্লেখ্য, কোনো ছুতোরই কিন্তু র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠকে 'মসৃণ' করেন না, করেন 'পেলেন' বা 'প্লেন'। এরপর দু'বার 'পালিশ' ক'রে 'ফিনিস' করতে হবে। এখানে দেখা যায়, এঁরা কতরকম শব্দ তৈরি ক'রে নেন, কিন্তু 'প্লেন', 'পালিশ', 'ফিনিস'-কে বদলান না। কোন শব্দ গ্রাহ্য, আর কোনটা নয়, তার কোনো ইঙ্গিত কি পাওয়া যায় না এখানে ?

যাঁরা পরিভাষা রচনার কাজ এদেশে সভাসমিতি বানিয়ে করেন, হয়ত বা

টাকা-পয়সাও পান তার জন্য, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় তাঁরা পারিভাষিক শব্দগুলো ইংরেজিতেই বলেন। আর পরিভাষা তৈরির সময়, দেশ-কাল-সমাজের কথা ভুলে গিয়ে সংস্কৃত প্রেসক্রিপশন দেন। সে প্রেসক্রিপশন নিজেরাও মানেন না, অন্যেরাও নয়।

এখানে কয়েকটি বাক্য লেখা হল। ১. পুলিশের তরফে লিখিত আকারে মুমূর্ষশ্রাবিতক পেশ করা হয়। ২. এটা অত্যন্ত বিশ্রব্ধ ব্যাপার ৩. তাহলে গাড়িটা নিয়ে এধগ্রহণটা সেরে এসো, যেন মাঝখানে আবার থামতে না হয়। ৪. কত টাকা লাগবে তার প্রাক্‌কলন হয়েছে? ৫. নববর্ষ উপলক্ষে বিপুল অবহ্রতক। ৬. টাকাটা দিয়ে যত্নে রেখ প্রতিশ্রবটি। ৭. তিনি দু'বছরে নিযুক্তপ্রেষণে পুরুলিয়ায় গেছেন। ৮. ইনিই আমাদের নতুন মুখ্য মহাধ্যক্ষ। ৯. প্রতি রবিবারই কত প্রতিক্রোশ হচ্ছে, সেখানে কিনলেই পার। ১০. আহ্বানদর্শকের কাজটা পেলে—ভালোই হল। ১১. কাজী হাউসটা কোথায় বলতে পারেন? ১২. আপনার নামে একটা প্রগ্রহণ পত্র আছে। ১৩. ওরে বাস্, এতবড় মতপত্রী। ১৪. এই হল অবর অন্তঃশুল্ক কৃত্যক, ইনি অন্ত্যশুল্কাধীক্ষক, আর ইনি হচ্ছেন মাণ্ডলিক নিয়ামক, জনসংভরণ।

উপরের বাক্যগুলো বুঝতে পারা যায়? ধাঁধার মতো লাগে? সমাধান তাহলে এই : ১. মৃত্যুকালীন উক্তি। ২. গোপন। ৩. জ্বালানি ভরা, তেল নেওয়া। ৪. এস্টিমেট। ৫. ছাড়, রিবেট। ৬. রসিদ। ৭. ডেপুটেশন। ৮. চিফ কমিশনার। ৯. নিলাম। ১০. সমনজারি। ১১. খোঁয়াড়, পিঁজরাপোল। ১২. ওয়ারেন্ট। ১৩. ব্যালট পেপার। ১৪. জুনিয়ার এক্সাইজ সার্ভিস; রিজিওনাল কন্ট্রোলার; সিভিল সাপ্লাই। [সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার]।

সত্যিই এই জাতীয় শব্দগুলো বাঙালি নেবে? মুখে বলবে অহরহ? বলাই বাহুল্য, মুখের ভাষায় না এলে পরিভাষার ভবিষ্যৎ নেই। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—এটাই কিন্তু এ ধরনের পরিভাষার একমাত্র দোষ নয়। আর সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করলেই তা দোষ হবে এমনও নয়। অনেক সময় সুবিধেই হয় এতে। আজকাল লেখাতে তো বটেই, মুখের কথাতেও অনেক ভারি শব্দ এসে গেছে। ক্রমাগতই 'বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম ক'রে মাঠের বাইরে যাচ্ছে', স্টেডিয়ামের খেলা এখন হচ্ছে ক্রীড়াঙ্গনে। খেলার মাঠের মারামারির পর শহরতলির ট্রেনের সরব আলোচনায় শোনা গেল, 'রেফারির অধিকারে হস্তক্ষেপ', 'কর্তাস্থানীয়দের প্ররোচনা', 'আপনার এই আরগুমেন্ট আমি গ্রহণ করছি না'। কিন্তু তাই বলে ছাড়কে 'অবহ্রতক'? ছাপাখানা বা প্রেসকে 'মুদ্রিতক'? এবং মেয়র 'মহানাগরিক'? 'মহা' কথাটা বাংলায় উলটো অর্থেই বেশি চলে। 'মহাপণ্ডিত', 'মহাওস্তাদ'। প্রধান নাগরিক, প্রথম নাগরিক—তাও চলবে। কিন্তু একেবারে মহা?

এই সব পরিভাষা যাঁরা করেছেন, তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু তবু কেন এমন হয়? এখানে প্রশাসন কাজের পরিভাষা থেকেই দৃষ্টান্ত তোলা হল। এর অন্যতম কারণ, এইগুলি প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষেরই ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে। অন্যদিকে বিজ্ঞান, কলা, সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পরিভাষার ব্যবহার সবাইকে করতে হয় না। প্রশাসনিক পরিভাষার যে দশা, অন্য বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের অবস্থা যে এর চেয়ে খুব ভালো তা নয়। তবে সে দৃষ্টান্ত আর এখানে তোলার প্রয়োজন নেই।

বাংলায় যে ভাবে পরিভাষা প্রণয়ন করা হচ্ছে বা হয়েছে, তাতে মনে হয়, যাঁরা এগুলো করেন তাঁদের প্রধান বিবেচ্য হয় কোনো রকমে একটা শব্দ দাঁড় করানো। লোকে যদি তা সত্যিই ব্যবহার করে তবে কী কাণ্ড হতে পারে তা ভেবে দেখা হয়েছে বলে মনে করা কঠিন। এখানে প্রশাসনের বা সরকারি কাজে ব্যবহার্য পরিভাষা ব্যবহার ক'রে কয়েকটি লাইন লেখা গেল :

রোক সংব্যবহারের অসুবিধে থাকায় অধিকোষের চেকবহিটা সঙ্গে নিলাম। মুদ্রা এবং কিছু পত্রমুদ্রা অবশ্য পকেটে ছিল, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। পথে পরিযাণ বিশৃঙ্খলায় গাড়ি আটকাল। একটা গ্লানযান ঠিক রাস্তার মাঝখানে বিকল হওয়ায় এই বিভ্রাট। তবে পথ পরিষ্কার করার ব্যাপারে কলকাতার আরক্ষা বিভাগের পরিযাণ উপশাখার পরিযাণ ও পরিদর্শন আধিকারিক এবং উপনগরপালকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন অর্থমন্ত্রী যিনি এখন পরিবহণ মন্ত্রকের প্রাতিনিধ্যে আছেন। পথ পরিষ্কার হল, তবুও মহাকরণে পৌছতে কিছু দেরি হল। দ্বারে সায়ুধ রক্ষী বাধা দিল ও আমার তাদাত্ম্যপত্র দেখতে চাইল। তারপর বলল, 'কোথায় তোমার শীলপত্র?' আর আমার 'সংগের' তরফে আমিই যে ক্ষমতাবান প্রাধিকারী সে কাগজও দেখাতে হল। তারপর ওপরে গিয়ে নির্বহণ শাখার নিয়ামক আধিকারিকের স্বকীয় সহায়ক-এর সঙ্গে দেখা করলাম। শুনলাম তিনি করণে নেই। কিছু অপানয়নকারীর ধরা পড়া ও ভাণ্ডাগারের অর্পণাদেশের বেশ কিছু উপধি সংক্রান্ত কাজে তিনি গিয়েছেন উপনগরপালের করণে। সেখান থেকে কয়েকটি আরক্ষাগুল্ম ঘুরে আসবেন, তাই দেরি হতে পারে। বললাম, 'আমার প্রাতিজনিক বাহানুভূতির বা আত্মবাহানুভূতির কী হবে?' একটু মুচকি হাসলেন তিনি। আবেদনপত্রটি আমি একটি নামমুদ্রাঙ্কিত লেফাফায় রেখে এলাম।

একটাই প্রশ্ন। এইখানে পৌছানোর জন্যই কি আমাদের কয়েক শতাব্দীর ভাষাচর্চা?

সিদ্ধার্থ ঘোষ

সায়েন্স ফিকশন

একটি পরিভাষার জন্ম

বিশ্বের প্রথম নিছক সায়েন্স ফিকশন বিষয়ক পত্রিকাটি আমেরিকার পত্রিকা-বিপণিতে আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৬-এর ৫ এপ্রিল। যদিও 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি তখনো তৈরি হয় নি। 'অ্যামেজিং স্টোরিজ' নামে এই পত্রিকার সম্পাদক হিউগো গার্নসব্যাক-এর কলমেই তিন বছর পরে পরিভাষাটির জন্ম। 'অ্যামেজিং স্টোরিজ'-এর প্রবর্তন সূত্রেই প্রকাশনার একটি শাখা ও সাহিত্যের একটি 'ঘরানা' রূপে সায়েন্স ফিকশন স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে।

১৮৮৪-তে লুক্সেমবার্গে জন্ম গার্নসব্যাকের। কিন্তু ১৯০৪-এর পর থেকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা। প্রযুক্তিবিদ্ এই মানুষটি নতুন ধরনের এক ব্যাটারি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অর্জন করার পর বিশ্বের প্রথম রেডিও ম্যাগাজিন 'মডার্ন ইলেকট্রিক্স' প্রকাশ করেন ১৯০৮-এ এবং রেডিও সম্প্রচার বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ 'দা ওয়্যারলেস টেলিফোন' (১৯১০) রচনা করেন। পারিবারিক ব্যবহারের উপযোগী প্রথম 'রেডিও সেট'ও ডিজাইন করেছিলেন তিনি। ১৯১১-য় 'মডার্ন ইলেকট্রিক্স'-এর পাতা ভরানোর জন্য তিনি প্রথম সায়েন্স ফিকশন চর্চায় উৎসাহী হন। 'র‍্যাল্ফ 124C 41+' নামে একটি উপন্যাস বারোটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সাহিত্যের সঙ্গে কণামাত্র সম্পর্ক-রহিত এই উপন্যাসে গতিসঞ্চারের জন্য প্রযুক্তি-বিষয়ক পূর্বাভাসের বন্যা বইয়েছিলেন লেখক — আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ, প্ল্যাস্টিক দ্রব্য, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন, মাইক্রোফিল্ম, নিদ্রারতকে প্রশিক্ষণের যন্ত্র ইত্যাদি। এক মঙ্গলবাসী কর্তৃক নায়িকাকে অপহরণের পর মহাকাশে এক ভয়ানক যুদ্ধকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল উপন্যাসের প্লট। গার্নসব্যাকের এই রচনাই জানিয়ে দিচ্ছে তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা কী জাতীয় সৃষ্টিকে অনুমোদিত ও উৎসাহিত করেছিল। পরবর্তী কালে এই জাতীয় রচনাকে 'সোপ অপেরা'-র আদর্শ জুটি হিসাবে 'স্পেস অপেরা' আখ্যা দিয়েছিলেন উইলসন টাকার নামে এক সমালোচক।

'অ্যামেজিং স্টোরিজ'-এর পরে গার্নসব্যাক একের পর এক 'সায়েন্স ওয়াণ্ডার স্টোরিজ', 'এয়ার ওয়াণ্ডার স্টোরিজ', 'সায়েন্স ওয়াণ্ডার কোয়ার্টারলি' ইত্যাদি সম্পাদনা করেন। ১৯৫২-য় তাঁর শেষ প্রয়াস 'সায়েন্স ফিকশন প্লাস' পত্রিকা। কিন্তু ততদিনে সায়েন্স ফিকশনের কাছে পাঠকের চাহিদা গার্নসব্যাকের প্রযুক্তি বিষয়ক অতি-আশাবাদী পূর্বাভাসের গণ্ডি অতিক্রম করেছে, 'গার্নসব্যাকের ডিলিউশন' নামে পরিহাসের বিষয় হয়েছে। সাত সংখ্যার পর পত্রিকটি উঠে যায়।

গার্নসব্যাকের সময় থেকে সায়েন্স ফিকশন একটি মূলত মার্কিনী উপ-সংস্কৃতি রূপে পত্রিকা-কেন্দ্রিক শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এবং গার্নসব্যাকের পদাংক অনুসরণ করেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে 'অ্যাস্টাউণ্ডিং স্টোরিজ'—যার সম্পাদক জন ডব্লিউ ক্যাম্পবেল জুনিয়র অভিহিত হতেন 'দা গুরু অফ ইন্‌জিনিয়ারিং মাইণ্ড' হিসাবে। সম্পাদক হিসাবে তিনি কিছু তরুণ লেখককে অবশ্য সুযোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরবর্তী কালে 'সায়েন্স ফিকশন' লিখে নাম করেছেন। যেমন, আইজ্যাক অ্যাসিমভ, থিওডোর স্টার্জন প্রমুখ। তিনের দশকের এই গার্নসব্যাক ও ক্যাম্পবেল পর্বটিকে 'এস. এফ.' ভক্তকুল তাঁদের 'গোল্ডেন এজ' বলে থাকেন।

গার্নসব্যাক ও ক্যাম্পবেলের হাতে পরিভাষাটির জন্ম ও প্রাথমিক প্রচারলাভ সত্ত্বেও, ধর্মীয় উপগোষ্ঠিভুক্ত উৎকট এক জাতীয় ভক্তকুল সৃষ্টি হলেও, এই ধারা পরিণতিতে 'কমিক স্ট্রিপ'-এর বেনোজলে ভেসে গেছে। সায়েন্স ফিকশন শব্দদ্বয় উচ্চারিত হওয়া মাত্র দীর্ঘকাল আমরা তটস্থ হয়ে উঠেছি এই ভেবে যে এইবার উদ্গত চক্ষু অপার্থিব দানব অথবা সুপারম্যানের লড়াই দেখতে হবে। সায়েন্স ফিকশন-কে আমরা 'বাক্ রজার্স' বা 'ব্যাটম্যান' জাতীয় গাঁজাখুরি কল্পনা বলে বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি। এর পিছনেও গার্নসব্যাক তথা 'গোল্ডেন এজ'-এরই সর্বাধিক অবদান।

১৯২৮-এ প্রথম এস. এফ. কমিক স্ট্রিপ 'বাক্ রজার্স' প্রকাশিত হয়, তারপরে ১৯৩৮-এ আবির্ভাব 'সুপারম্যান'-এর। এই জাতীয় এস. এফ. চিত্রকাহিনী সমেত 'ডোনাল্ড ডাক্', 'দা লোন রেঞ্জার', কি 'বাবর' ইত্যাদি স্ট্রিপের মধ্যেও ইয়াংকি সংস্কৃতির প্রচ্ছন্ন প্রলোভন ও বিশ্বকে মার্কিনী ছাঁচে রূপান্তরিত করার বিষয়টি বহু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলেন্দে-র আমলে চিলির গবেষক ও অধ্যাপক এবং বর্তমানে নির্বাসিত অ্যারিয়েল ডর্ফম্যান। তাঁর রচিত দু'টি গ্রন্থ 'দা এম্পায়ার্স ওল্ড ক্লোদস' এবং 'হাউ টু রিড ডোনাল্ড ডাক্' (সতেরোটি ভাষায় অনূদিত) নিরীহদর্শন কমিক স্ট্রিপের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিহিতার্থ নিয়ে অত্যন্ত মননশীল আলোচনা।

এই জাতীয় এস. এফ. রচনায় আসলে চটুল মার্কিনী ছাঁচের 'ওয়েস্টার্ন কাহিনী'কেই ('রেড' ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংস করার কাহিনীকেই) ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক প্রগতির মুখোশ এঁটে পরিবেশন করা হয়। ঘোড়ার জায়গায় দেখা দেয় স্পেসশিপ

আর তীর-ধনুকের বদলে ভুলে নেওয়া হয় 'লেসার গান্'। ফলে সামরিকবাদ, জাতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আতংক ও সংঘর্ষ ইত্যাদি তথাকথিত 'পপুলার কালচার'-এর যাবতীয় ক্ষত এস. এফ.-এর দৌলতে পৃথিবীর দেশ কাল ছাড়িয়ে গ্রহান্তরের অতীত ও ভবিষ্যৎকেও অমানবিক রক্তপাতে সিঞ্চিত করেছে।

বিজ্ঞানের প্রশ্রয়ে 'সুপারম্যান' বা অতিমানবের কাহিনী সম্বন্ধে সায়েন্স ফিকশন রচয়িত্রী উরসুলা কে. লেগুঁই লিখেছেন[৭] :

> সুপারম্যান একটি 'সাব্-মিথ'। তার পিতা নীৎসে এবং মাতা কমিক-পুস্তক। সুপারম্যান প্রতিটি দশ বছরের বালক বালিকা এবং আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে বেঁচে আছে এবং আছে বহাল তবিয়তে। সায়েন্স ফিকশনের অন্যান্য সাব্-মিথ হল অভিনব সব অস্ত্র সংবলিত প্রাক্তন 'তরোয়াল ও ইন্দ্রজাল' জগতের যত শ্বেত-কেশী নায়ক, উন্মাদ অথবা ঈশ্বর রূপে নিজেকে কল্পনাকারী কম্পিউটার, বিকৃত মস্তিষ্ক বিজ্ঞানী, সহৃদয় স্বৈরাচারী, অপরাধীর সন্ধান লাভে সফল গোয়েন্দা, সেই সব পুঁজিপতি যারা গ্যালাক্সি কেনা-বেচা করে, মহাশূন্য-যানের দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন বা সৈন্য, দুষ্কৃতকারী এলিয়েন, সুমতি সম্পন্ন এলিয়েন এবং প্রতিটি উদ্ভিন্ন যৌবনা মস্তিষ্কহীন তরুণী যাদের দানবের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের সান্ত্বনা প্রদান ক'রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা অধুনা যারা উপরোক্ত নায়কদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে।

সায়েন্স ফিকশন নয়, শুধু এই নামের পরিভাষাটি প্রণয়নের জন্য গার্নসব্যাকের যেটুকু কৃতিত্ব। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে, স্বয়ং গার্নসব্যাক ও তাঁর অনুগামীরা শেলি, ভার্ন ও ওয়েল্‌স প্রমুখের সাহিত্যকর্ম নিয়মিত পুনর্মুদ্রণ করেছেন এবং 'এস. এফ.' তকমা জুড়ে তাঁদের নিজেদের পূর্বসূরি বলে দাবি করেছেন। কাজেই শুধু সমসাময়িক রচনা নয়, 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি তার জন্ম-পূর্বের সাহিত্যকর্মকেও ঘরানা ভুক্ত ক'রে নিয়েছিল।

পরিভাষাটির জন্মদান ও তাকে জনপ্রিয় ক'রে তোলা এবং তিনের দশক 'গোল্ডেন এজ' নামে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও গার্নসব্যাক-রা মার্কিনী পাঠশালা খোলার বহু পূর্বে এবং পাঠশালা বন্ধ হওয়ার পরে পঞ্চাশের দশক থেকে রচিত সায়েন্স ফিকশনই প্রণিধানযোগ্য। সায়েন্স ফিকশনের তাৎপর্য, সার্থকতা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনায় গার্নসব্যাকদের কোনো ঠাঁই নেই।

কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা

ব্যক্তিগত সাহিত্যিকের কীর্তি নয়, সামগ্রিকভাবে 'সায়েন্স ফিকশন'-কে নিয়ে সাহিত্য সমালোচকরা প্রথম বিশ্লেষণ শুরু করেন এই শতাব্দীর পাঁচের দশক

থেকে। একটি 'ঘরানা' হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের এই প্রথম স্বীকৃতি সত্ত্বেও 'ঘরানা'-টির সংজ্ঞা নিরূপণে কিন্তু আজও কোনো ঐকমত্যে উপনীত হওয়া যায় নি। এমন কথাও আলোচিত হয়েছে যে সায়েন্স ফিকশনের যত লেখক তত তার সংজ্ঞা এবং কোনো বিশেষ বন্ধনীর মধ্যে 'ঘরানা'-কে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও এখানে বিশিষ্ট লেখক ও সমালোচকের প্রদত্ত কয়েকটি সংজ্ঞা পেশ করা হচ্ছে, কারণ এই সংজ্ঞা-ভেদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সংজ্ঞা-নিরূপণের অসুবিধা এবং সার্থক সায়েন্স ফিকশনের ব্যাপ্তিরও পরিচয়।

ক. সায়েন্স ফিকশন কাহিনীতে কল্পনা ক'রে নেওয়া হয় একটি প্রকৌশলকে, বা একটি প্রকৌশলের প্রভাবকে, বা প্রাকৃতিক পারম্পর্যের একটি বিশৃঙ্খলাকে, যার অভিজ্ঞতা মানুষ এই রচনাটির পূর্বে লাভ করে নি। (—এডমাণ্ড ক্রিস্পিন, বেস্ট এস এফ স্টোরিজ, ১৯৫৫)।

খ. সায়েন্স ফিকশন সেই শ্রেণীর আখ্যান যেখানে এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় যার উদ্ভব আমাদের পরিচিত জগতে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রকল্পটির উৎস মানবিকই হোক বা অপার্থিব, সেটি গড়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের কোনো উদ্ভাবনকে বা ছদ্ম-প্রকৌশলকে ভিত্তি ক'রে। (—কিংস্লি অ্যামিস, নিউ ম্যাপ্স অফ হেল্, ১৯৬০)।

গ. এস. এফ. কাহিনী গড়ে ওঠে মানুষকে ঘিরে, যা একটি মানবিক সমস্যা এবং একটি মানবিক সমাধান সম্পন্ন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মর্মবস্তু ভিন্ন এই কাহিনী কখনোই রচিত হতে পারত না। (—থিওডোর স্টার্জন, দ্র. জেমস ব্লিশ প্রণীত 'দা ইস্যু অ্যাট হ্যাণ্ড, ১৯৬৪)।

ঘ. সায়েন্স ফিকশন ফ্যাণ্টাসিরই একটি স্বতন্ত্র ধারা যেখানে পাঠকের পক্ষে 'অবিশ্বাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে সংহত রাখার' প্রক্রিয়াটি অনেক সহজসাধ্য। কারণ, ভৌত বিজ্ঞান, স্থান, কাল, সমাজ-বিজ্ঞান এবং দর্শনকে ঘিরে তার কাল্পনিক পূর্বাভাসগুলি লালিত হয় এক বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার আবহাওয়ায়। (—স্যাম মস্কোউইৎজ্, সিকার্স অফ টুমরো, ১৯৬৬)।

প্রাত্যহিক জীবনে যা সম্ভব তার সীমানায় আবদ্ধ থাকতে মানুষ নারাজ। মানুষের আকাঙ্ক্ষা—বিচিত্র অদ্ভুত অজানা ও অশ্রুতের অভিজ্ঞতা লাভের আকাঙ্ক্ষা (শুধু কল্পনায় হলেও)। খোলা মন নিয়ে একেবারে অপ্রত্যাশিতকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাশিত পরিচিতকেই, অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে সমীক্ষা করা, তাকে আশ্চর্য অভিনব কিছুতে পরিণত করা এস. এফ.-এর এক-চেটিয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। পুরাণ, রূপকথা ও রোমাঞ্চ কাহিনীতেও এই সব উপাদানের প্রাচুর্য। বিজ্ঞানের কোনো প্রশ্রয় ছাড়াই মানুষের কল্পনা কতটা প্রসারিত হতে পারে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্মীয় বহু উপাখ্যান, পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে। স্থলচারী মানুষের শুধু একটি আকাঙ্ক্ষার কথাও যদি বিবেচনা

করা হয় – গগন বিহারের স্বপ্ন – তা হলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

আকাশ ছাড়িয়ে মহাশূন্যে হানা দেওয়ার, চান্দ্র অভিযানের বাসনা পূর্ণ হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত লুসিয়েন-এর Menippus উপন্যাসে। জ্যোতির্বিদ কেপ্‌লার রচিত Somnium-এর ও ফ্রান্সিস গডউইনের একটি উপন্যাসেরও উপজীব্য মহাকাশে পাড়ি। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যারিস-বাসী Cyrano de Bergerac (Rostand-এর কমেডির চরিত্র হিসাবেই এখন অধিক পরিচিত) তাঁর পূর্বসূরিদের চন্দ্রাভিযানের যাবতীয় কল্পনাকে প্যারডি ক'রে দু'টি ভিন্ন মেজাজের উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জুল্ ভার্নকেই কেন আমরা মহাকাশযাত্রা বিষয়ক প্রথম এস. এফ. রচনাকারের আসনটি দিই?

কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট 'গোলেম্' ইত্যাদি কাল্পনিক দানবের অস্তিত্ব সত্ত্বেও মেরি শেলির ফ্রাংকেনস্টাইনের দানব, কারেল চাপেকের রোবট বা ওয়েল্‌সের ডক্টর মোরো-র গবেষণাজাতদেরই শুধু সায়েন্স ফিকশনের তক্‌মা লাগাবার পিছনে কি বিচারধারা অনুসৃত হয়?

ইউটোপিয়া বা ডিস্‌টোপিয়া – স্বপ্নরাষ্ট্র বা ভগ্নস্বপ্নের রাষ্ট্র বিষয়ক সাহিত্যের সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের সম্পর্কই বা কি? ডার্কো সুভিন নামক এক সমালোচক বলেছেন: 'অ্যাডভেঞ্চার, রোমান্স, জনপ্রিয়তা বা অভিনবত্ব, সব কিছু সত্ত্বেও এস. এফ. শুধু ইউটোপিয়া এবং অ্যান্টি-ইউটোপিয়ার দুই দিগন্তের মধ্যেই লেখা সম্ভব।' কিন্তু কোন সূত্রে এডওয়ার্ড বেলামি-র 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড' (১৮৮৮), উইলিয়াম মরিসের 'নিউজ ফ্রম নো হোয়্যার' (১৮৯০), জ্যাক লণ্ডনের 'আয়রন হিল্', কি অল্‌ডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লর্ড' ইত্যাদিকে এস. এফ. বলে অভিহিত করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু ওয়েল্‌সের 'টাইম মেশিন', কি জামিয়াতিনের 'উই'-এর ক্ষেত্রে তা নয়!

এই পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলির সাহায্যে এই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি সব বাদ দিলেও, বিশুদ্ধ 'ফ্যান্টাসি' ও সায়েন্স ফিকশনের মধ্যেও ভেদরেখা নির্ণয়ে অসমর্থ এই অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাগুলি।

কিন্তু বিভিন্ন সংজ্ঞার ও এই পরিভাষার জন্মের ইতিহাস ছাড়িয়ে আমরা যদি পিছিয়ে যাই ১৮১৮-য়, মেরি শেলির কালে এবং তারপরে জুল ভার্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্‌সের রচনার বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের চেষ্টা করি – কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের হদিশ পাওয়া সম্ভব।

মেরি শেলি, জুল্ ভার্ন ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স

প্রথম সায়েন্স ফিকশন আখ্যা দিতে সাহিত্য সমালোচকরা যদি দ্বিধাগ্রস্ত হনও,

কবি-পত্নী মেরি উলস্টোনক্র্যাফ্‌ট গডউইন শেলি-র (১৭৯৭-১৮৫১) সুপরিচিত 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' যে সায়েন্স ফিকশনের যাবতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত তাতে কোনো দ্বিমত নেই। এই উপন্যাসটির উল্লেখ মাত্র মানুষের হাতে-গড়া দানবের কীর্তিকলাপের কথাই যদি শুধু আমরা স্মরণ করি তা হলে এই দানবের সঙ্গীলাভের জন্য আর্তনাদ বা তার স্রষ্টাকর্তার পত্নীকে বিয়ের রাত্রে হত্যা ইত্যাদি উপন্যাসটিকে গথিক ফিকশনের অতিরিক্ত কোনো মর্যাদা দিতে অক্ষম। বস্তুতপক্ষে, উপন্যাসটির নাম যে ফ্র্যাংকেনস্টাইন নয়—ফ্র্যাংকেনস্টাইন, অর্‌ দা মডার্ন প্রমিথিউস, সেটাও বিশেষভাবে খেয়ালে রাখা দরকার।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপ্লবের অল্পদিন বাদে জন্ম মেরি শেলির। নেপোলিয়নের যুদ্ধের রক্তাক্ত স্মৃতিও মিলোয় নি উপন্যাসটি প্রণয়নের কালে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতেও চলেছে তখন পালাবদলের তুমুল কাণ্ড। শিল্প-বিপ্লবের এক চূড়ান্ত পর্বে কারখানার অঙ্গন ছেড়ে জল ও স্থল বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাষ্পীয় শক্তি ঔপনিবেশিকদের হাতে আরো কিছু তুরুপের তাস তুলে দিতে চলেছে। অন্য দিকে বার্জেলিয়াস ও লামার্ক বায়োকেমিস্ট্রি ও বিবর্তনবাদ নিয়ে অভিনব গবেষণায় সিদ্ধি লাভ করছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের অন্বেষণ যে-বিজ্ঞানকে একদিন রাজশক্তি ও ধর্মের প্রতিপক্ষ করেছিল, প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা দূরে থাক তখন তা রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে শুরু করেছে। ইতিহাসের তৎকালীন পটভূমিতে বিজ্ঞানের সামগ্রিক ভূমিকার চেয়েও অবশ্য বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধের শংকটই উদ্‌বুদ্ধ করেছিল মেরি শেলি-কে। প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব জারির শুভ-অশুভ বিবেচনা-নির্ভর সীমা নির্ধারণের বিষয়টিও লেখিকার বিবেচনাধীন ছিল। এবং এই বিবেচনা ব্যতীত আজ অবধি সায়েন্স ফিকশনের অস্তিত্ব অর্থবহ, সার্থক হয়ে উঠতে পারে না।

বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের সাধনা এবং মানব প্রজাতির উন্নতি সাধনের জন্য গবেষণা সূত্রে ভিক্টর ফ্র্যাংকেনস্টাইন সৃষ্টি করেছিল একটি দানব। কুৎসিত-দর্শন সত্যি, কিন্তু সত্যিই কি দানব? 'সভ্যতার' সংস্পর্শে না আসায় অকলুষিত একটি সরল বন্য প্রাণী। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার পরিচয়ই তো বহন করছে তার এই উক্তি: 'আমি আমেরিকান ভূখণ্ড আবিষ্কারের কথা শুনেছি এবং তার আদিম বাসিন্দাদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা ক'রে কেঁদেছি ...'

ভিক্টরের এই সৃষ্টি সায়েন্স ফিকশনের অসংখ্য এলিয়েনদের প্রথম পুরুষ যাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মানুষ আক্রমণ করেছে, কারণ সে ভিন্ন, অন্যরকম। উপনিবেশের আদিবাসীদের সভ্যতাকে তুচ্ছ জ্ঞানে ধ্বংস করার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তো রয়েইছে দানবের উক্তিতেই। দানবের কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে মেরি শেলি প্রকৃতপক্ষে সমাজের পরিত্যক্তদের মানবিক আবেগকে বিশ্লেষণ করেছেন। আর আধুনিক প্রমিথিউস ভিক্টর মূলত একটি 'ফাউস্ত'

চরিত্র। জ্ঞান অন্বেষণের হিতাহিতের দ্বৈরথে পীড়িত। বিজ্ঞান-চর্চার ভালো-মন্দ নয়, এই চর্চা যে নৈতিক উভয়সংকট সৃষ্টি করে, তারই প্রবক্তা ভিক্টর।

উপন্যাসটি প্রকাশের কালে 'সায়েন্টিফিক রোমান্স' এই গোত্রভুক্ত করার বা 'গথিক' ধারার সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও রচয়িতা তাঁর সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে গ্রন্থটির ভূমিকা (যদিও অনেকের অনুমান পত্নীর হয়ে ভূমিকাটি লিখেছিলেন কবি শেলি):

> আমি অতিপ্রাকৃত আতংকের এক মালা বুনেছি বলে মনে করি না।... ঘটনাটি থেকে সঞ্জাত পরিস্থিতির অভিনবত্বই প্রণোদিত করেছিল [রচনাটিকে] এবং পার্থিব জগতের তথ্য হিসাবে যতই অসম্ভব হোক, কল্পনাকে তা এমন একটি দৃষ্টিকোণ অর্পণ করে যার ফলে মানবিক আবেগকে যেভাবে চিত্রণ করা যায়, বাস্তবগ্রাহ্য ঘটনার আটপৌরে সম্পর্ক থেকে ততখানি সামগ্রিক ও কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে তা প্রস্তুত হয় না।

১৮১৮-তে ফ্র্যাংকেনস্টাইন' প্রকাশের পর সেই বছরেই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ওয়াল্টার স্কট 'ব্ল্যাকউড্‌স এডিনবরা ম্যাগাজিনে'র মার্চ সংখ্যায় গ্রন্থটি সমালোচনা করেন। লক্ষণীয়, স্কটও সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন[৭]:

> [এই গ্রন্থে] কল্পনার উদ্দাম সব বেনিয়মের মধ্যেও সম্ভাব্যতাকে কিন্তু মোটেই দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রাখা হয় নি, বরং লেখিকা তাঁর আখ্যানের ভিত্তিরূপে যে অ-সাধারণ স্বীকার্য (postulates)-গুলি মেনে নিতে বলেন তাও আমরা অনুমোদন করি শুধু এই শর্তে যে অতঃপর তিনি তার ফলাফল নির্ভুল যুক্তি-নির্ভর পথেই নির্ধারিত করবেন।

'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' শুধু সায়েন্স ফিকশনের পথিকৃৎ নয়, উপরোক্ত ভূমিকা ও সমালোচনার সুবাদে তা 'সায়েন্স ফিকশন' নামটি জন্মের পূর্বেই তার দু'টি সম্ভাব্য সংজ্ঞাও দিয়ে গেছে আমাদের।

সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীন ভিক্টরের নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অহেতুক আস্থার পার্সোনিফেকেশন্ হিসাবে, ভিক্টরের দ্বৈত সত্তারূপেও তার তৈরি দানবটিকে ব্যাখ্যা করা যায় নিশ্চয়। কিন্তু শুধু এই দ্বৈতসত্তারূপে দানবটির অস্তিত্ব উপন্যাসটিকে সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে না। নিজের ক্ষমতার বাইরে হস্তক্ষেপের অশুভ কারণে জন্ম যে মেফিস্টোফিলিসের সে-ও ফাউস্টেরই দ্বৈত সত্তা। দ্বৈত সত্তা দানবই হোক কি অশরীরী, তাকে একই ব্যক্তিত্বের দু'টি বিরোধী সত্তা রূপে কল্পনা করা যায়। তারই অন্যতম সেরা সাহিত্যিক উদাহরণ রবার্ট লুই স্টিভেনসনের 'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড'। সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর হাইড নিজের তৈরি একটি ওষুধ খেয়ে নিজেকে পরিণত করেছিলেন দানবে। ভিক্টোরিয়ান যুগের ভণ্ডামি ও বিভাজিত ব্যক্তিত্বকে

উদ্‌ঘাটন করার জন্য স্টিভেনসনের এই রূপক। উপন্যাসের মূল সমস্যা অবশ্য বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর সামাজিক ভূমিকা ঘিরে গড়ে ওঠে নি।

সায়েন্স ফিকশনের ইতিহাসে মেরি শেলির পরবর্তী অধ্যায়ের দুই জ্যোতিষ্ক জুল ভার্ন (১৮২৮-১৯০৫) এবং এইচ. জি. ওয়েল্‌স (১৮৬৬-১৯৪৬)। সায়েন্স ফিকশনের দুই পূর্বপুরুষ রূপে এক নিশ্বাসে নাম দু'টি উচ্চারণ করতেই অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু কি সাহিত্যিক প্রকরণের বিচারে, কি ইতিহাসে বিজ্ঞানের ভূমিকার ব্যাখ্যায় দু'জনের মেজাজ, ভঙ্গি ও উদ্দিষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূলত তাঁদের হাতে গঠিত সায়েন্স ফিকশনের দুই শিবিরের অস্তিত্ব আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। বিশেষ ক'রে বাংলায় সায়েন্স ফিকশন-চর্চাকে তা কিভাবে প্রভাবিত করেছে সে-প্রসঙ্গে আমরা পরেও আবার ফিরে যাব।

ভার্ন ও ওয়েল্‌সের বহুপঠিত উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। এখানে আমরা তাঁদের ভিন্নতার কয়েকটি সূত্র সন্ধানের চেষ্টা করব।

বাণিজ্যিক উৎসাহে ভৌগোলিক অভিযান যখন পৃথিবীতে আর কোনো অজ্ঞাত জগতের সন্ধান লাভের রোমাঞ্চকর বাসনাকে প্রায় নির্বাসিত করেছে, জুল ভার্ন হাজির হলেন তাঁর কাল্পনিক দুনিয়া নিয়ে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অজানা নতুন রাজ্যে পদার্পণের সুযোগ দিল—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, এমনকি মহাকাশে অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিশ্রুতি। মহাকাশ যাত্রাকে খুঁটিনাটি বর্ণনার গুণে একটি বিজ্ঞান-সমর্থিত ঘটনার ইলিউশন হিসাবে সৃষ্টি করলেন ভার্ন ১৮৬৫-তে তাঁর 'ফ্রম দা আর্থ টু দা মুন' উপন্যাসে। ভার্ন তাঁর উপন্যাসরাজির নাম দিয়েছিলেন, 'ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজেস'।

কিশোর থেকে বৃদ্ধ শতাধিক বছর ধরে আজ অবধি ভার্নের অ্যাডভেঞ্চারে নিজেরা অংশগ্রহণ ক'রে আসছে। বর্ষীয়ান তলস্তয়কেও শিহরিত করেছিলেন ভার্ন। খেলার ছলে ভার্নের উপন্যাসের জন্য বহু ইলাসট্রেশন করেছেন তিনি। ঠাকুরদা কুলদারঞ্জন রায়ের অনূদিত 'মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড' পড়ে দশ বছরের কিশোর সত্যজিৎ রায়ও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ভার্নের গল্পের প্রাণ-মাতানো নিখুঁত বর্ণনার অঢেল প্রাচুর্য আজো তাঁকে বিস্মিত করে।

শ্রীমতী কার্ল-মার্কসের নিকট বন্ধু, প্যারি কমিউনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী ও বিজ্ঞানী Gustave Flourens-এর আদলে ভার্ন সৃষ্টি করেছিলেন 'টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দা সি'-র রহস্যময় নায়ক ক্যাপ্টেন নেমো-কে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের এবং ভারতের সিপাহি অভ্যুত্থানের প্রতিও ভার্নের সশ্রদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। কিন্তু 'বিজ্ঞান'কে তিনি বিশুদ্ধভাবে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ হাতিয়ার রূপে কল্পনা করেছিলেন। তাঁর রোমান্টিক কল্পনায় সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জনের বাসনা পূর্ণ করেছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হস্তক্ষেপ।

ভার্ন তাঁর 'ফ্যান্টাস্টিক ভয়েজ' সমূহে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সচেতন ও গর্বিত ছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তত্ত্বকে নিকট ভবিষ্যতের চেয়ে দূরে প্রক্ষেপ করেন নি সতর্ক ভার্ন। অদ্ভুত নিয়ে তাঁর কারবারে অসম্ভবকে পরিহার করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টার কসুর ছিল না। আর তাই ওয়েল্‌সের রচিত গ্রহান্তরে ভ্রমণের কাহিনী পড়ে তিনি বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন : 'আমি [যেখানে] পদার্থবিদ্যাকে কাজে লাগাই, উনি বিশেষ এক ধাতুতে তৈরি উড়োজাহাজে ক'রে হাজির হন মঙ্গলগ্রহে। দেখান তো সেই ধাতুটি আমাকে!'

কিন্তু পরিহাস এখানেই যে এই পিউরিটান মনোভাব সত্ত্বেও ওয়েল্‌সের ঐ অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি ধাতুর মতো ভার্নের বারুদ-ঠাসা মহাকাশে ক্ষেপণের কামানটিকেও বিজ্ঞান সমান অসম্ভব বলে সহাস্যে খারিজ করেছে। ওয়েল্‌সের কল্পনার অদৃশ্য মানুষের অবশ্যম্ভাবী দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বিচ্যুতি লক্ষ করা যায় ঠিকই, কিন্তু শুধু সেই সুবাদে এস. এফ.-রাজ্যে উচ্চতর সম্মানের আসনটি ভার্ন অধিকার করতে পারবেন না। সার্থক পূর্বাভাসই যদি খাঁটি এস. এফ.-এর লক্ষণ হয়, তবে ভার্নের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যভেদের গুটিকতক সাফল্য বাদে অধিকাংশই আজ প্রলাপ।

ভার্নের পূর্ববর্তী শেলি এবং পরবর্তী ওয়েল্‌সের রচনায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল ইতিহাসে বিজ্ঞানের ভূমিকাকে ঘিরে তাঁদের সপ্রশ্ন অনুসন্ধান থেকে। বৈজ্ঞানিক প্রগতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যজাত শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব ও নীতিবোধ রহিত বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক-জীব বিজ্ঞানীর দ্বন্দ্ব যে-সাহিত্যকে প্রণোদিত করে বা এই সচেতনতা সঞ্চারিত করাই যার অভীষ্ট—বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য সমকালীন বিজ্ঞানের শুধু অনুমোদিত ক্ষেত্রের সীমা তাকে আবদ্ধ করতে পারবে না—এ শুধু প্রত্যাশিতই নয়, এই জাতীয় সৃষ্টির জৈবিক নিয়মেরই অধীন।

বিপরীতে ইতিহাসে বিজ্ঞানের সদর্থক ভূমিকা সম্বন্ধে আশাবাদী ভার্নের রচনায় প্রকৌশলের রোমান্টিক রূপটি আজ শুধু যন্ত্রবিপ্লবের যুগের এক আত্মতুষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের খর্বদৃষ্টির পরিচায়ক। উপরন্তু বিজ্ঞানের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রতিটি কল্পনাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার জন্য উপন্যাসের দেহের অধিকাংশ জুড়ে ভার্নের 'ন্যাচারালিস্টিক' বিবরণ যখনই অসম্ভব বা অবাস্তব প্রমাণিত হয়েছে, সম্পর্কিত সৃষ্টিটি তার একমাত্র অবলম্বন বা গর্বটিকেও খুইয়েছে। আজ ফিকশন হিসাবে যত না তার চেয়ে অভিযান কাহিনী রূপেই গুটিকতক ভার্নের উপন্যাসের সমাদর এবং কিশোরোপযোগী এস. এফ.-এর মডেল জ্ঞানেই কিছু লেখক তাঁকে অনুসরণ করেন।

বিপরীতে ওয়েল্‌সের মহাকাশ-যান, টাইম মেশিন ইত্যাদি তার আবির্ভাব কালেও যা ছিল আজও ততটাই অবাস্তব। বিভিন্ন 'গ্যাজেট'কে যন্ত্রসম্ভব বা প্রকল্পকে বিজ্ঞান-সমর্থিত ক'রে তোলার জন্য কারিগরি খুঁটিনাটির অশেষ

জটিলতার মধ্যে যান নি ওয়েল্‌স, কারণ সেটা তাঁর উদ্দিষ্টই নয়।

ওয়েল্‌সের টাইম মেশিনের সঙ্গে সত্যিই সত্যজিৎ রায়ের গল্প 'টেরোড্যাক্‌টিলের ডিম'-এর পরিহাসমূলক উক্তির বিশেষ অমিল নেই, 'সেই যে একটা সাইকেলের মতো জিনিস চেপে হ্যাণ্ডেল টানলেই অতীত যুগে, আর আরেকটা টানলেই ভবিষ্যতে চলে যায়।' কিন্তু 'অবিশ্বাসকে স্বেচ্ছায় সংহত করার' সাহিত্যিক পদ্ধতি এই যন্ত্রযোগেই আমাদের পৌঁছে দিতে পারে ভিন্ন দুনিয়ায়। ভিত্তিতে একটি অনুমান – হাইপথেসিস থাকলেও এই ভিন্ন দুনিয়ায় কিন্তু অন্বেষণ চালায় যুক্তিগ্রাহী বাস্তবতা। টাইম মেশিন বা সমগোত্রীয় অসম্ভব যন্ত্র বা কৌশল, বিবিধ কাল্পনিক ও ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ইত্যাদির প্রাথমিক অঙ্গনটি এস. এফ.-রচয়িতাদের (এবং পাঠকেরও কাছে) সাহিত্য-প্রকরণ স্বীকৃত এক ধরনের জাম্পিং-বোর্ড মাত্র। গল্পের রাজ্যে (সত্যান্বেষণের ক্ষেত্রে) পৌঁছে দিয়েই এই সিঁড়িটির কাজ ফুরোয়। জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনার অভিনব একটি মাত্রা যোজনা করেই যা নিজেকে সরিয়ে নেয়।

ফ্যাণ্টাসির সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটিও এই সূত্রেই উত্থাপিত হতে পারে। বিশুদ্ধ ফ্যাণ্টাসি একটি মাত্র মূল কল্পনাকে ঘিরে দানা বাঁধে না। অসম্ভব কল্পনা থেকে অসম্ভবতর কল্পনা পল্লবিত হতে থাকে সেখানে। বিপরীতে, এস. এফ.-এর মূল প্রকল্পটি যতই অবিশ্বাস্য হোক, বিজ্ঞানের ইতিহাস তাকে এক ধরনের দার্শনিক বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় (সার্থকতার সেটাও একটি বিচার নিশ্চয়)। স্থলবন্দী প্রস্তরযুগের মানুষের কাছে জলচর, নভোচর যন্ত্র যতটা দুরূহ কল্পনা, আমাদের কাছে সময়চর যন্ত্র (বিজ্ঞানসিদ্ধ না হোক তবু) ততটা বোধ হয় না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা যে-হারে পুষ্টি লাভ ক'রে চলেছে, বিস্ময়কর চিন্তা বা কল্পনাকে তার চেয়ে দ্রুত হারে পরিচালিত করতে না পারলে তাই নিকট আত্মীয় ফ্যাণ্টাসির আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে এস. এফ. স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। মানুষ ও পশুর কথোপকথনের কোনো বাধা নেই রূপকথায়। এবার স্যামুয়েল আর. ডিলানি-র উপন্যাস 'ব্যাবেল-১৭'-য় কি ঘটছে দেখা যাক। গ্রহান্তরের আগন্তুক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষীর সঙ্গে সেখানে ভাব বিনিময় হচ্ছে কম্পিউটারের মধ্যস্থতায়, কিন্তু সেটি সম্ভব হয়েছে 'লিঙ্গুইস্টিক' ও 'সেমিওটিক্‌স' বিদ্যার উপর আধুনিক দখলদারির সুবাদেই। আরো খেয়াল করা দরকার, ভাষা ও ভাববিনিময়ের সমস্যাকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে বিষয়টি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যান্য এস. এফ. রচনায় যেখানে তা নয়, এলিয়েনদের সঙ্গে কথা চালানোরও দরকার হয় না, টেলিপ্যাথিই সুযোগ ক'রে দেয়।

ভার্নের এস. এফ. বিজ্ঞানের ক্ষমতায় ও মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ, আশ্চর্যের সেখানে আশ্চর্য হিসাবেই সমাদর, কিন্তু ওয়েল্‌সের এবং তাঁর পরবর্তী রচয়িতা-দের হাতে পরিশীলিত এস. এফ. সুনির্দিষ্ট দ্বিধা, বিজ্ঞানের রীতি-পদ্ধতির ভিত্তি

নিয়ে, সমাজ ও জীবনের উপরে প্রযুক্তির প্রতিঘাত নিয়ে চিন্তা ও মননের অবকাশ দেয়।

ওয়েল্‌সের গড়া টাইম মেশিন, ভিন্নগ্রহীদের সঙ্গে যুদ্ধ (প্রত্যক্ষ এবং বায়োলজিকাল), অদৃশ্য মানুষ ইত্যাদি কালক্রমে এস. এফ.-এর বাঁধাধরা বহু ব্যবহৃত উপকরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যোগ্য হাতে 'ক্লিশে'-তে পরিণত টাইম মেশিন যে আজো তার উপযোগিতা হারায় নি, তার নিদর্শন এক দিকে সায়েন্স ফিকশনের বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত করে আর অন্য দিকে সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই সন্ধান নিতে নির্দেশ দেয় তার সার্থকতার।

কারেল চাপেক

ওয়েল্‌সের পরে ও দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী পর্বের অন্তর্ভুক্ত এস. এফ.-এর তথাকথিত 'গোল্ডেন এজ' ও মার্কিনিয়ানার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত। ডেভিড লিণ্ডসের 'এ ভয়েজ টু আর্কটুরাস' (১৯২০) এবং ওলাফ স্টেপ্‌লডনের 'স্টার মেকার' (১৯৩৭) ইত্যাদি অত্যন্ত গম্ভীর মেজাজের ও তাৎপর্যময় সায়েন্স ফিকশন রচিত হয়েছে এই পর্বে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে দুর্লভ এই সব গ্রন্থ এবং যে-কোনো দুর্লভ গ্রন্থের আলোচনার পূর্ব শর্ত রূপে কাহিনীর সারসংক্ষেপ ও কাঠামো পেশ করার পরিসর এই প্রবন্ধে নেই।

এই পর্বের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাই কারেল চাপেককেই শুধু উপস্থিত করা হচ্ছে। তবে তার আগে আরেকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৮৮৮-তে এডওয়ার্ড বেলামি-র 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড, ২০০০-১৮৮৭' নামে উপন্যাসে ইউটোপিয়ার বৈজ্ঞানিক প্রগতিতে আস্থা রেখেই রচিত হয়েছিল ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক সমাজ। ১৯০৭-এ জ্যাক লণ্ডনের 'আয়রন হিল' প্রোলিতেরিয়ান বিপ্লবের সম্মুখীন এক ভবিষ্যতের ফ্যাসিবাদী আমেরিকাকে উপস্থিত করেছিল। কিন্তু ১৯১৮-র রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিজমের বিরোধিতা থেকে জন্ম নিল ভিন্ন জাতের ডিস্‌টোপিয়া। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই এই প্রোপাগাণ্ডার সমর্থনে রচিত হল প্রযুক্তির অপব্যবহারের কালো ছবি জামিয়াতিনের 'উই' (১৯২০) গ্রন্থে। সায়েন্স ফিকশনের কিছু বৈশিষ্ট্য সংবলিত হলেও বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রের ইউটোপিয়া-কে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে।

১৯২২-এর ৯ অক্টোবর কারেল চাপেকের নাটক R. U. R. নিউ ইয়র্কে প্রথম মঞ্চস্থ হওয়ার পর 'নিউ ইয়র্ক আমেরিকান' লিখেছিল, 'বার্নাড শ' সম্ভবত R.U.R. লেখেন নি, কিন্তু সম্ভবত লিখবেন। শ'-এর লেখা R.U.R.-এর

একটি পাঠান্তর আমরা পাব এবং তখন কাল রাতে যাকে আমরা অত্যন্ত উপভোগ্য ও উদ্দীপ্ত কল্পনার ফ্যান্টাসি হিসাবে গ্রহণ করেছি তা পরিণত হবে একটি নীরস তিক্ত সমালোচনায়। কারণ R. U. R. শেভিয়ান হলেও মনোরঞ্জক।'[১০] নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক চেকোস্লোভাকিয়ার কারেল চাপেক-এর (১৮৯০-১৯৩৮) পূর্বোক্ত R.U.R. নাটকটি আসলে Rossums Universal Robots-এর আদ্যক্ষর সংগ্রহ। মূল নাটকটি পড়ার সৌভাগ্য না হোক, 'রোবট' শব্দটির স্রষ্টিকর্তা হিসাবে চাপেকের নাম সুবিদিত। সায়েন্স ফিকশনের দুনিয়ায় রোবট আজ অবধি বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ একটি অত্যন্ত উপযোগী ও সফল অভিনেতা। বর্তমানে যান্ত্রিক চেহারাবিশিষ্ট কৃত্রিম জীবকে সাধারণত 'রোবট' আখ্যা দেওয়া হয়, আর মানুষের দেহধারীকে 'হিউম্যানয়েড'। কিন্তু মূলে সেই চাপেকেরই 'রোবট'। শুধু তাই নয়, আধুনিক আখ্যা অনুসারে চাপেকের রোবটকে 'হিউম্যানয়েড'-ই বলা উচিত। কারণ, দেখতে তারা মানুষের মতোই ছিল।

অজস্র অবিকল উৎপাদনের (ইণ্টারচেঞ্জেব্‌ল মাস্‌ প্রোডাকশন) যুগে পণ্য-নির্মাতারা রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম মানুষ উৎপাদন শুরু করে R. U. R.-এ। গৃহভৃত্যের কাজ করার উপযোগী ও খুব শস্তা দামের এই রোবটদের কিছুকাল পরেই অপব্যবহার করা হয় – নিযুক্ত করা হয় সৈন্যরূপে। প্রথমে বাধ্য ক্রীতদাস ছিল তারা, কিন্তু একজন রাসায়নিক উৎপাদনের একটি ফর্মুলা পরিবর্তন করার পর তাদের মনে সঞ্চারিত হয় আবেগ এবং স্বাধীনতা অর্জনের বাসনা। রোবটদের মুক্তি আন্দোলনের পরিণতি ঘটে এক বিদ্রোহে, যার ফলে মানব-জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে অযৌন রোবটদের মধ্যে একটি আদম ও একটি ইভের আবির্ভাব নির্দেশ করে যে এই প্রজাতি অবলুপ্ত হবে না।

R. U. R. ব্যতীত আরো একটি এস. এফ. নাটক 'দা ইন্‌সেক্ট প্লে' (১৯২১) ও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'দা অ্যাবসোলিউট অ্যাট লার্জ' (১৯২২), 'কারাক্রিট' (১৯২৪) এবং 'ওয়ার উইথ দা নিউট্‌স' (১৯৩৬) রচনা করেছিলেন চাপেক। তাঁর সেরা কীর্তি অবশ্য শেষোক্ত উপন্যাসটি। একাধারে হাস্যমধুর ও আশংকার শিহরনময় এই রাজনৈতিক ব্যঙ্গদীপ্ত উপন্যাস সায়েন্স ফিকশনের স্বাধিকারের ক্ষেত্র ও তার সিদ্ধির একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থটি। প্রথম খণ্ডে মুক্তা-সন্ধানী এক জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রাচ্যের একটি দ্বীপের সামুদ্রিক সরোবরে নিউট্‌ নামক জলচরদের একটি প্রজাতির সন্ধান পায়। আকারে তারা মানুষের চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট। জলে বাস করলেও মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য তারা ডাঙায় বাস করতে পারে। ক্যাপ্টেনের ধারণা হয় এদের মানুষের মতো কথা বলতে এবং যন্ত্রাংশ বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে শেখানো সম্ভব। ক্যাপ্টেন চেক ব্যবসায়ী-সম্রাট বণ্ডিকে উৎসাহিত করে

নিউট্‌দের উন্নয়নে বিনিয়োগের জন্য। যাতে প্রথমে মুক্তা-সংগ্রহের ও পরে অন্য কাজেও ব্যবহার করা যায় তাদের। হাঙরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অস্ত্রলাভ মাত্র নিউট্‌রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি শুরু করে এবং দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ছড়িয়ে পড়ে তারা। মানুষ ব্যাপারীরা তখন তাদের শিকার গ্রেপ্তার ও কেনা-বেচা আরম্ভ করে। নিউট্‌রা মানুষের অফুরন্ত এক ক্রীতদাস-শ্রমশক্তির ভাণ্ডারে পরিণত হয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নিউট্‌দের বিশ্বজোড়া শোষণ বঞ্চনার কাহিনী। পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্র ও নদীতটে তাদের আমদানি করা হয়, ব্যবহার করা হয় সম্ভাব্য সকল উদ্দেশ্যে। চিড়িয়াখানায় ভরা হয়, ব্যবচ্ছেদ-সমেত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তুতে পরিণত করা হয় এবং শেষে মানবতাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠির খপ্পরেও পড়ে। তারা নিউট্‌দের বস্ত্র ভূষিত করে, তাদের নাগরিক অধিকার প্রদান করে এবং বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষা দেয়। এই খণ্ডের অন্তিম পর্বে দেখা যায় নিউট্‌রা বৈজ্ঞানিক সমাবেশে গবেষণা পত্র পাঠ করছে এবং নিজ নিজ ধর্মে মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে। বিশ্বের উন্নত যাবতীয় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তখন তাদের উপর নির্ভরশীল এবং নিউট্‌রাও বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র-সমেত প্রভূত পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করেছে।

তৃতীয় খণ্ডে নিউট্‌রা যুদ্ধ জারি করে মানুষের বিরুদ্ধে। তাদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলের সম্প্রসারণের দাবিতে। প্রজননের জন্য তাদের তটভূমি প্রয়োজন এবং সেই অনুসারে পৃথিবীর কন্টিনেণ্টাল ভূভাগকে তারা নতুনভাবে সজ্জিত করায় পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে তটভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। বোঝা যায় আমাদের পরিচিত বহু দেশের অস্তিত্ব নির্মূল হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে। নিউট্‌দের প্রতিহত করার কি কোনো উপায় নেই? উপন্যাসের এই অংশে, শেষ অধ্যায়ে লেখকের 'অন্তর কণ্ঠ' ধ্বনিত হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি মারফত রিপোর্ট-ধর্মী একটি স্টাইলে আখ্যান রচিত হয়েছিল। লেখক এইসব নথির সংকলকের অতিরিক্ত কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। 'অন্তর কণ্ঠ'-র সঙ্গে লেখকের আলোচনাসূত্রে বেরিয়ে আসে আশাপ্রদ (?) উপলব্ধি : নিউট্‌রা মানুষের কাছ থেকে এত শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে লোভ আর উচ্চাশার তাড়নায় পরিণতিতে তারাও নিজেদের মধ্যে আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর

মেরি শেলির কালে বিজ্ঞানের অনৈতিক প্রয়োগের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তলব পড়ত বিজ্ঞানীদের। অসামাজিক অমানবিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ

রোধ করার জন্য তাই খুনে বৈজ্ঞানিকের বিকল্পরূপে উপস্থাপিত আদর্শবাদী বিজ্ঞানীর প্রতিষেধকও ছিল একটা। কিন্তু কালক্রমে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গবেষণাগারের প্রাচীরটিও সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠতে লাগল। বিজ্ঞানের ভাষা ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্যতর প্রাচীন চীনা ব্যাকরণে পরিণত হতে লাগল। অন্যদিকে বিজ্ঞান থেকে জন্ম নিল এক মহাবিজ্ঞান। মহাবিজ্ঞানের রাজ্যে ব্যক্তিগত প্রতিভার স্ফুরণের পক্ষেও তখন অপরিহার্য হয়ে উঠল প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা। গ্যালিলিও-কোপার্নিকাসের যুগে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে যে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম তার সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্ক মহাবিজ্ঞানের। বার্নাল, হ্যাল্‌ডেন, পিয়ের-জোলিও কুরি, পাউলিং প্রমুখের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হবে বর্তমান যুগে নিজস্ব কক্ষে বসে কম্পিউটার বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তোয়াক্কা না ক'রে কোনো নিউটনের আর স্বাধীনভাবে যুগান্তকারী আবিষ্কারের সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির মুহূর্তে বিশেষ ক'রে মহাবিজ্ঞানের উপরোক্ত স্বরূপ আর হৃদয়ঙ্গম না করার কোনো উপায় রইল না। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে কবরস্থ হল বিজ্ঞানের যাবতীয় অবশিষ্ট 'মিথ্‌'। এবং জড়কে শক্তিতে পরিণত করার অনিয়ন্ত্রিত সাফল্যের সেই অসভ্য আলোকে নিজের শক্তিমত্তা নন ক'রে উপলব্ধি করল সায়েন্স ফিকশন। সহজবোধ্য ভাষায় সায়েন্স ফিকশন ফলাফল ও পরিণতির বিচারে সাধারণ মানুষকেও দুর্জ্ঞেয় বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ সমালোচনার অধিকার প্রদান করল। একই সঙ্গে সায়েন্স ফিকশন শুধু সাহিত্যাভিলাষী বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের একচেটিয়া চারণক্ষেত্র রইল না।

ঘরানা রূপে সায়েন্স ফিকশন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালেই প্রথম সিরিয়াস সাহিত্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে শেলি, ওয়েল্‌স বা চাপেক্ প্রমুখ সাহিত্যের মূলধারার মধ্যেই যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, যার গায়ে গার্নসব্যাক ও তাঁর অনুগামীরা প্রথম 'এস. এফ.' তক্‌মা লাগিয়েছিল, সেই রচনাগুলি নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল পারমাণবিক যুগে। এস. এফ.-এর ঐতিহ্য সন্ধানের ক্ষেত্রে এই পারমাণবিক যুগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রোমাঞ্চকর গথিক নভেলের কুলে জন্মেও 'ফ্র্যাংকেনস্টাইন' বিজ্ঞান-চর্চার নৈতিকতার প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টির বলে স্বতন্ত্র হতে পেরেছিল। আর উত্তর-পারমাণবিক যুগে তেজস্ক্রিয়তার বলি-স্বরূপ (মিউটেশন-ঘটিত) যে অসহায় ও করুণ সব দানবের জন্ম বা ক্লোনিঙের আশ্রয়ে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ঘাতক প্রাক্তন এস-এস. বাহিনী প্রধানের কোষ বীজ জাত অসংখ্য অবিকল নৃশংস নাজিদের বাহিনী – আধুনিক সায়েন্স ফিকশনের এই সব চরিত্রদের পূর্বপুরুষরূপে ফ্র্যাংকেনস্টাইনের দানবকে নতুনভাবে চিনলাম আমরা। চাপেকের 'রোবট'

ও 'নিউট্' বিদ্রোহ বা ওয়েল্‌সের 'টাইম মেশিন' নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে অর্থবহ হয়ে উঠল এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে শুরু করল তারা। সায়েন্স ফিকশনে একই 'থিম্' অথবা 'ফর্ম' বারংবার ব্যবহারেও জীর্ণ না হয়ে বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করে—এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল উত্তর-পারমাণবিক যুগেই।

পারমাণবিক আতংকের জনক বিজ্ঞান তার হৃতসম্মান কিছুটা উদ্ধার করল মহাকাশে পদার্পণ ক'রে। ১৯৫৭-য় ছোট্ট স্পুৎনিকের ব্লিপ ব্লিপ ধ্বনি, চার বছর পরে গ্যাগারিনের চোখ দিয়ে মহাকাশে ভাসমান নীল পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করা, আর ১৯৬৯-এ চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রঙের পদক্ষেপ—এইসব কীর্তির পরে মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্ন হিরোশিমার স্মৃতিকে নির্বাসিত করবে ভাবা গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, মহাকাশযুগের 'মিথ্' বিজ্ঞান নামক দেবতার পবিত্র মন্দির গড়ে তুলবে। সায়েন্স ফিকশনের কল্পিত আতংককে যেমন ম্লান ক'রে দিয়েছিল হিরোশিমার বাস্তব, তেমনই সায়েন্স ফিকশনের স্বপ্নের চেয়েও মোহময় হয়ে উঠবে মহাকাশ অভিযান—এই আশা সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল ১৯৮৬-তে চ্যালেঞ্জারের বিস্ফোরণের সঙ্গে। ওয়াশিংটন থেকে সাংবাদিক ওয়ারেন উন্না চ্যালেঞ্জার ধ্বংসের প্রসঙ্গে লিখলেন: 'a terrifying SF scenario which, alas, was the real thing.'[১৩]

টি. ভি. স্ক্রিনের সম্মুখে উপবিষ্ট আমেরিকার চোখের সামনে স্পেস শাট্‌ল চ্যালেঞ্জার যাত্রা শুরুর পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যে অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। চ্যালেঞ্জারের সাত যাত্রীর মধ্যে ছিলেন প্রথম অসামরিক মহাকাশযাত্রী ইতিহাসের শিক্ষিকা ক্রিস্টা ম্যাক্‌অলিফ। নিউ হ্যাম্পশায়ারে তাঁর নিজস্ব স্কুলের যাবতীয় ছাত্রছাত্রী সহ আমেরিকা ও কানাডার পঁচিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী লাইভ শো দেখছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টি. ভি. যোগে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের কথা তাদের।

নিঃসন্দেহে দুর্ঘটনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বলে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কোনো আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাড়ি দেয় নি চ্যালেঞ্জার। জন্মসূত্রেই সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট এই স্পেসশিপ শক্তির স্থূল আস্ফালনের আর পাবলিসিটির স্বার্থে অকারণ নরমেধ ঘটাল। বস্তুতপক্ষে এই দুর্ঘটনার বহু পূর্বেই মহাকাশ অভিযান তার প্রতিশ্রুত মূল লক্ষ্য, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টি ও প্রাণের রহস্যভেদের পথ ত্যাগ ক'রে তা এক দিকে সামরিক শক্তিমত্তার সূচক হয়ে উঠেছে; আর অন্য দিকে কৃত্রিম স্যাটেলাইটের ব্যবসায় (টি. ভি. অনুষ্ঠান প্রচার ইত্যাদির দৌলতে) 'নিকট মহাকাশ' নামে এক খনি থেকে রত্ন-সঞ্চয়ে আত্মহারা।

চ্যালেঞ্জারের ঘটনা অবশ্য বিবেকবান এস. এফ.-রচয়িতাদের নতুন কোনো

অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মহাশক্তিদের ঠাণ্ডা লড়াই, টেকনোলজির প্রশ্রয়ে একদিকে তৃতীয় বিশ্বে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী অভিযান ও অন্য দিকে 'উন্নত' রাষ্ট্রের বৈভব-মুগ্ধ সামাজিক জীবন – এই সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল লেখকের পক্ষে মহাকাশ-বিজয়ের ক্ষণিক রূপকথায় বিভ্রান্ত হওয়া দুষ্কর। সিরিয়াস সায়েন্স ফিকশন লেখকের পক্ষে বোধহয় দুঃসাধ্যই।

রূপকথা, নীতিকথা, মহাকাব্য, ব্যঙ্গ, কৌতুক, সমালোচনা, আতংক-সঞ্চার, বিশ্লেষণ—নানা পথে বিচিত্র মতে, বিভিন্ন ফর্ম, থিম্ ও সাহিত্যিক প্রকরণের আশ্রয়ে সায়েন্স ফিকশন নামক সাহিত্যের গবেষণাগারে বিভিন্ন কল্পিত পরিস্থিতিতে মানুষ আর মানবিকতাকে বারবার যাচাই করা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে এখানে প্রথমে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রচিত এস. এফ.-এর বৈচিত্র্যের দিকেই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

'সায়েন্স ফিকশনের নব্বই শতাংশই জঞ্জাল।' বলেছিলেন এক সমালোচক। কথাটা সাধারণভাবে 'সাহিত্য'র ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। তবে সায়েন্স ফিকশনের দশ শতাংশের মধ্যেও প্রবল জনপ্রিয় বহু লেখক রয়েছেন যাঁরা প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে জঙ্গি ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ প্রচার করেন। যেমন রবার্ট এ. হাইনলাইন। যাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'সোসাল ডারউইনিস্ট' হিসাবে। এই জাতীয় রচনাকারও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ফ্রাংকেনস্টাইনের রচয়িতা মেরি শেলির খুব স্বল্প পরিচিত আরেকটি উপন্যাস 'দা লাস্ট ম্যান' (১৮২৬)। 'প্লেগ'-এর দুরন্ত প্রকোপে মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ মুছে যাওয়ার এই কাহিনী সমসাময়িক সমালোচকদের কাছে অসুস্থ চিন্তার ও দূষিত রুচির পরিচায়ক মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে জ্যাক লণ্ডনের 'দা স্কার্লেট প্লেগ' (১৯১৫), ওয়েল্‌সের 'ইন দা ডেজ অফ দা কমেট' (১৯০৬), ম্যাথু ফিলিপ্‌স শিল-এর 'দা পার্প্‌ল্ ক্লাউড' (১৯০১) ইত্যাদি উপন্যাসে বারবার বিভিন্ন প্রলয়ে মানবজাতির বিলুপ্তিকে ঘিরে কল্প-কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু ১৯৪৫-এর ৮ অগাস্ট-এর পর এই প্রলয়ের সাহিত্য, পৃথিবীর শেষ মানবের কাহিনী যেমন নতুন তাৎপর্য পেল তেমনই জন ক্রিস্টোফার-এর 'দা ডেথ অফ গ্রাস' (১৯৫৬) বা জন ওয়াইণ্ডহ্যামের 'দা ডে অফ দা ট্রিফিড্‌স' (১৯৫১)-এর প্রলয়ের কারণ যাই ঘোষিত হোক তার মর্ম অনুধাবনে কোনোই বাধা ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পারমাণবিক আতংক-প্রসূত সৃষ্টি, যেমন নেভিল শুট-এর 'অন্ দা বিচ্' (১৯৫৭) ইত্যাদি সায়েন্স ফিকশন সাহিত্যের চেয়ে চলচ্চিত্রকেই তার প্রধান বাহন হিসাবে লাভ করেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরবর্তী দুনিয়ায় সায়েন্স ফিকশন একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিল। এস. এফ.-এর নিহিত সম্ভাবনা প্রকট হল মানুষের ব্যক্তিগত জগতে, তার মনোজগতে অবগাহনের সুবাদে। ব্যক্তিমানসের উপর দ্রুত, অতি দ্রুত

পরিবর্তনশীল এই জগতের প্রতিক্রিয়ার খতিয়ান নেওয়ার কাজে সায়েন্স ফিকশনের কিছু নিজস্ব পদ্ধতির উপযোগিতা সম্বন্ধে দ্বিমত রইল না। শুধু ভিন্ন স্থান ও কালের দৃষ্টিকোণে হাই-টেক্ দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শীতল প্রস্তুতির বিকল্প অতিরঞ্জিত চিত্র নয়। শুধু 'মেসেজ' হিসাবে নয়, এই আতংকিত যুগের 'প্রোডাক্ট' রূপেও এস. এফ. পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যের যত গহনে পাড়ি দিতে লাগল, ততই চেনা পৃথিবীকে আর পরিচিত ব্যক্তি মানসকে বারংবার পরখ আর আবিষ্কার করতে লাগল নতুন দৃষ্টিতে। অপার্থিব বুদ্ধিমানদের সঙ্গে স্বদেশের বা নেই-দেশের সাক্ষাৎকারের পর তাদের সম্বন্ধে সংগৃহীত অভিনব তথ্যের চেয়ে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থিবদের মনঃসমীক্ষণ।

ফ্রেডারিক পোল এবং সি. এম. কর্নব্লুথ রচিত 'দা স্পেস মার্চেন্ট' (১৯৫৩) উপন্যাস আধুনিক মূল্যবোধ নিয়ে উদ্দাম কৌতুক আর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। বিজ্ঞাপন এই কল্পিত জগতের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচার-মাধ্যম নিজেদের পণ্যের বিক্রি বাড়াতে যেখানে নির্দয়ভাবে গণ-মগজ ধোলাইয়ের সব রকম কৌশল প্রয়োগ করে অভ্যাস-সৃষ্টির জন্য। হালকা চালে লেখা এই সামাজিক সমালোচনামূলক গ্রন্থটির যেমন দংশন তেমনই আবেদন।

ওয়াল্টার মিলার-এর সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের 'এ ক্যান্টিকল ফর লাইবোউইৎজ্' (১৯৫৯)-এর কাহিনী শুরু হচ্ছে একটি পারমাণবিক ধ্বংসকাণ্ডের পরে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে মূল্যবোধ-রহিত বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে সেখানে।

ছয়ের দশকের যাঁরা সায়েন্স ফিকশন রচয়িতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁদের মধ্যে আমেরিকার ফিলিপ কে. ডিক্ ও উরসুলা কে. লেগুঁই (LeGuin, এবং ইংলণ্ডের জন বানার ও ডি. জি. কম্পটন উল্লেখযোগ্য। ডিক্ সম্বন্ধে ১৯৬৯-এ টাইম্স লিটেরারি সাপ্লিমেণ্ট লিখেছিল[৫] :

> Of all SF writers prolific Mr. Dick has proved to take all the somewhat shopsoiled props—spaceship, mutants, robots, nuclear bombs, drugs, plane, colonization—and create something of a poetic significance for them.

আসলে ডিক্ প্রচলিত এস. এফ.-এর কথনশৈলির ও সামাজিক মূল্য নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তাঁর এস. এফ.-রচনায়। এস. এফ.-এর গৎ ব্যবহার করেই এস. এফ.-কে সমালোচনা।

ডিকের উপন্যাস 'দা ম্যান ইন দা হাই ক্যাসেল'-এর চরিত্ররা এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাস্ত। বিজয়ী জার্মান ও জাপানিরা বিভক্ত আমেরিকাকে শাসন করছে। এই সাহিত্য-জগৎ অবশ্য ঠিক আমাদের

'বাস্তব'-এর মতো নয়। একই সঙ্গে একাধিক সময়স্রোত ও বাস্তবতা নিয়ে এই জটিল ও মননশীল উপন্যাসের আখ্যান বর্ণনা ক'রে তার স্বাদ সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। তবে ডিকের কল্পনা থেকে জারিত চরিত্র ও পরিস্থিতি উপন্যাসটির সজীবতার অন্যতম কারণ। জাপানিরা যেখানে কোল্ট রিভলভার, মিকি মাউস ঘড়ি ইত্যাদি মার্কিন অ্যান্টিক সংগ্রহ করে, আমেরিকানরা জাপানিদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠান আয়ত্ত করতে ব্যস্ত, আর জার্মানরা তখনো হিটলারের আদর্শ অনুসরণ করছে, কিন্তু জাপানিরা হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিপক্ষ।

ডিক্-এর আরেকটি উপন্যাস 'ইউবিক' (Ubik)-এ মর্গে সুরক্ষিত কয়েকটি জীবন্মৃত মানুষের মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করতে শুরু করে। 'এলিয়েনেশন', 'এক্সিসটেন্‌শিয়ালিজম' ইত্যাদি প্রসঙ্গ ডিকের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই উত্থাপিত হয়। সম্ভবত ডিক্ তাঁর সেরা স্বীকৃতি পেয়েছেন পোলিশ সাহিত্যিক স্তানিসোয়াভ লেম্-এর কাছ থেকে। 'সায়েন্স ফিক্‌শন স্টাডিজ' পত্রে (মার্চ, ১৯৭৫) 'এ ভিশনারি অ্যামং শার্লাটান্' শীর্ষকে লেম্-এর রচনাটি প্রকাশিত হয়[৫] :

> Dick subjects ordinary people to tests under terrible pressure and in his fantastic experiment. Only the psychology of characters remain non-fantastic ; he sacrifices order and convention for the sake of vision leading to the same difficulty about genre replacement that we meet within the writings of Kafka.

ইংলণ্ডের জন ব্রানার দু'টি উপন্যাসের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'স্ট্যাণ্ড অন জানজিবার' (১৯৬৮) ও 'দা শিপ লুক্ আপ (১৯৭২)। 'জানা' বলতে এখন আমরা যা বুঝি তা তো আসলে টুকরো টুকরো ভাবে সংগ্রহ করা হয় স্কুলের শিক্ষা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টি. ভি.-র খবর বা প্রচার ইত্যাদি থেকেই। এর থেকেই একটা ছাঁচ গড়ে ওঠে আমাদের মনে যার থেকে বিংশ শতাব্দীর বিভ্রান্তিকর পরিবর্তনশীল পরিবেশে মানুষ তার অবস্থান নির্দিষ্ট করে। ঠিক এই টেক্‌নিকেই রচনা করেছেন ব্রানার তাঁর উপন্যাস। ব্রানারের দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সভ্য পরিবেশ দূষণের প্রাথমিক কুফল লাভ করতে শুরু করেছে। শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় এমন কোনো দূর ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন নয়। বিক্ষিপ্তভাবে স্থানবিশেষে যা ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে বা এখন ঘটছে তাকেই সামান্য প্রসারিত ক'রে লেখক সাবধান করতে চেয়েছেন।

ব্রানারেরই প্রায় সমসাময়িক আরেক ব্রিটিশ লেখক ডি. জি. কম্পটন-এর তিনটি উপন্যাস, 'ফেয়ারওয়েল আর্থস্ ব্লিস্' (১৯৬৬), 'সিন্‌থাজয়' (১৯৬৮) এবং বিশেষ ক'রে 'দা আন্‌স্লিপিং আই' (১৯৭৪) চূড়ান্ত সামাজিক ও মানসিক

চাপের মধ্যে মানস-জীবনকে অধ্যয়ন করেছে বিরল দক্ষতায়। শেষোক্ত উপন্যাস এমন একটি সমাজের কাহিনী যেখানে নাগরিকরা সবাই সুখী, প্রত্যেকের জীবন পুরোপুরি সুরক্ষিত। তবু ব্যক্তিজীবনে উত্তেজনার প্রয়োজন থেকেই যায় এবং টি.ভি. সেখানে সেই প্রয়োজন মেটায়। এক মহিলা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর কাহিনী শুরু হয়। তারপরেই একজন সাংবাদিকের চোখে একটি অস্ত্রোপচার করা হয় যাতে দর্শন সূত্রে তার যাবতীয় অনুভব সরাসরি প্রেরণ করা যায় টি. ভি. স্টুডিও-য়। এই সাংবাদিকের অসুস্থ মহিলাটিকে অনুসরণ, তাঁর বিশ্বাস অর্জন এবং এই মহিলার ব্যক্তিগত জীবনকে পর্যবেক্ষণ—এ সবই সম্প্রচারিত হয়। উত্তেজনার খোরাক যোগাতে মানুষের নিতান্ত ব্যক্তিগত যন্ত্রণার মধ্যেও গোপনে অভিসার চলে।

১৯৬৪-তে মাইকেল মুরকক্ ইংলণ্ডের 'নিউ ওয়ার্লডস' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর সায়েন্স ফিকশনের রাজ্যে একটি নতুন আন্দোলন জন্ম নেয়। মূলত সাহিত্য সচেতনতার আন্দোলন। এই আন্দোলনের আদি প্রবক্তা জে. জি. ব্যালার্ড। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন (লেখকদের), এস. এফ ভবিষ্যতের সূত্র ধরে ঠিকই, কিন্তু চিন্তা তার বর্তমানকে নিয়েই। প্রচলিত সাহিত্যকে (মেইন স্ট্রিম-কে) তিনি আখ্যা দিলেন 'রেট্রোস্পেকটিভ ফিকশন', আর এস. এফ.-কে বিশিষ্ট করলেন 'প্রস্পেক্টিভ' হিসাবে। ফলে শুধু নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, অধীত বিষয়ের অভিনবত্বও নয়, এস. এফ.-এর আখ্যানরচনা শৈলিরও স্বতন্ত্র একটি দাবির কথা উঠল। ব্যালার্ড মনে করেন গদ্য সাহিত্যে সুরিয়া-লিজ্মের সেরা বাহন এস. এফ.। ঘন প্রতীকী দুনিয়া, বহু কাল-স্রোত, বিকল্প বিশ্ব, মরুভূমি, সমুদ্র আর স্ফটিকের প্রতিমা, মনোবিশ্লেষণ ও ভাষার প্রতি আকর্ষণ চিহ্নিত করে 'নিউ ওয়েভ'-এর লেখকদের। আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে 'নিউ ওয়েভ'-পন্থীদের। তাঁরা কোকিলের পন্থায় অন্যের বাসায় সাহিত্য প্রসব করার পরীক্ষা চালিয়েছেন। জেম্স জয়েস বা রোব্ গ্রিয়ে প্রমুখের বিশিষ্ট স্টাইল অনুসরণই নয়, খোদ এস. এফ.-সাহিত্যের প্যারডি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত তাঁরা। এই 'মেটা—এস. এফ.-এর দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি।

মার্কিন লেখক নর্মান স্পিনার্ড 'দা আয়রন ড্রিম' (১৯৭২) নামক উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাস পেশ করেন। দ্বিতীয় উপন্যাসটি হল জনৈক অ্যাডলফ হিটলার রচিত ও ১৯৫২-য় 'হিউগো' পুরস্কার প্রাপ্ত * 'দা লর্ড অফ দা স্বস্তিকা'। এই লেখক রূপী হিটলারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তার রচনার পর একটি পরিশিষ্ট সংবলিত স্পিনার্ডের এই উপন্যাসে আমরা দেখি ইতিহাসের সামান্য একটু বিচ্যুতির ফলে এস. এফ. লেখক হিটলার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রবাসী হয়েছে

---

* এস. এফ. সাহিত্য পুরস্কারের মধ্যে 'হিউগো' অন্যতম। এ ছাড়া আছে 'নেবুলা অ্যাওয়ার্ড'।

আমেরিকায়, যদিও তার রচিত উপন্যাসের নায়ককে নাজি হিসাবে চিনতে অসুবিধা হয় না। এই নাজি-নায়ক পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর তেজস্ক্রিয়তার যত বলি, পঙ্গু বিকৃতদের নিয়ে গড়ে তোলে 'বিশুদ্ধ' নাগরিকদের এক ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। স্পিনার্ড এই উপন্যাসে চটুল জনপ্রিয় সায়েন্স ফিকশনের ফ্যাসিস্ট ও মিলিটারি প্রবণতাকে অনুকরণ সূত্রেই তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন।

ফিলিপ জোসে ফার্মার প্রধানত এস.এফ.-এ যৌনতার প্রসঙ্গ অবতারণার কারণেই একটি বিতর্কিত নাম। এ-কথা অনাস্বীকার্য যে 'সায়েন্স ফিকশনে কেন যৌনতা নেই?' বা 'সায়েন্স ফিকশনে কি পর্নোগ্রাফি লেখা সম্ভব?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করার জন্যই সচেতনভাবে ফার্মার এই স্বল্প-ব্যবহৃত রাস্তায় পরিক্রমাকে অভিনবত্ব ও জনপ্রিয়তা উভয়ই অর্জনের পক্ষে সেরা বিবেচনা করেছিলেন। (তাঁর 'ফ্লেশ' (১৯৬০) উপন্যাসের সিগনেট সংস্করণের প্রচ্ছদে উল্লিখিত হয়েছিল : 'New Earth – where lust is religion, and love is a violent public spectacle! A startling experience in science fiction!')। কিন্তু তাঁর এস. এফ. রচনা বিতর্কিত হয়েও যৌন-উত্তেজক রূপে সাফল্য অর্জন করে নি। ফার্মার-এর 'লর্ড টাইগার' (Lord Tyger) এর সার্থকতা ঐ গতে-বাঁধা এস. এফ.-এর প্যারডি রচনারই সূত্রে। ১৯৭০-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে এডগার রাইস বারোস্-এর এক গোঁড়া ভক্ত বাস্তবে টারজানের গল্পটিকে নকল করতে চেয়েছিল। প্রথম পরীক্ষায় ইংলণ্ডের এক লর্ডের পুত্রকে অপহরণ ক'রে বাঁদরের হাতে সমর্পণ করা হয়। সে কিন্তু কোনো ভাষাই শিখতে পারে না শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরীক্ষায় আরেক লর্ড-পুত্রকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। কপট বাঁদর রূপে সার্কাসের বামনরা প্রতিপালিত করে তাকে। এই দ্বিতীয় টারজান কি ভাবে সারা জঙ্গলের যৌন-যন্ত্রণা হয়ে উঠল তারই এক প্রমত্ত কাহিনী এই উপন্যাস।

'নিউ ওয়েভ' মুভমেন্টের পাশাপাশি 'ফেমিনিস্ট মুভমেণ্ট'-এর র‍্যাডিকাল সমাজ-সচেতন অংশ সায়েন্স ফিকশন-কে তাঁদের অন্যতম বাহন সাব্যস্ত করেছেন। ইংলণ্ডের উইমেন্স্ প্রেস থেকে একটি সায়েন্স ফিকশন সিরিজে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বহুদূর আর ভবিষ্যৎ থেকে এখন ও এখানের এই সব রচনায় নারীজীবনের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচিত – আক্রান্ত নারীসমাজ, ক্ষমতাসীন মহিলা, একক মহিলা বা যূথবদ্ধ মহিলা। 'ফেমিনিস্ট' লেখিকাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি জোয়ানা রাস্ (জন্ম ১৯৩৭)। 'দা ফিমেল ম্যান' উপন্যাস বা 'এক্সট্রা (অর্ডিনারি) পিপ্‌ল' গল্পগ্রন্থ বিষয়ের গুরুত্ব ছাড়াও সমৃদ্ধ ভাষা ও বলিষ্ঠ গদ্যের গুণেও বিশিষ্ট। ১৯৮৪-তে প্রকাশিত ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা সুজেট হ্যাডেন এল্‌গিন-এর 'নেটিভ টাঙ্' (Native Tongue) একটি অভিনব কীর্তি। ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে পুরুষরা সর্বশক্তিমান, নারী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ

এবং ভিন্‌গ্রহের সভ্যতার সঙ্গে তখন সংযোগ সাধিত হয়েছে। নক্ষত্রলোকে উপনিবেশ বিস্তারের এই যুগে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা এলিয়েনদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর দায়িত্ব লাভ করার সূত্রে অর্জন করেছে প্রভূত ক্ষমতা। বংশ পরম্পরায় প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছে তারা। লেখিকা এই উপন্যাসে এমন একটি সমাজ তৈরি করেছেন যেখানে আন্তঃনাক্ষত্রিক বাণিজ্য ভাষা-শিক্ষাকে একটি মূল্যবান পণ্যে পরিণত করেছে। এরই বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একটি নারী গোষ্ঠি লাডেন্‌ নামে নিজেদের মধ্যে একটি গুপ্ত ভাষা বিকশিত ক'রে সংগঠিত করছে প্রতিরোধ। ভাষা-অস্ত্রকে তারাও ব্যবহার করতে পারে মুক্তি অর্জনের স্বার্থে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সায়েন্স ফিকশনের বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে খুবই বিবর্ণ আইজ্যাক অ্যাসিমভ ও আর্থার সি. ক্লার্ক-এর সৃজনধর্মী রচনা। কিন্তু প্রচার-মাধ্যম ও পণ্য-বিক্রেতা সমাজের মধ্যে কোনো গূঢ় সাধারণ স্বার্থরক্ষার সুবাদেই নিশ্চয় এই দুই লেখকের রচনা ছাড়া বিদেশী সায়েন্স ফিকশন বর্তমানে কলকাতায় অন্তত রীতিমতো দুষ্প্রাপ্য। সাধারণভাবে এই দুই লেখকের সাহিত্যকর্মে সমকালীন বিশ্বের কোনো সমস্যার আঁচ পড়ে নি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর অন্ধ আস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁরা ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা ক'রে রোমান্সের জাল বুনেছেন। বিজ্ঞান ও মিস্টিসিজম জড়িয়ে এক ধরনের ছদ্ম-দার্শনিকতারও ভাণ আছে ক্লার্কের রচনায়। অন্য দিকে অ্যাসিমভ গার্নসব্যাক-মার্কা স্পেস অ্যাডভেঞ্চার রচনা করেছেন। রোবট-কাহিনী রচনায় অ্যাসিমভের সাফল্য আসলে এক ধরনের ধাঁধা জাতীয় খেলা নির্মাণের কুশলতা-নির্ভর। প্রত্যেক রোবটের অবশ্য পালনীয় তিনটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন তিনি। তারপর তারই ফাঁক-ফোকর দিয়ে কত রকম পরিস্থিতি ও সমস্যা সৃষ্টি ও সমাধান করা যায় তার পরীক্ষা চালানো হয় গল্পে। গল্পের কাঠামো নির্দিষ্ট ক'রে দিয়ে তারপর রচনা দাঁড় করানোয় সিদ্ধহস্ত অ্যাসিমভ অনেক বেশি সফল গোয়েন্দা কাহিনীকার হিসাবে। অবশ্য দুই লেখকেরই জনপ্রিয়তার স্বতন্ত্র কিছু কারণ আছে। দু'জনেই 'পপুলার সায়েন্স' রচনায় কৃতী।

রে ব্র্যাডবেরি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে সায়েন্স ফিকশন এলাকার বাইরে সর্বাধিক পরিচিত ও সম্মানিত এস. এফ.-রচয়িতা রে ব্র্যাডবেরি। আমেরিকার ইলিনয়েসের Waukegan-এ তাঁর জন্ম ১৯২০-র ২২ অগাস্ট। 'বিশ্বের সেরা' নামধারী 'ভৌতিক', 'রোমাঞ্চ', 'রহস্য', 'ফ্যান্টাসি' ও 'সায়েন্স ফিকশন' গল্পের যে-কোনো সুপ্রচলিত সংকলনেই ব্র্যাডবেরি অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, সেরা আমেরিকান গল্পের বহু সংকলনেও ব্র্যাডবেরি উপস্থিত। 'ও.

হেনরি মেমোরিয়ল' পুরস্কারও পেয়েছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার এক সমালোচক লিখেছেন যে ইংরেজি ভাষার অধুনিক এস. এফ.-রচয়িতাদের মধ্যে রাশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্র্যাডবেরি। 'ব্র্যাডবেরি মার্কিন মুলুকের বিবেক।'

গথিক আতংক কাহিনীই লিখুন, অথবা সায়েন্স ফিকশনই লিখুন, লেখকের নিজস্ব ছোঁয়া ও মেজাজের দীপ্তি তাকে ব্র্যাডবেরির নিজস্ব চরিত্রের ছাপে চিহ্নিত ক'রে রাখে। শুধু তাই নয়, ব্র্যাডবেরির উপন্যাস বা গল্পের মধ্যে 'রোমাঞ্চ', 'অপ্রাকৃত' ও 'সায়েন্স ফিকশন' এমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যে সমালোচকরা তাকে কোন নামে ডাকবেন, কোন সংজ্ঞার ভিত্তিতে কি আখ্যা দেবেন নির্ধারণ করতে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

'An extreme elegiac sentiment and gentle fantasy, touched with the eerie and uncanny. It is a special preserve, very much his own…' ব্র্যাডবেরি সম্পর্কে দুই সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য[৮]। ব্র্যাডবেরির দুনিয়া রুক্ষতা, আতংক, অতিপ্রাকৃত ও রোমাঞ্চকর ঘটনার উপর পরিব্যাপ্ত ভাষা ও স্টাইলের প্রসাদে বোনা কাব্যময় কুয়াশা। পরিবেশিত ঘটনা বা চিন্তার সঙ্গে পরিবেশনের ভঙ্গির এই দ্বান্দ্বিকতা তাঁর রচনাকে আন্দোলিত করে আশা আর হতাশার মধ্যে।

বিজ্ঞানের ভাষা আন্তর্জাতিক হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের সাধারণ চরিত্র অনুসারে সায়েন্স ফিকশনেরও জন্ম ও পুষ্টি নিজের দেশের জল মাটি আর হাওয়াতেই। ইয়াংকি সভ্যতার নয়, আমেরিকাবাসীর দেশ যে আমেরিকা, তার এবং বিশেষ ক'রে নিজের প্রাদেশিক জন্মভূমিরই স্বাদ আর গন্ধে ভরা ব্র্যাডবেরি।

১৯৫০-এ প্রকাশিত হয় ব্র্যাডবেরির উপন্যাস 'দা মার্শিয়ান ক্রনিক্‌লস'। 'টুমরো' পত্রিকার সমালোচনায় ক্রিস্টোফার ইশারউড আত্মহারা প্রশংসা করেন, 'the sheer lift and power of a truly original imagination'-এর। ব্যাডবেরিকে 'আবিষ্কার' করার জন্য গর্বিত বোধ করেন তিনি। ইশারউডের এই সমালোচনা সূত্রেই ব্র্যাডবেরি প্রথম জাতীয় স্বীকৃতি অর্জন করেন।[৫] চারের দশকে লেখা কিছু ছোট গল্পের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ক'রে রচিত এই উপন্যাসটি প্রথমে প্রকাশিত হয় 'দা সিল্‌ভার লোকাস্টস' (১৯৫০) নামে।

মঙ্গলগ্রহে মানুষদের হানা দেওয়ার এই উপাখ্যান শুরু হচ্ছে ১৯৯৯-এর অগাস্ট মাসে একটি গ্রীষ্মের রাতে। অদ্ভুত সব চিন্তা অকস্মাৎ উদিত হল মঙ্গল-বাসীদের মধ্যে। সম্পূর্ণ পরদেশী এক ভাষায়—ইংরেজিতে—মঙ্গলবাসী এক মহিলা নিজের অজান্তে হঠাৎ আবৃত্তি করলেন: 'She walks in beauty, like the night / of cloudless climes and starry skies…' সারা গ্রহ জুড়েই সে রাতে শিশু, মহিলা ও পুরুষরা এইরকম অপরিচিত ভাষায় কবিতা,

ছড়া বা সংলাপ ইত্যাদি উচ্চারণ ক'রে স্বয়ং নিজেরা স্তম্ভিত হচ্ছিল। একটা অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে তারই অবশ্যম্ভাবী ইংগিত, কারণ এই গ্রহের বাসিন্দারা টেলিপ্যাথি শক্তিধর। মানুষ সশরীরে আবির্ভূত হওয়ার আগেই তাদের চিন্তাজগৎ মঙ্গলবাসীদের মনে হানা দিয়েছে।

এই উপন্যাসে প্রযুক্তিগতভাবে মঙ্গল কতখানি অগ্রসর সেটা খুব স্পষ্ট নয়। কিছুটা প্রাচীন গ্রীকদের মতো মার্বেল অ্যাম্ফিথিয়েটারে তারা কনসার্টের আসর বসায়, তাদের সন্তানরা খেলা করে মশাল-প্রজ্বলিত পথে পথে। আবার খাল দিয়ে 'ব্রোঞ্জের ফুলের মতো পেলব' নৌকার চলাচল আর রুপালি নীরব লাভা-র বুদবুদ-ওঠা টেবিলে রান্নার কাজ সারার উল্লেখও রয়েছে। কিন্তু মনে হয় মঙ্গল-বাসীরা সচেতনভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে সমাজে কলকব্জাকে একটি বিনীত ভূমিকা অর্পণ করেছে। যন্ত্রপাতির সমাদর সেখানে শিল্প-মাধ্যম হিসাবে, খেলনা হিসাবে, গ্রামীণ জীবনধারার অনুগ্র সমর্থন হিসাবে। গল্পে দেখা না দিলেও, পৃথিবী থেকে মঙ্গলের পথে ধাবমান রকেট-যানের অস্তিত্বই এমন এক প্রযুক্তিকে নির্দিষ্ট করে যা মঙ্গলবাসীদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান ও তাকে ধ্বংস করার শক্তি ধরে।

একক যাত্রীবাহী রকেটে একে একে মানুষ এসে নামে মঙ্গলে। বিভিন্ন মঙ্গলবাসীর সঙ্গে মানুষের এই একাধিক প্রথম সংযোগের বিবিধ ফলাফল থেকে আমরা জানতে পারি মঙ্গলের সভ্যতার ও ব্যক্তি হিসাবে মঙ্গলবাসীদের বৈচিত্র্যের কথা। ভুবন-বিদারী গর্জনে একটি রকেট অবতরণের পর এক ঈর্ষ্যাকাতর মঙ্গলবাসী সঙ্গে সঙ্গে তার চালককে হত্যা করে, কারণ সে ভয় পেয়েছিল তার স্ত্রী এই পৃথিবীবাসীর প্রেমে পড়তে পারে। পরবর্তী পর্বে অভিযাত্রীদের একটি পুরো দল যে-জায়গায় নামে, দেখে মনে হয় বুঝি ছোট্ট কোনো আমেরিকান নগরীরই উপকণ্ঠ। অভিযাত্রীদের স্বাগত জানায় তাদেরই পিতা, মাতা, আত্মীয় আর বন্ধুরা। যাদের মধ্যে অনেকেই মৃত বলে জানা ছিল এত দিন। টেলিপ্যাথি ক্ষমতাবলে অভিযাত্রীদের মন পড়ে নিয়ে মঙ্গলবাসীরাই পুনঃসৃজন করেছিল এই শহর আর তার বাসিন্দাদের। অভিযাত্রীরা দল ভেঙে যে-যার নিজের পুরনো গৃহের আকর্ষণে বিভিন্ন পথ ধরে এবং সবাই নিহত হয়।

কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ ও মঙ্গলবাসী পরস্পর নিধনে সম্মুখীন হয় না। প্রথম বিফলতার পর মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে পুরো প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হল, তত দিনে অধিকাংশ মঙ্গলবাসী উজাড় হয়ে গেছে মহামারিতে। পৃথিবী থেকে সংক্রামিত রোগের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিষেধক ছিল না। গুটিকতক ভাগ্যবান মঙ্গলবাসী শহর ত্যাগ ক'রে আশ্রয় নেয় পর্বতদেশে। মঙ্গলের আগ্রাসন এবার পুরোদমে শুরু হয়। রকেট বোঝাই ক'রে কাঠকুটো ও নির্মাণ সামগ্রী আসে। শহর তৈরি হয়, রাস্তা গড়া হয়, পোঁতা হয় পৃথিবী থেকে আনা গাছ-গাছালি।

উপত্যকা পাহাড় আর খালবিলের নামকরণ করা হয় রকেট-পাইলট ও অভিযাত্রীদের নাম ধরে, পৃথিবীর চেনা জায়গার নামে। হানাদাররা উপনিবেশকে তাদের ফেলে-আসা বাসস্থানের চেহারা দিতে সর্বদাই উৎসুক। 'দা অফ সিজ্ন' নামে অধ্যায়ে রাস্তার ধারে স্যাম পার্কহিল একটি 'হট্ ডগ' স্ট্যাণ্ড খোলে। নিওন লাইট থেকে আলো, জিউক বক্স থেকে সংগীত বর্ষিত হয়। এই রাস্তা অবিলম্বে সরগরম হয়ে উঠবে বলে তার ধারণা। কিন্তু মঙ্গলে পুরোপুরি গুছিয়ে বসার আগেই খবর এল পৃথিবীতে পারমাণবিক মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বেশির ভাগ মানুষই মঙ্গল ছেড়ে পাড়ি দিল পৃথিবীতে। মঙ্গলের পরিত্যক্ত প্রায় ভৌতিক শহরে কিছু পড়ে-থাকা মানুষের পরিণতির কাহিনী শুনিয়ে শেষ গল্প, 'দা মিলিয়ন ইয়ার পিকনিক্'-এ ব্র্যাডবেরি পৃথিবী থেকে শেষ দু'টি রকেটের যাত্রীদের নিয়ে এলেন আবার মঙ্গলে। ছুটি কাটাবার নামে টিমোথি, মাইকেল আর রবার্টকে নিয়ে তার পিতা মাতা মঙ্গলে এসে মাছ ধরতে বেরোলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিতা তাদের বাহক রকেটটিকে ধ্বংস ক'রে প্রত্যাবর্তনের পথটি রুদ্ধ ক'রে দিলেন। পারমাণবিক যুদ্ধে বিধ্বস্ত পৃথিবী থেকে আবার যদি হানাদার আসে, তাহলে রকেটটিই তাদের উপস্থিতির জানান দেবে। পুত্রদের মঙ্গলবাসী দেখার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পিতা তাদের নিয়ে আসেন একটি খালের ধারে। জলে পরিবারের সব সদস্যদের প্রতিফলন দেখিয়ে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবাসীদের এবার দেখলে তো?'

বিষাদময় ও কাব্যিক, শান্ত ও গভীরভাবে মানবিক, ছেলেবেলার খেলনার মতো অকিঞ্চিৎকর অথচ তাৎপর্যময় খুঁটিনাটির কবিতায় ভরা ব্র্যাডবেরির এই জগৎ, যেখানে মানুষকে পিছনে ফেলে বিজ্ঞান তার আত্মহারা দৌড়ে বিরাট এক ব্যবধান তৈরি করেছে। ব্র্যাডবেরির আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস 'ফারেনহাইট ৪৫১' বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ত্রুফো চলচ্চিত্রায়িত করেন। (চিত্রনাট্য রচনা করেন ব্র্যাডবেরি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ব্র্যাডবেরি 'মবি ডিক', 'দা ড্রিমারস' ও 'দা রক ক্রায়েড আউট' ইত্যাদি চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন)। ফারেনহাইট ৪৫১ সেই তাপমাত্রা যাতে কাগজে আগুন ধরে। ভবিষ্যতের এক প্রযুক্তি-উন্নত সমাজের কাহিনী, যেখানে বই-পড়া নিষিদ্ধ। টি. ভি.-কেন্দ্রিক অডোভিশুয়াল দুনিয়ায় অপসংস্কৃতি রোধ করার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়মিত গ্রন্থ-দহনের অভিযান চালায়। এই নৈরাশ্যময় পরিস্থিতির সমান্তরালে পরিবেশিত হয় এক অদ্ভুত প্রতিরোধ। স্বেচ্ছা নির্বাসিত কিছু মানুষ গোপনে এক স্থানে মিলিত হয়। তারা প্রত্যেকে এক একটি গ্রন্থ নির্বাচন ক'রে তার আদ্যোপান্ত মুখস্থ করতে শুরু করে। বইয়ের পাতা পড়তে থাকে আর মনের পাতা ভরে ওঠে। উত্তরপুরুষদের জন্য ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি।

ব্র্যাডবেরির রচনায় প্লট অপেক্ষা ভাষা, আবহ ও মেজাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষ ক'রে তাঁর ছোটগল্পের আলোচনা করার সময়ে কাহিনীর সার-সংক্ষেপ পেশ করাটা বাঞ্ছনীয় নয়। এখানে শুধু বিভিন্ন গল্পে এস.এফ.-এরই বহু ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও প্রকরণ, যেমন পৃথিবীর শেষ মানুষ, মনস্টার, মহাকাশে পাড়ি, টাইম মেশিন, কি অদৃশ্য মানুষ ইত্যাদিকে তিনি কত অসাধারণ দক্ষতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা অর্পণ করেছেন—তারই কিছু উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

'দা পেডেস্ট্রিয়ান' গল্পে একটি ছোট্ট শহরে টি. ভি. স্ক্রিনের সামনে বিহ্বল পতঙ্গের মতো সকলে যখন গৃহবন্দী, একটি মানুষ শুধু পথে পথে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। রাত্রির আর সমুদ্রের ঘ্রাণ নেয়। পায়ে হেঁটে বেড়াতে সে ভালোবাসে। পুলিশ ফৌজের দূর-নিয়ন্ত্রিত চালক-বিহীন একটি গাড়ি (পুলিশের একমাত্র গাড়ি) মাতালের মতো টহল দিতে দিতে আকস্মিকভাবে পথচারীকে আবিষ্কার করে। এবং দীর্ঘ জেরার পর তাকে গ্রেপ্তার করে। কারণ 'বেড়াতে ভালো লাগে' এই দুর্বোধ্য কৈফিয়তের কোনো মীমাংসা করতে পারে না যন্ত্র-মগজ। প্রতিবন্ধী-সুলভ আচরণ সংক্রান্ত গবেষণার 'সাইকিয়াট্রিক সেণ্টার'-এ পথচারীকে প্রেরণ করার কথা জানিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

'দা ফগ হর্ন' গল্পে নিঃসঙ্গ প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী লাইটহাউসের বিপদ সংকেত শুনে হারানো সঙ্গীর আহ্বান বলে ভুল করে।

'এ সাউণ্ড অফ থাণ্ডার'-এ TIME SAFARI INC. নামে সংস্থার টাইম মেশিনে চড়ার টিকিট কিনে এক জন অতীতে পাড়ি দেয়। অসতর্ক যাত্রীর পদপিষ্ট হয়ে কয়েক কোটি বছর পূর্বে মারা যায় একটি প্রজাপতি। বর্তমানে প্রত্যাবর্তনের পর যাত্রীর চোখে পড়ে সাইন বোর্ডে কালান্তরে পাড়ি দেওয়ার এই সংস্থাটির নামের বানানে কিছু গরমিল : TYME SEFARI INC.। খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সে পাড়ি দেওয়ার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের যে-ফল বেরিয়েছিল তাও পাল্টে গেছে। নির্বাচিত হয়েছেন স্বৈরাচারী এক ভিন্ন শাসক। সুদূর অতীতে সামান্য একটি প্রজাপতির নিধনের ফলে পুরো ইকোলজিকাল সিস্টেম এতটাই বিপর্যস্ত।

'দা ইনভিজিব্‌ল বয়' গল্পের নিঃসঙ্গ ডাইনি মানুষকে অদৃশ্য ক'রে দেওয়ার মন্ত্র জানে বলে ভাণ করে। উদ্দেশ্য, এই লোভ দেখিয়ে একটি বালককে তার কাছে আটকে রাখা। ডাইনির মুখ থেকেই ছেলেটি শুনতে পায় কিভাবে তার হাত-পা থেকে সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সে বিশ্বাস করে। তারপর ডাইনি আবার মন্ত্র পড়ে তাকে দৃশ্য ক'রে দেয়। ছেলেটি ছুটে পালায়। তারপর নিঃসঙ্গ ডাইনি একা খাওয়ার টেবিলে বসে সত্যিকারের অদৃশ্য এক বালকের সঙ্গে গল্প জোড়ে।

শুক্র, মঙ্গল ও শনিগ্রহে তখন নিয়মিত যাত্রীবাহী রকেট সার্ভিস শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু 'দা রকেট' গল্পের নায়ক ফিওরেল্লো বোদোনি সারা জীবনের সঞ্চয়

দিয়েও সপরিবারে মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে নি। মহাকাশ ভ্রমণের একটি টিকিট সে কাটতে পারে, কিন্তু কে যাবে? লটারি করা হয়, কিন্তু ভাগ্যবান অন্যদের বঞ্চিত করতে চায় না। একে একে পরিবারের সবাই অস্বীকার করে একা সুযোগ নিতে। বোদোনি তারপরে এক দিন দু' হাজার ডলার দিয়ে কিনে আনে বাতিল রকেটের এক খোল। স্বয়ং মহাকাশ-যানের চালকের দায়িত্ব নিয়ে উঠে বসে সেই রকেটে। তারপর বাড়ির উঠোনের সেই লঞ্চিং প্যাড থেকেই নিশ্চল মহাকাশযানে ক'রে সপরিবারে যাত্রা করে তারা। রোমাঞ্চকর মঙ্গল পরিক্রমা সেরে নিরাপদে অবতরণও করে সেই স্থানে, যেখান থেকে রকেট নড়ে নি এক বিন্দু।

'দা স্মাইল' গল্পে আবার আমাদেরই চেনা পৃথিবীর এক বিধ্বস্ত রূপ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনকে ধ্বংস করার সুযোগ পেলে তখন অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় উৎসব। এমনই এক উৎসবে মোনালিসার ছবি ছিন্ন করা হল তুমুল উদ্দীপনায়। উৎসবের পর বাড়ি ফিরে এসেছে টম, রাত্রে বিছানায় তার গায়ে যখন চাঁদের একফালি আলো, শ্বাস বন্ধ ক'রে সন্তর্পণে মুঠো খুলল। সারা বিশ্ব তখন ঘুমোচ্ছে, জেগে আছে শুধু ছেঁড়া ক্যানভাসের দোমড়ানো ফালিতে একটি হাসি। টম চোখ বোজার পরে অন্ধকারেও জেগে থাকে সেই হাসি। টম ঘুমিয়ে পড়ার পরেও থাকে। পৃথিবী জুড়িয়ে আসে, শীতল আকাশ বেয়ে চাঁদ উঠল, আবার নেমেও এলো—প্রভাত সমাগত—হাসিটি তবু অমলিন, উষ্ণ আর শান্ত।

এই নমুনাস্বরূপ গল্পগুলি ব্র্যাডবেরির যে গল্পসংকলনগুলি থেকে আহৃত—'দা ইলাসট্রেটেড ম্যান' (১৯৫২), 'দা গোল্ডেন অ্যাপেল্স অফ দা সান' (১৯৫৩), 'দা ডে ইট রেন্ড্ ফর এভার' (১৯৫৯) বা 'দা মেশিনারিজ অফ জয়' (১৯৬৬)—সাহিত্যরসিক মানুষ প্রত্যেকে উপভোগ করবেন।

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও স্ত্রুগাৎস্কি ভ্রাতৃদ্বয়

ব্র্যাডবেরির সূত্র ধরেই সোভিয়েত রাশিয়ায় সায়েন্স ফিকশন-চর্চার প্রসঙ্গে প্রবেশ করা যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ব্র্যাডবেরি সম্বন্ধে রুশ সমালোচকের মন্তব্য। রাশিয়ায় ব্র্যাডবেরির সমাদর রুশ এস. এফ.-এর বৈশিষ্ট্যেরও ইংগিত বহন করে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় সোভিয়েত রাশিয়ায় অনেক বেশি সমাদর সায়েন্স ফিকশনের। এবং তা শুধু মনোরঞ্জক হালকা সাহিত্য হিসাবেই নয়। বর্তমানে প্রতি বছর প্রকাশিত এস. এফ. গ্রন্থের শিরোনামের সংখ্যা বা

শিরোনাম-পিছু মুদ্রিত গ্রন্থসংখ্যার বিচারেও রাশিয়া পশ্চিমী যে-কোনো দেশের চেয়ে এগিয়ে আছে।

মহাকাশ দখলের মার্কিন-সোভিয়েত প্রতিযোগিতা পরিভাষার মধ্যেও প্রতিফলিত। মহাকাশচারী মার্কিন মুলুকে 'অ্যাস্ট্রোনট' আর রাশিয়ায় 'কস্‌মোনট'। দুই বৃহৎ শক্তির এই সংঘাতের একটি পক্ষ হিসাবে সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশনের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা আমাদের অভিপ্রেত নয়, কারণ এই জাতীয় মার্কিন রচনাকেও বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

রুশ সায়েন্স ফিকশনের সেই চারিত্রিক লক্ষণই আমাদের আকর্ষণ করে যা গড়ে উঠেছে তাদের জাতীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য অনুসারে। এক ঐতিহাসিক ঘটনা ১৯১৮-য় পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। আর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের স্পর্শেই সজীব সোভিয়েত এস. এফ.।

ভোগ্যপণ্য বিক্রেতাদের কোলাহলমুখর ইঁদুর-দৌড়ে উন্মত্ত বিভ্রান্ত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধাভোগী সমাজে সিরিয়াস এস. এফ.-এর মূল সুরে দার্শনিক আশংকা আর বিষণ্ণতা। প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সামাজিক উন্নয়নের তাল কেটে যাওয়ার যন্ত্রণা। অপ্রতিহত বর্তমানকে ভবিষ্যতের পর্দায় প্রক্ষেপ ক'রে আতংকচিত্র দর্শন।

বিপরীতে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিজ্ঞানকে রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বীকৃত আদর্শ থেকে জন্ম নিতে পেরেছে কিছু আলোকিত ভবিষ্যৎ—স্বপ্ন-দুনিয়া। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনায় সোভিয়েত সায়েন্স ফিকশনের মুখ্য প্রতিপক্ষ স্বয়ং প্রকৃতি। একথাও মনে করার কারণ নেই যে আশাবাদী এই জাতীয় রচনা সর্বদাই সমতল, নিরুত্তাপ, একমাত্রিক। প্রকৃতিকে বিজয়ের পথে সেখানে সম্মুখীন হতে হয় পরিবেশদূষণ ও ইকোলজিকাল সিস্টেমের সমস্যার, অনগ্রসর 'এলিয়েন' সভ্যতায় হস্তক্ষেপের নৈতিক অধিকার (উদ্দেশ্য মহৎ হলেও) ইত্যাদি জটিলতার।

মহাকাশে স্পুৎনিকের ব্লিপ ব্লিপ ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ১৯৫৭-য় আধুনিক সোভিয়েত এস. এফ.-এর ভিত্তিস্বরূপ আইভান ইয়েফ্রেমভের 'অ্যান্ড্রোমিদা নেবুলা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ২৮০ আলোকবর্ষ দূরে ৩০০০ সালের এক আদর্শবাদী শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজের ইউটোপিয়া। অদূর ভবিষ্যতে এস.এফ.-এর ধারা কোন সার্থকতার পথ নেবে অনুধাবন ক'রে ইয়েফ্রেমভ লিখেছিলেন: 'এস. এফ.-এর উদ্দেশ্যকে শুধু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার মধ্যে অবনমিত করা যায় না। মানুষের জীবন ও মনোজগতের উপর বিজ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিঘাত—এই নিয়েই এস. এফ.-এর আসল কারবার।'[২]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশ্রয়ে কল্পিত বিচিত্র দুনিয়ায় মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হবে—যুক্তি-নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক সমীক্ষা, মানবিক সম্পর্কের নতুন নকশা,

নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধি, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের বিভিন্ন প্রকল্প, অনুসন্ধানের কার্য-কারণ তাড়িত যান্ত্রিকতা বর্জন ক'রে শিল্পের নিজস্ব যুক্তিধারার আশ্রয় এবং সবার উপরে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির তথা সমাজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দানের সুবাদে সোভিয়েত এস. এফ. বহু স্তরের আবেদনে সমৃদ্ধ।

সোভিয়েত এস.এফ.-এর স্বাতন্ত্র্য-উজ্জ্বল, প্রতিনিধিত্ব করার মতো একটি কাহিনী লিওনিদ পানাসেংকোর 'দা ডায়ালগ'। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ। ভিন্ন এক গ্যালাক্সির উন্নততর সভ্যতার একজন অপার্থিব যাত্রী মহাকাশযানে ক'রে টহলে বেরিয়ে পৃথিবীর কাছে পৌঁছেছে। সেদিন ১৭ ফেব্রুয়ারি। ধর্মান্ধরা একটি মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে ভেনিসের Campo di Fiori চত্বরে। জ্বলন্ত দগ্ধ ক'রে হত্যা করা হবে নোলা-র বাসিন্দা এই বিধর্মীকে। মানুষটির নাম জিওর্দানো ব্রুনো। সত্যান্বেষী মহাজ্ঞানী এই মানুষটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা, ভণ্ডামি ও সাধারণভাবে অনগ্রসর সমাজের হাত থেকে রক্ষা ও উদ্ধার করা নৈতিক দায়িত্ব মনে করে ভিনগ্রহী আগন্তুক। অশরীরী এই এলিয়েনের আগমন শুধু ব্রুনোই উপলব্ধি করেন। কিন্তু ভিনগ্রহীকে হস্তক্ষেপ না করতে অনুরোধ করেন ব্রুনো, 'আগন্তুক এ কাজ কোরো না তুমি। তা হলে এটা হবে আরেকটা অলৌকিক ঘটনা, পুরোহিতদের আরেকটা বিজয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করবে শয়তান রক্ষা করেছে আমায়।…এমনিতেই বহু অলৌকিক কাণ্ড বানিয়ে রেখেছে ধর্মীয় মন্দির। আমি আমার নিজের পথ ধরেই এগিয়েছি এবং এইটাই তার যুক্তিপূর্ণ প্রান্ত। আমি জানতাম যে জীবন্ত দগ্ধ হওয়া এড়াতে পারবো না।…তা হোক। অলৌকিক কাণ্ড নয়, ওদের প্রয়োজন একটি বলি…।' ইতিহাসের দাবি, ব্রুনোকে শহীদ হয়েই নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এস. এফ. তার অলৌকিক সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের মধ্যস্থতায় এইভাবেই গড়ে তোলে বাস্তবের অলৌকিকের বিরুদ্ধে সচেতনতা। অনুন্নত সমাজের বা রাষ্ট্রের উপর হস্তক্ষেপ না-করা—নন-ইণ্টারভেন্‌শন—গল্পের এই থিম্‌টিও লক্ষণীয়। এই থিম্‌ প্ররোচিত করেছে সোভিয়েত এস. এফ.-লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আর্কাদি ও বোরিস্‌ স্ত্রুগাৎ‌স্‌কি ভ্রাতৃদ্বয়কে।

এই লেখক-জুটির মধ্যে আর্কাদি জন্ম ১৯২৫) জাপানি ভাষা ও সাহিত্যবিদ্‌, আর বোরিস (জন্ম ১৯৩৩) মেকানিক্স ও গণিতবিদ্যার স্নাতক। ১৯৫৭ থেকে তাঁরা সায়েন্স ফিকশন রচনা শুরু করেন। তাঁদের প্রথম দিকের উপন্যাস ও গল্প, 'দা ল্যাণ্ড অফ দা পার্পল ক্লাউড', 'রিটার্ন. নুন: টোয়েন্টি সেকেণ্ড সেঞ্চুরি' ইত্যাদি মহাকাশ-অভিযাত্রী একটি দলের নিত্য-নতুন অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী দুঃসাহসিক সব মহাকাশযাত্রীদের কাহিনী এক দিক থেকে খুবই গতানুগতিক, কিন্তু এই অভিযান-কাহিনীর মধ্যেও নৈতিক ও দার্শনিক কিছু স্পর্শ আছে যা লেখকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মে পূর্ণমাত্রায়

অভিব্যক্ত হয়েছে।

'দা প্রিডেটরি থিংস অফ দা এজ' ('দা ফাইনাল সার্কল অফ প্যারাডাইস' নামে ইংরাজিতে অনূদিত) প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে। স্পেস পাইলট জিলিন-কে ইউনাইটেড নেশন্স-এর সিকিউরিটি কাউন্সিল তাদের এজেন্ট হিসাবে মধ্য ইয়োরোপের একটি কাল্পনিক রাজ্যে প্রেরণ করে। সময় : বিংশ শতাব্দীর অন্ত ভাগ। জিলিনের কাজ অতীতের যত বিষাক্ত জিনিসের মোকাবিলা—রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী, ফ্যাসিস্ট আর গ্যাংস্টারদের দমন। কৃতকার্য জিলিন-কে তারপরে পাঠানো হয় 'মূর্খদের দেশে'। সেখানে বৈষয়িক উন্নতি একটি উচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে, কিন্তু দেশের মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা প্রায় লুপ্ত। যেন এক দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে তারা চিন্তা করতে একেবারেই নারাজ। এই দেশ থেকে ভীতিপ্রদ রিপোর্ট আসতে শুরু করে 'স্লেগ' নামক এক নতুন মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে। 'স্লেগ' সেখানেই প্রথম তৈরি হয়েছিল আর তারপর থেকেই কেনাবেচা চলছে চোরাবাজারে। এই মাদক দ্রব্যের প্রভাবে মানুষ পরিণত হয় গবেষণাগারের ইঁদুরে। সুইচ টিপে যে-ইঁদুর তার মস্তিষ্কের 'সুখ'-এর কেন্দ্রকে এক নাগাড়ে উত্তেজিত ক'রে চলে। জিলিনের পূর্ববর্তী অনুসন্ধানকারীরা নিজেরাই আসক্ত হয়ে পড়েছিল এই মাদকদ্রব্যে।

স্ত্রুগাৎস্কিদের 'দা রোডসাইড পিক্‌নিক' (১৯৭২) অবলম্বনে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার তারকোভস্কি তুলেছিলেন 'দা স্টকার'। উপন্যাসের কাহিনীটি ই. টি. (এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল) সংক্রান্ত হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। কে কেন এবং কখন পৃথিবীতে এসেছিল গ্রহান্তর থেকে তা জানা যায় না। শুধু দেখা যায় তারা ফেলে রেখে গেছে একটি রহস্যময় 'অঞ্চল'। ভিন্ন এক সভ্যতার বহু দুর্জ্ঞেয় নিদর্শন বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে এই অঞ্চলে। যার অর্থ বা লিপিভেদ করার যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর মানুষের নৈতিকতাকে ভিত্তি ক'রে লেখকদ্বয় অপার্থিবদের সঙ্গে এই সংস্পর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এবং এই 'অঞ্চলে' পা দিয়েই চোরাচালানকারী জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত রোডেরিক, যে তার পথের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে, জীবনে প্রথম চিন্তা করার অবসর পায় সারা জীবন ধরে কী খুঁজছে সে, জীবনের কাছ থেকে কি তার প্রত্যাশা!

'হার্ড-টু বি এ গড' (১৯৬৪), 'দা ইনহিবিটেড আইল্যাণ্ড' (১৯৭০) ও 'এ বিট্‌ল ইন দা অ্যান্টহিল' (১৯৮০)—এই তিনটি উপন্যাসে স্ত্রুগাৎস্কিরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নন-ইন্টারভেন্‌শনের বিষয়টিকে ঘিরে গড়ে তুলেছেন বিবেকবান মানুষের প্রশ্ন, সমস্যা, মানসিক যন্ত্রণা। কোনো সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় পথ নেই ভবিষ্যতের এই জটিল কাহিনীগুলিতে। আন্তনকে একটি গ্রহে পর্যবেক্ষক হিসাবে পাঠানো হয়। শুধু চেয়ে দেখা, নথিবদ্ধ আর বিশ্লেষণ করাই তার কাজ। কিন্তু মধ্যযুগীয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন সেই গ্রহে যখন ফ্যাসিবাদের

আরো নৃশংস এক রূপ দানা বেধে ওঠে, কোনো বিবেকবান মানুষ কি শুধু পর্যবেক্ষক হিসাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে? কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে হস্তক্ষেপ সমর্থনযোগ্য হলেও মানব সমাজের পক্ষে নিজেদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অন্য গ্রহে রোপণ করার কি কোনো অধিকার আছে? প্রথম উপন্যাসের এই প্রশ্ন পরবর্তী দু'টি উপন্যাসে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে (পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এক দুনিয়ায় এবং পৃথিবীতে গ্রহান্তরের এক অশুভশক্তি সম্পন্ন আগন্তুককে ঘিরে) আরো বিশদে আলোচিত। বিনা কারণে এক রুশ সমালোচক স্ত্রুগাৎস্কি-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধের নামকরণ করেন নি 'A Test For Humanity'।[৩]

স্তানিসোয়াভ লেম

অস্ট্রিয়ান সমালোচক রোটেন্স্টাইনার 'দা সায়েন্স ফিকশান বুক' গ্রন্থে 'সেরা সমকালীন সায়েন্স ফিকশন লেখক' শিরোনামে একটি অধ্যায়ে স্তানিসোয়াভ লেম-এর কৃতিত্ব বর্ণনা করেছেন।[১০] জেরাল্ড জোনাস নামক এক সমালোচক বলেছেন যে, লেম-ই একমাত্র সায়েন্স ফিকশন লেখক যিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনে সমর্থ।[১২]

১৯২১-এর ১২ সেপ্টেম্বর পোলাণ্ডের লুভ (Lvov) শহরে স্তানিসোয়াভ লেম-এর জন্ম। পিতা-মাতা দু'জনেই ছিলেন চিকিৎসক। লেম-ও ডাক্তারি ছাত্র হিসাবে পাঠগ্রহণ শুরু করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোলাণ্ডের সমস্ত শিক্ষায়তন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৯৪১-এ পাঠক্রমে ছেদ পড়ে। যুদ্ধ বিরতির পূর্বাবধি তিনি একটি জার্মান ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে মোটরগাড়ি মেরামতির ও ঝালাই শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। একটি সাক্ষাৎকারের সময় তিনি রসিকতা ক'রে বলেছিলেন, যে মিস্ত্রি হিসাবে এতই অপটু তিনি যে একটি অন্তর্ঘাতমূলক কাজের জন্য প্রায় ফাঁসতে বসেছিলেন একবার। যুদ্ধের পর পিতা-মাতার সঙ্গে ক্র্যাকাও চলে আসেন ও ১৯৪৮-এ চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ শেষ করেন। কিন্তু ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন নি, কারণ সে সময়ে ডাক্তারি ডিপ্লোমাধারীদের বাধ্যতামূলকভাবে আজীবনের কড়ারে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে হচ্ছিল।

লেম এক অর্থে একটি আধুনিক রেনেশাঁস ব্যক্তিত্ব। 'ম্যাথেমেটিকাল লিঙ্গুইস্টিক্স্', 'স্ট্রাকচারাল লিটারেচার' থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতি (methodology) এবং সাইবারনেটিক্স বিদ্যায় (সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুদ্ধিসম্পন্ন যন্ত্র নির্মাণ বিদ্যায়) তাঁর অবাধ অধিকার। এই বহুগামী অনুসন্ধিৎসু মনের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল তাঁর সাহিত্যকর্মও। সাহিত্যের বিবিধ শাখায়

তিনি চালিয়েছেন পরীক্ষা—কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, গোয়েন্দা কাহিনী, ফ্যাণ্টাসি, বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ, সাহিত্য সমালোচনা, সাইবারনেটিক তত্ত্ব, অপ্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা, দার্শনিক প্রবন্ধ ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, তাঁর বহু একক সাহিত্যকর্মও বহুস্তর বিশিষ্ট, যার মধ্যে জড়িয়ে আছে পূর্বোক্ত বিবিধ ফর্ম বা ফর্মের উপাদান।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈষয়িক সাফল্য স্বীকার করেও তিনি জ্ঞান ও সত্যের অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃতকার্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান। অত্যন্ত নিকট ও পরিচিত জগতেরও ক্ষুদ্র একটি চৌহদ্দির বাইরে বিজ্ঞান আমাদের বিমূর্ত উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষাকে কতদূর চরিতার্থ করতে সক্ষম—এই বিষয়টি তাঁকে বার বার প্ররোচিত করেছে। থিম্, ফর্ম, প্লট, কি স্টাইল—গোয়েন্দা কাহিনীর ঘরানা, কি সায়েন্স ফিকশন—সবই তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের কাজে নিযুক্ত।

চমক ও তিক্ততা, ভীতি ও আস্থা, ব্যঙ্গ আর কৌতুকে বোনা তাঁর জগৎ। গ্রন্থভেদে তাঁর বিষয় ও স্টাইলও এত ভিন্ন যে বিশেষ কোনো রচনাকে প্রতিনিধিমূলক বিবেচনা করা এবং সেই সূত্রে লেম-এর স্বকীয়তার আভাস দেওয়া দুঃসাধ্য। তাঁর সাহিত্যকৃতির বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কখনো তাঁর সঙ্গে পাউণ্ড বা ইলিয়টের তুলনা করা হয়েছে, কখনো একটি গল্পে খুঁজে পাওয়া গেছে কাফ্‌কাকে, 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস্' উপন্যাসের বিবরণধর্মিতাকে 'মবি ডিক' জাতীয় সাফল্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে, আবার দর্শনতত্ত্বকে সাহিত্যের ছটায় উদ্ভাসিত করার জন্য টমাস মান্‌কে স্মরণ করা হয়েছে। ('...who brings a marvelous flair to the philosophical novel and who renders ideas provocatively in literary guise. In this respect his work is reminiscent of Thomas Mann's—learned and interesting, although not startling.')[১৩]

রোটেন্‌স্টাইনারের পূর্বোক্ত রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে অজ্ঞাতনামা এক ব্রিটিশ সমালোচকের উক্তি : ' "সোলারিস" যেন ফ্রয়েড ও এইচ. জি. ওয়েল্‌স জুটির উদ্দীপ্ত যৌথকর্ম'।'

'সোলারিস' উপন্যাসটি (বা তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থকেই স্বতন্ত্রভাবে) লেম-এর সেরা কীর্তি বলা বাতুলতা। তবে স্বীকার করতেই হয় এটি তাঁর সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত গ্রন্থ এবং এই উপন্যাসের সুবাদেই তাঁর নাম ইংলণ্ড ও আমেরিকায় রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ায় ও ইস্টার্ন ব্লকে লেম-এর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কান্ ও কারলোভি ভ্যারিতে উচ্চ-প্রশংসিত আন্দ্রেই তারকোভ্‌স্কি-র 'সোলারিস' নামে রুশ চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসাবেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯৭০-এ প্রথম 'সোলারিস'-এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যদিও পোলিশ ভাষায় সেটি ১৯৬১-তে প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সোলারিস-

এর ফরাসি অনুবাদ থেকে পুনরনূদিত ইংরেজি সংস্করণটি)।

ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এস. এফ. বিষয়ক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও শিক্ষণের সহায়ক-গ্রন্থ হিসাবে রচিত প্যাট্রিক প্যারিণ্ডার-এর 'সায়েন্স ফিকশন : ইট্স্ ক্রিটিসিজ্ম্ অ্যাণ্ড টিচিং'।[৭] প্যারিণ্ডার একটি ঘরানা (genre) রূপে সায়েন্স ফিকশনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য চারটি অক্ষে বিভক্ত করেছেন তাঁর আলোচনা—উপকথা (ফেব্ল), এপিক, রোমান্স এবং প্যারডি। তিনি মনে করেন সায়েন্স ফিকশনের কোনো গ্রন্থকে তখনই 'ক্ল্যাসিক' আখ্যা দেওয়া যায়, যখন তার মধ্যে এই চারটি অক্ষের সার্থক সংশ্লেষণ ঘটে। 'The intensive reading of such a work will, in effect, be a rehearsal of all that the genre is and might be.')। এবং 'সোলারিস' তাঁর বিবেচনায় এই চারটি অক্ষ ঘিরেই সৃজনশীল মৌলিকতায় উজ্জ্বল।

'সোলারিস' একটি গ্রহের নাম। দু'টি সূর্য বিশিষ্ট এই গ্রহকে আচ্ছাদিত ক'রে আছে এক মহাসমুদ্র। এক ধরনের ঘন আঠাল তরল বা জেলি জাতীয় পদার্থে যা পূর্ণ। অবিরাম স্পন্দ্যমান এই সমুদ্র বিচিত্র সব আকৃতি গ্রহণ ক'রে চলেছে প্রতি মুহূর্তে, যার কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে না। বংশ পরম্পরায় বিজ্ঞানীর দল এই সমুদ্রকে পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ক'রে চলেছেন। তাঁদের মতে এই সমুদ্র এক অবিচ্ছিন্ন মহা-প্রাণ (bio-mass)। মহাজ্ঞানী এক সমুদ্র। বিজ্ঞানীরা এই জীবন্ত সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মানবিক আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত। 'সোলারিস'-কে নিয়ে গবেষণা 'সোলারিস্টিক' বিদ্যার জন্ম দিয়েছে, কিন্তু আজো কোনো সংযোগ স্থাপিত হয় নি। ইতিমধ্যে কিছু বিজ্ঞানী ও অভিযাত্রী এমন পরিস্থিতির মধ্যে উধাও হয়ে গেছে যার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। এই অবস্থায় উপন্যাসের নায়ক কেল্ভিন এসে পৌঁছয় সোলারিস-এর আকাশে ভাসমান স্পেস-স্টেশনে, গবেষণা কেন্দ্রে। এই গবেষণা কেন্দ্রে কেল্ভিনের কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার বিবরণ 'সোলারিস'-এর আখ্যানভাগ। মনস্তত্ত্ববিদ কেল্ভিন গবেষণা-কেন্দ্রে পৌঁছাবার কিছু পূর্বে তার এক বিজ্ঞানী সহকর্মী গিবারিয়ান সেখানে আত্মহত্যা করেছে। কেল্ভিন দেখল তার সহকর্মী পদার্থবিদ্ সারটোরিয়াস ও সাইবারনেটিক-বিশারদ স্নো, দু'জনেই মানসিক রোগাক্রান্ত। কাল্পনিক দৃশ্যকে তারা চাক্ষুষ করছে। স্পেস-স্টেশনের এই তোলপাড় অবস্থার জন্য দায়ী 'আগন্তুক'রা। মানুষ মহাসমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে না পারুক মহা-সমুদ্র মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসেই সম্ভবত সৃষ্টি করেছে এই 'আগন্তুক'-দের। তাদের প্রেরণ করেছে স্টেশনে। এই 'আগন্তুক'রা মানুষের দেহধারী। এবং স্টেশনের বাসিন্দাদের স্মৃতি ও গোপন আকাঙ্ক্ষাকে ব্রেন-স্ক্যানিং মারফত মহাজ্ঞানী সমুদ্র এমন 'আগন্তুক'দেরই সংশ্লেষণ করেছে যারা স্টেশনের বাসিন্দাদেরই অতীত কালের সুপরিচিত বা নিকটজন। আগন্তুকরা মুহূর্তের জন্য

তাদের পার্থিব আত্মীয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে নারাজ। জোর ক'রে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলে তারা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারা এমন উপাদানে গঠিত যে আঘাত ও ক্ষত আপনা থেকে নিরাময় হয়। এমন কি কাউকে রকেটে চড়িয়ে মহাশূন্যে নিক্ষেপ ক'রে দিলেও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিকল এক বিকল্প তার স্থান পূরণ করে। স্বাভাবিক মানুষের মতোই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন তারা এবং নিজেদের অপার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবেই অসচেতন।

এখানে 'আগন্তুক'দের আমরা সুপ্ত ব্যক্তিগত যৌনবাসনার বা শৈশবের আকাঙ্ক্ষার শরীরী প্রতিমূর্তি হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। যার সঙ্গে হয়ত অপরাধবোধও জড়িত। এক নিগ্রো মহিলা-রূপী আগন্তুক তাই গিবারিয়ানকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, এক বামন বসবাস করে সারটোরিয়াসের সঙ্গে। কেল্‌ভিনের সমস্যা আরো দ্বিধাপীড়িত। তার 'আগন্তুক' – রেয়া (মূল পোলিশে 'হরে') নামে একটি মেয়ের প্রতিমূর্তি যার সঙ্গে কেল্‌ভিন সত্যিই এক কালে মর্মন্তুদ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। আগন্তুক 'রেয়া'র সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব এটা কেল্‌ভিন 'বিজ্ঞান'-এর ব্যাখ্যা অনুসারে উপলব্ধি করেও তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। (এখানে উল্লেখযোগ্য, আগন্তুকদের রক্ত পরীক্ষা করেও কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় নি তাদের পার্থিব আদত মডেলের সঙ্গে)। স্নো এবং সারটোরিয়াস 'আগন্তুক'দের দেহের 'নিউট্রিনো কাঠামো'-কে বিপর্যস্ত করায় একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করার পর রেয়া আত্মহত্যা করে। কেল্‌ভিন-রেয়ার প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। কিন্তু পার্থিব রেয়াও আত্মহত্যা করেছিল একদিন। কাজেই আগন্তুক রেয়া-কে আপাতদৃষ্টিতে যদিও আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করেছে দুই বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সেটা কি তাদেরই স্বাধীন চিন্তাজাত ? যাই হোক্, রেয়া-র প্রস্থান (বাস্তবের রেয়া-র মতোই) কেল্‌ভিনকে সোলারিস রহস্যে অবগাহনে আরোই উৎসাহিত করে। এবং তার এই উৎসাহ প্রধানত আবেগজাত।

কেল্‌ভিন তার পূর্বসূরি বিজ্ঞানীদের আহৃত তথ্য ও তত্ত্ব ইত্যাদি অধ্যয়ন করতে শুরু করে। জানা যায় 'সোলারিস্টিক' বিদ্যার চর্চা আটাত্তর বছরে মূল সমস্যার কাছে এতটুকু অগ্রসর হতে পারে নি। কেন পারে নি তা শুধু 'সোলারিস' উপন্যাস নয়, লেম-এর সৃজনশীল রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেই 'এপিস্টেমোলজি' সংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা। 'এপিস্টেমোলজি' শব্দটিকে পরিহার ক'রে লেম স্বয়ং এক স্বাক্ষাৎকারে বুঝিয়ে বলেছিলেন '[এই নাটকের] ফোকাল্ পয়েন্ট হল জ্ঞান আহরণের জন্য মানুষের অক্ষম যন্ত্রপাতির ট্রাজেডি।' ('....whose focal point is the tragedy of man's imperfect machinery for gaining knowledge.')।[১৩]

কেল্‌ভিনের মতে পূর্ব-নির্ধারিত ছকের সঙ্গে খাপ খায় না এমন সব তথ্যকে

বর্জন করতে বলে যে-বিজ্ঞান তা আসলে জ্ঞান-অর্জনের বা উপলব্ধির সহায়ক নয়।

অন্যদিকে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত ও বিচিত্রের সম্মুখীন মানুষ যখন জ্ঞান আহরণের উপকরণযোগে তার মর্মভেদ করতে পারে না—তখন কি ঘটে—বা বিভিন্ন ব্যক্তির উপর তার প্রতিক্রিয়া কি—এই অনুসন্ধানও 'সোলারিস' তথা লেম-এর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের এক বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। এবং এই সূত্রেই 'মেটাফিজিক্স-'এর অতিরিক্ত তাঁর সামাজিক উদ্বেগ এবং মানবিকতারও প্রকাশ। 'সোলারিস'-এর তিন বিজ্ঞানীর কথা ধরা যাক।

সার্টোরিয়াস বিজ্ঞানীকুলের সেই গোষ্ঠির প্রতিনিধি যিনি 'ফলপ্রসূ' কাজ করেন। তাঁর মতে সোলারিস স্পেস-স্টেশনের একটিই তাৎপর্য—মহাজাগতিক সম্প্রসারণ এবং ব্যক্তিস্বার্থহীন আত্ম-ত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি তারই প্রতীক এটি। পৃথিবীর মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজন উপেক্ষা ক'রে বিমূর্ত জ্ঞান অন্বেষণের এই কর্মকাণ্ডে বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করা হয়েছে। তার 'নৈতিক' দায়িত্বই সার্টোরিয়াসকে আর কিছু না হোক 'আগন্তুক'দের নিহত করার যন্ত্র নির্মাণে উৎসাহিত করে, ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর চিঠি লঙ্ঘন করেও সোলারিসের সমুদ্রকে তিনি এক্স-রে দিয়ে আঘাত করেন। এবং 'অস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী'র মতো কিছু 'ফল' অবশ্যই পান। বিজ্ঞানী স্নো উদারপন্থী হয়েও কিন্তু শেষ অবধি এক অসহায় হতাশাবাদী। সহকর্মীদের কর্মধারা তিনি পরিবর্তন করতে পারেন না, শুধু ইংগিত দেন যে মহাকাশ অভিযানের এই উন্মত্ততা আসলে মানুষের বাস্তব সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। অন্যদের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা কিন্তু তাঁর নিজস্ব মননশীলতার ও নৈতিকতার পরাজয়কে গোপন করতে পারে না। এই দু'জনের বিপরীতে কেল্‌ভিন এক রোমান্টিক আদর্শবাদী, কল্পনাপ্রবণ—নতুন অভিজ্ঞতাকে খোলামনে গ্রহণ করতে সক্ষম। তার দৃঢ় বিশ্বাস সোলারিস-এর রহস্যের সম্মুখীন হওয়া তার পক্ষে এক ব্যক্তিগত অন্বেষণ। অন্য দুই সহকর্মীর সঙ্গে কেল্‌ভিনের স্বাতন্ত্র্যের অন্যতম কারণ নিশ্চয় রেয়া-র প্রতি তার অন্ধ ভালোবাসা। অচরিতার্থ হলেও এই প্রেমের মূল্য তার জীবনে যতখানি দুর্জ্ঞেয়, রহস্যভেদে অসমর্থ হলেও তার 'সোলারিস' ত্যাগ না করার বাসনার গুরুত্বও ততটা। কিংবা উপন্যাসের শেষাংশে যখন দেখি জ্ঞানী সমুদ্র খেলাচ্ছলে হলেও কেল্‌ভিনকে স্পর্শ করছে, মনে হয় হয়ত সে জানতে পারবে। কিন্তু কেল্‌ভিনের সেই জানা হবে তার নিতান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি। মানুষ হিসাবে সেই জানাকে সে সঞ্চারিত করতে পারবে কিনা—'সোলারিস'-এর মহাপ্রাণের মধ্যে তার মানবসত্তার বিলুপ্তি ঘটিয়েই একমাত্র এই জানা সম্ভব কিনা—এই সব প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়।

বাঙালি পাঠকদের পক্ষে সুখবর লেম-এর দু'টি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। 'পৃথিবী কি ক'রে বাঁচলো' এবং 'মুখোশ ও মৃগয়া'। অনুবাদ সহজসাধ্য নয়,

বলাই বাহুল্য। প্রথম গ্রন্থটি রোবটদের জন্য লেখা রূপকথার সংকলন। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে ট্রুর্ল আর ক্লাপাউৎসিউশ নামে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ দুই বন্ধুর প্রাণ মাতানো কীর্তিকাহিনী আর দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চার। এরা দু'জন যারা রোবট বানাতে সিদ্ধহস্ত, তারা নিজেরাও রোবট। পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলে তাদের অদ্ভুত সব যন্ত্র নির্মাণের। আর সেই সূত্রাদেই ঘটে যায় নানা কেলেংকারি, সৃষ্টি হয় উদ্ভট সব সমস্যা। একটি উদাহরণ : একবার তারা বানিয়ে ফেলল এমন যন্ত্র, যা 'ন' দিয়ে শুরু হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এমন সব জিনিসই বানাতে পারে। কার্যকালে দেখা গেল তার অর্থ তারা সবকিছুই বানাতে পারে, এমনকি 'নাস্তি'ও (অনস্তিত্ব)। আবার রোবটদের ভিন্ন এক জগতে প্রযুক্তির প্রবল আস্ফালন সত্ত্বেও, অ্যাটম বোমাও যখন হার মেনেছে এক আপদকে বিদায় করতে, মহাবিজ্ঞানী মুস্কিল আসান করলেন সব যন্ত্রের সেরা যন্ত্র 'আমলা যন্ত্র' বা 'আপিস যন্ত্র' তৈরি ক'রে, যার বিশাল 'আ'-কে কেউ ঘায়েল করতে পারে নি। 'মুখোশ ও মৃগয়া'-ও রোবটদের দু'টি কাহিনী। তবে এখানে কৌতুক আর রঙ্গব্যঙ্গ নয়। 'মৃগয়া'-য় নভোযাত্রী পিরক্স বেরোয় এক বিপজ্জনক অভিযানে এক বেপথু রোবটকে গ্রেপ্তার করতে। আর 'মুখোশ'-এ দেখি রোবট খুঁজে বেড়াচ্ছে তার স্রষ্টা মানুষকে। মানুষেরই আত্মানুসন্ধানের দু'টি কাহিনী—কল্পিত অবস্থানের মেরু বিপর্যয় ঘটিয়ে রচিত।

'সোলারিস, দা ইনভিনসিব্‌ল, মেমোয়ার্স ফাউণ্ড ইন এ বাথ্‌টাব, সাই-বিরিয়াদ, ফিউচারোলজিকাল কংগ্রেস, স্টার ডায়েরিজ, মরটাল এনজিন্‌স, চেন অফ চান্স, পারফেক্ট ভ্যাকুয়াম, টেল্‌স অফ পিক্স দা পাইলট ইত্যাদি লেম-এর ষোলটি গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে ইংরাজিতে।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রভূত স্বীকৃতি পেয়েছেন লেম। ১৯৭৬-এ নিউইয়র্ক টাইম্‌স বুক রিভিউ ও ১৯৭৮-এ নিউ ইয়র্কার-এর প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছেন তিনি। এর গুরুত্ব বোঝা যায় যখন দেখি আমেরিকায় মাত্র জনা দশেক বিদেশী লেখক এই সম্মান উপভোগ করেন—গ্রাস্, ব্যোল্, বর্হেস, ফুয়েন্তেস ও ক্যালভিনো প্রমুখ। কিন্তু তার মধ্যে লেম ভিন্ন দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশন লেখক নেই।

লেম-এর উদ্ভাবনী শক্তি ও সৃজনশীলতা এস.এফ.-এর প্রচলিত ধারা ত্যাগ ক'রে অর্জন করেছে নতুন শক্তি। মানুষের গড়া (অতিবিজ্ঞানের) দানবকে বীভৎসরূপে উপস্থাপিত করেও তার ধ্বংসলীলার বর্ণনা দিয়ে সমাজের স্বার্থরক্ষার মহান কর্তব্য পালন করার চেষ্টা নেই তাঁর। বরং যন্ত্রমানুষকে জ্ঞান ও চেতনা প্রদান ক'রে তাদের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত করেছেন আবিষ্কারক মানুষের স্বরূপ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাধনাকে একাধারে সমর্থিত ও তার সাধকদের সমালোচিত করার এই দৃষ্টিকোণ শুধু সাহিত্যিকের প্রকৌশল নয়, দার্শনিক অবলম্বন।

বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ঐতিহ্য

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে শাসনের জন্য ভাগ্যে এইচ. বোসের (হেমেন্দ্রমোহন বসুর) তৈরি এক শিশি 'কুন্তলীন' তেল ঢেলে অদ্ভুত ফল পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। একটি অনবদ্য এস.এফ. কাহিনী। বাংলা ছোটগল্পের জন্য প্রতি বছর 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রবর্তনের প্রথম বর্ষেই, ১৩০৩ সালে 'কুন্তলীন পুরস্কার' গ্রন্থে 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' মুদ্রিত হয়। অবশ্য সে সময়ে লেখকের নামোল্লেখ করা হয় নি। ১৩২৮-এ প্রকাশিত 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত করার পূর্বে জগদীশচন্দ্র লেখাটি মার্জনা করেন এবং নতুন নাম দেন : 'পলাতক তুফান'।

'নিরুদ্দেশের কাহিনী' শিরোনামের সঙ্গে সাব-টাইটেল যুক্ত করেছিলেন জগদীশচন্দ্র : 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। সায়েন্স-এর সঙ্গে ফিকশন অথবা ফ্যাণ্টাসিকে যুক্ত ক'রে জোড়কলম শব্দ দু'টি ইংরেজিতে আবির্ভূত হওয়ার বহু পূর্বেই জগদীশচন্দ্র স্বাধীন ও সচেতনভাবে এই বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। সায়েন্স ফিকশনের বাংলা পরিভাষা কি হবে, বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প না কল্প-বিজ্ঞানের গল্প অথবা এই দুই প্রতিশব্দের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। বাংলায় 'রহস্য' শব্দটি ইংরেজি 'mystery'-র নিছক প্রতিশব্দ নয়। mystery প্রধানত 'গোপনীয়' ও 'দুর্জ্ঞেয়' অর্থবাচক। কিন্তু 'রহস্য'-র মধ্যে প্রয়োগসিদ্ধ অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা রয়েছে পরিহাস, বিস্ময়জনক বিষয় ও রঙ্গরস ইত্যাদির। এমন কি 'গূঢ় ভবিষ্যৎ বিষয়' অর্থে রহস্যজাত 'রহস' শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে।

প্রচলিত ধারণা অনুসারে জগদীশচন্দ্রের এই লেখাটি অবশ্য বাংলা ভাষার প্রথম এস. এফ. নয়। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে (১৮৮২-তে) 'শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্তৃক যোড়াসাঁকো ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি হইতে প্রকাশিত' ও 'সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে মুদ্রিত হেমলাল দত্ত রচিত 'রহস্য' গল্পটি শুধু প্রাচীনত্বেই নয়, বিষয়গৌরবে ও লিপিকুশলতায় একাধারে বাংলা এস. এফ.-এর প্রথম ও প্রতিনিধিত্বমূলক নিদর্শন।[২৪]

'একদা বিজ্ঞান আমাকে অজ্ঞান বাঙালি পাইয়া কিরূপ দুর্গতি করিয়াছিল তাহা বলিতেছি, শুনিয়া আপনাকে কাঁদিতে হইবে।' – প্রথম পরিচ্ছেদে লণ্ডন প্রবাসী নগেন্দ্রের এই উক্তি সত্ত্বেও এটি হাস্যরসাত্মক কাহিনী। শিল্পবিপ্লবের প্রাথমিক উন্মাদনা কমে আসার পরে জীবনযাত্রার অতিযান্ত্রিকীকরণের উৎপাত নিয়ে হিথ রোবিনসনের উদ্ভট কলকব্জার বিচিত্র দৃশ্য জগতেরই যেন সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি এই গল্পটি। গ্যালভানিক ব্যাটারি ও বহু যন্ত্রকৌশল সমৃদ্ধ সাহেব বন্ধু হার্বি-র স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভরপুর বাড়িতে এক দিনের অতিথি এই বঙ্গ-সন্তানের ভুল ক'রে পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধাকে তার শয্যাসঙ্গী হিসাবে আমন্ত্রণ –

এবং বহু বিঘ্ন পার হয়ে অব্যাহতি লাভের এই সরস ও উপভোগ্য কাহিনীর মধ্যে নিহিত কটাক্ষ অসতর্ক পাঠকের পক্ষেও লক্ষ না ক'রে উপায় নেই।

জগদীশচন্দ্রের পূর্বে জগদানন্দ রায়-ও এস. এফ. কাহিনী লিখেছিলেন। বাঙালি পাঠকের গ্রহান্তরে ভ্রমণের এবং বুদ্ধিমান ভিন্‌গ্রহীদের সাক্ষাৎ লাভের প্রথম সুযোগ। বাংলায় 'পপুলার সায়েন্স' গ্রন্থমালার প্রবর্তক, বিজ্ঞান-লেখক ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক জগদানন্দ রায় সম্ভবত এই একটিই এস. এফ. কাহিনী লিখেছেন। 'শুক্র ভ্রমণ' গল্পটি সংকলিত হয় ১৩২১-এ প্রকাশিত 'প্রাকৃতিকী' গ্রন্থে। কিন্তু লেখকের নিবেদন থেকে জানা যায়, এটি গ্রন্থ-প্রকাশের প্রায় বাইশ বছর পূর্বের রচনা, যখন তিনি সত্য সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেছেন।

প্রাথমিক সাফল্যের এই তিনটি উদাহরণের পর কিন্তু বাংলা এস. এফ. রচনায় বেশ কয়েক বছরের ভাঁটা পড়ে। তার মধ্যে অবশ্য জুল ভার্নকে বাঙালির দরবারে হাজির করেছেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। ১৯১৪-য় তিনি অনুবাদ করেন 'আশি দিনে ভূপ্রদক্ষিণ'। তারপর একাদিক্রমে 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), ১৯১৬-য় 'পাতালে' (জার্নি টু দা সেণ্টার অফ দা আর্থ) এবং ১৯২৪-এ প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রলোকে যাত্রা'। শেষোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকায় অনুবাদক লিখেছেন : 'প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী জুলে ভার্নেকে আমি প্রথমে বাঙ্গালা-পোষাকে বাঙ্গালীর ঘরে বরণ করিয়া আনিয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম যে, আরও সহকর্মী পাইব। ক্রমে ক্রমে জুলে ভার্নের তিনখানি পুস্তক বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলাম। 'চন্দ্রলোকে যাত্রা' চতুর্থ। আজিও সহকর্ম্মী মিলে নাই…।'

এইচ. জি. ওয়েল্‌স-কে কিন্তু প্রথম বাঙালি অনুবাদক সংগ্রহ করার জন্য ভার্নের চেয়ে আরো পঁয়ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৩৫৬-য় নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ওয়েল্‌সের প্রথম গ্রন্থ – গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। অনুবাদকের মধ্যে ছিলেন বিনয় ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। গ্রন্থটির প্রকাশক অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির থেকে অবশ্য পরবর্তী সাত আট বছরের মধ্যে নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুবাদে ওয়েল্‌সের 'ওয়ার অফ দা ওয়ার্ল্ড্‌স,' 'দা ফার্স্ট মেন ইন দা মুন' ও 'ফুড অফ দা গড্‌স' ইত্যাদি আরো পাঁচটি গ্রন্থের ঈষৎ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের কোনো জুড়ি নেই। এস. এফ.-এর ক্ষেত্রেও তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বাংলায় এস. এফ. জাতীয় রচনা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করার পূর্বেই আর্থার কোনান ডয়েলের 'লস্ট ওয়ার্লড' তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে এস. এফ. নিয়ে প্যারডি রচনায় – 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়ারী'। কোনান ডয়েলের বিজ্ঞানী প্রোফেসার চ্যালেঞ্জার আর তাঁর দলবল পৃথিবীর এক উপান্তে 'সত্যিকার' সব প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের সাক্ষাৎ পেয়েছিল, আর প্রোফেসর হেশোরাম আবিষ্কার করেছিলেন 'কাল্পনিক' প্রাণীদের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

শার্লক হোম্‌সের ক্রিয়াকাণ্ড অনুকরণে একটি ডিটেকটিভ গল্পের প্যারডিও রচনা করেছিলেন তিনি—যার নাম 'ডিটেকটিভ'।

বাংলায় প্রথম নিয়মিত এস.এফ.-চর্চা শুরু করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও, তাঁর এস. এফ. রচনায় হাত দেওয়ার পূর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ। তারও কয়েক বছর পূর্বে সেটি 'রামধনু' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল।

'সে অনেক কাল আগের কথা। তখন সবই ছিল আশ্চর্য রকমের। তখন ঠিক ভোরের বেলা সূর্য উঠতো; আর এমন মজা যে, ঠিক রাত হওয়ার আগেই সূর্য অস্ত যেতো।'—'পিঁপড়ে পুরাণ' শুরু হয় এইভাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কোনো লেখক যেন কাহিনীটি পরিবেশন করছেন। পিঁপড়েদের আকার ও বুদ্ধি অতিরঞ্জিত হওয়ার পর এই সমাজবদ্ধ জীবদের মানবসমাজের প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার বৃত্তান্ত 'পিঁপড়ে পুরাণ'।

রকেটে শুক্রগ্রহে পাড়ি দেওয়ার কাহিনী 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (১৯৩৯), রোবট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার দুরভিসন্ধির ক্ষেত্র 'ময়দানবের দ্বীপ', সমুদ্রের অতলের বাসিন্দা বিচিত্র বুদ্ধিমান জীবদের দুই গোষ্ঠির তথা সভ্যতার সংকট নিয়ে 'পাতালে পাঁচ বছর' বা মনস্টার-কাহিনী 'আকাশের আতঙ্ক', 'দুঃস্বপ্নের দ্বীপ' বা 'অবিশ্বাস্য' ইত্যাদি বহু এস. এফ. রচনা করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

নিদ্রাটাকে যিনি চারুকলা হিসাবে চর্চা করেছেন, ভোজনরসিক, গোল-গাল টাকমাথা সেই মামাবাবু নির্ভেজাল বাঙালি। এ-হেন মামাবাবু প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক হিরো। 'কুহকের দেশে', 'ড্রাগনের নিশ্বাস', 'পাহাড়ের নাম করালী' বা 'অতলের গুপ্তধন'-এ আমরা সিরিজ-ক্যারেক্টার হিসাবে মামাবাবুর অভিযান-কাহিনী পড়ি। পরবর্তী কালে মামাবাবুকে অবশ্য টেক্কা মারেন ঘনাদা। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরের মন্ত্রশিষ্য বীরদর্পী ঘনাদা। কিন্তু ঘনাদার গুলগল্পের বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্বগুলি তিনি নির্ভেজাল পেশ করেছেন।

প্রথম থেকেই বাংলা এস.এফ. কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী পরিবেশনের মধ্যেই তার মোক্ষ সন্ধান করেছে। জুল ভার্নের অনুরাগী প্রেমেন্দ্র মিত্রও এই ধারা অনুসরণ করেছেন। তাঁর উক্তিকেই সাক্ষী মানছি: 'বিজ্ঞান-নির্ভর বা বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী বলতে আমারা যা বুঝি গত শতাব্দীতে তার জন্ম। ফরাসি লেখক জুল ভার্নই এ জাতীয় কাহিনীর প্রবর্তক।...বিজ্ঞানের অক্লান্ত সন্ধান নিত্য যে নতুন জগৎ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে তুলছে তার বিস্ময়-বিহ্বলতা পাঠক-মনে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়াই এ কাহিনীর আসল লক্ষ্য।

প্রথম ইংরেজি পড়তে শিখে স্কুলের লাইব্রেরিতে জুল ভার্নের একটি উপন্যাস পেয়ে তার মধ্যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীকালে সেই ছেলেবেলার স্বপ্নতাই এই ধরনের কাহিনী লেখার চেষ্টায় আমায় উৎসাহিত করেছে।' (ভূমিকা,

বিজ্ঞান-নির্ভর গল্প, ১৯৬৪)।

বাংলা এস.এফ.-এর বিবর্তন ও পুষ্টি ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণের ইঙ্গিত রয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই বক্তব্যের মধ্যে। শুধু কিশোরোপযোগী অ্যাডভেঞ্চার রচনাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এস. এফ. যে অতিরিক্ত কিছু অবলম্বন সরবরাহ করে না তার সেরা প্রমাণ বিভূতিভূষণের 'চাঁদের পাহাড়'। মৌলিক বাংলা অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী হিসাবে আজো কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারে নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যাবতীয় এস. এফ. অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে সেরা 'পাতালে পাঁচ বছর-'এ জুল ভার্ন-এর কিছুটা স্বাদ পাওয়া যায়।

'জাত গল্প যাকে বলি, মানুষের হৃদয়ের মনের ভাবাবেগ নিয়েই তার প্রধান কারবার। বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনী মনের সেসব সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামায় না।' লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'মনু-দ্বাদশ' উপন্যাসটি রচনা না করলে এই উক্তিই সাক্ষ্য হয়ে থাকত যে তিনি এস.এফ.-এর মর্ম-উপলব্ধি করেন নি। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রথম এবং সম্ভবত আজ অবধি একমাত্র সিরিয়াস নিছক বয়স্কপাঠ্য এস. এফ. 'মনু-দ্বাদশ' পূর্বোক্ত উক্তিকেই স্ববিরোধী অসতর্ক মন্তব্য হিসাবে উপেক্ষা করার অনুমতি দেয়।

এক পারমাণবিক প্রলয়ের পরের কথা। দূর ভবিষ্যতের মনু-দ্বাদশ কালে এই পৃথিবীর যৎসামান্য বস্ত্রাবৃত দ্বিপদ কিছু জীবকে প্রথমে সনাক্ত করতে হয় মানুষ রূপে। দশটি উল্লাসে বিভক্ত প্রাচীনগন্ধী ভাষায় পরিবেশিত ভবিষ্যতের এক আদিম সমাজের এই কাহিনীর মধ্যে একটি মাত্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করেছেন লেখক — গামা-ঘা। ভল্ল, নিক্ষেপ-রজ্জু, হ্রস্ব-কৃপাণ ইত্যাদি হাতিয়ার সম্বল হলেও, তিন শিবিরে বিভক্ত প্রজনন শক্তিহীন মানবসমাজের শেষ বিংশ বিংশতি প্রতিনিধিদের মধ্যে ঈর্ষ্যা দ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে নি। তারই মধ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গুটিকয়েক মানুষ মুক্তির সন্ধানে লুপ্ত ইতিহাস ও সভ্যতার বিবরণ সংগ্রহসূত্রে জানতে পারে গামা-ঘা ও প্রজন্ম ক্ষমতা বিলুপ্তির কারণ। সুদূর অতীতে শক্তি ও সমৃদ্ধির শীর্ষাসীন তাদের ঋষিতাপস-প্রতিম পূর্বপুরুষরা ভ্রষ্ট হয়েছিলেন স্বধর্ম থেকে। 'ধূলিকণাকেও সূর্য-প্রমাণ করার বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। কিন্তু সেই বিদ্যাই সমস্ত ধরণীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। সূর্যস্ফুরণ বিদ্যা কাফ্রামদের মতো আরো বহু মানবসম্প্রদায় তখন অর্জন করেছে। ব্যোম বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তারা অগ্রসর।'

পৌরাণিক কাহিনীর স্বাদ বিশিষ্ট অথচ ভবিষ্যতের ভিন্ন মানুষ ও ভিন্ন সমাজের এই 'ডিস্‌টোপিয়া' ধাঁচটি বাংলা এস. এফ.-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে।

কিশোর মহলে চার ও পাঁচের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এস.এফ.-এর চেয়ে অধিক জনপ্রিয় হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'অমানুষিক মানুষ', 'অসম্ভবের দেশে', 'মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন' ও 'ময়নামতীর মায়াকানন'। বিশেষ ক'রে

শেষ বই দু'টি। মঙ্গলগ্রহীদের আগমন ও তাদের কীর্তিকলাপের চেয়েও আকর্ষণীয় হেমেন্দ্রকুমারের বর্ণনার ভাষা। মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজ নামার সময় সেই বিচিত্র শব্দ ভোলার নয়: যেন হাজার হাজার স্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল টানছে আর টানছে।

চারের দশক থেকে এস. এফ. লিখে চলেছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এক একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে গল্পের মোড়কে পরিবেশন করা— বিজ্ঞান শিক্ষাদানই যার মূল উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করতে তাই আগ্রহী নন তিনি। কিন্তু ১৩৫০-এ তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'ধূমকেতু', যেখানে নির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষকে শক্তিকণায় রূপান্তরিত ক'রে বাঁচিয়ে রাখার উপযোগী মৃত্যু-কিরণ উদ্ভাবন করেছেন তিনি, কিংবা 'আমার বন্ধু সুধাবিন্দু'র দর্শনলাভে টাইম-টাইট দরিয়া-মঞ্জিলে প্রবেশ করেছেন, তাঁর এস. এফ.-কাহিনী নতুন মাত্রা পেয়েছে।

সত্যজিৎ রায়

১৯৬১ বাঙালির কাছে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ রূপে। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বনে এই বছরের মে মাসে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র 'তিন কন্যা' ও ডকুমেন্টারি 'রবীন্দ্রনাথ' প্রথম প্রদর্শিত হয়। সত্যজিৎ রায়ের জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও এই বছরের মে মাসেই ঘটে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সত্যজিৎ রায় তাঁর পারিবারিক পত্রিকা 'সন্দেশ'কে নবরূপে আবার প্রকাশ করলেন। 'সন্দেশ'-এর সম্পাদনা সূত্রে সাহিত্যকর্মেও প্রবৃত্ত হলেন তিনি। মে থেকে সেপ্টেম্বর, নতুন 'সন্দেশ'-এর প্রথম পাঁচটি সংখ্যায় তিনি লিয়র ও ক্যারলের নন্‌সেন্স রাইমের কয়েকটি অনবদ্য রূপান্তর উপহার দেন। (পরবর্তীকালে 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)। তাঁর প্রথম মৌলিক গল্প প্রকাশিত হয় এই পত্রিকারই ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম সংখ্যা জুড়ে— 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'। নবম সংখ্যায় মৌলিক কবিতা 'মেছো গান'। দশম ও একাদশ সংখ্যায় যথাক্রমে দু'টি গল্প 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' ও 'টেরোড্যাক্‌টিলের ডিম'।

'সন্দেশ'-এর দাবি মেটাতে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বছরে ছড়া, কবিতা ও গল্প— হয়ত পরীক্ষামূলক ভাবেই বিবিধ ফর্ম নিয়ে নাড়াচাড়াও করেছেন। কিন্তু প্রথম মৌলিক গল্প 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি'র পর আর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয় নি। আত্মপ্রকাশের নতুন জগতের দরজা খুলে নিয়েছেন তিনি অনায়াসে। বাংলার স্বীকৃত লেখকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়ই জীবনের প্রথম গল্প হিসাবে সায়েন্স ফিকশন রচনা করেছেন। শুধু প্রথমই নয়, প্রথম তিনটি গল্পই।

প্রথম গল্পের 'শঙ্কু'—প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু—সিরিজ-চরিত্র হিসাবে পরবর্তীকালে উপহার দিয়েছে শঙ্কুর বৈজ্ঞানিক অ্যাডভেঞ্চারের গল্পমালা। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের যাবতীয় গোয়েন্দা কাহিনী যেমন ফেলুদা-সিরিজের অন্তর্ভুক্ত, সায়েন্স ফিকশন তা নয়। শঙ্কুর শরণাপন্ন না হয়েও তিনি বহু সার্থক সায়েন্স ফিকশন রচনা করেছেন এবং তাঁর পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটিও এই গোত্রভুক্ত।

শঙ্কু সিরিজের ছ'টি গ্রন্থের ২৯টি গল্প ছাড়াও 'এক ডজন গপ্পো', 'আরো এক ডজন', 'আরো বারো', 'এবারো বারো' ও 'একের পিঠে দুই' নামক পাঁচটি সংকলনের দশটি গল্প এবং 'পিকুর ডায়েরি ও অন্যান্য'-র অন্তর্ভুক্ত বড়দের জন্য লেখা দু'টি গল্প 'সবুজ মানুষ' ও 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি' সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশন-চর্চার নিদর্শন। আর আছে অপ্রকাশিত 'এলিয়েন'-এর ইংরেজি চিত্রনাট্য।

সায়েন্স ফিকশনের উপকরণ বিচারে গল্পগুলির একটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়। (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোনো কোনো গল্প একাধিক শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।)

[ক] মহাকাশ অভিযান ও গ্রহান্তরের আগন্তুক :

১. ব্যোমযাত্রীর ডায়রি ২. বঙ্কুবাবুর বন্ধু ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য ৫. অঙ্ক স্যার গোলাপী বাবু ও টিপু ৬. সবুজ মানুষ ৭. এলিয়েন (চিত্রনাট্য)।

[খ] রোবট ও চেতনাসম্পন্ন যন্ত্র :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু ২. শঙ্কুর শনির দশা ৩. কম্পু ৪. অনুকূল।

[গ] আশ্চর্য প্রাণী ও উদ্ভিদ (কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক) :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও হাড় ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত ৫. সেপ্টোপাসের খিদে ৬. আশ্চর্য প্রাণী ৭. স্বপ্নদীপ ৮. মরুরহস্য ৯. কর্ভাস ১০. প্রোফেসর হিজিবিজবিজ ১১. শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান।

[ঘ] পরশপাথর ও অমৃত :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা ২. শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ ৩. হিপনোজেন ৪. মানরো দ্বীপের রহস্য ৫. ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ৬. ময়ূরকণ্ঠী জেলি।

[ঙ] টাইম মেশিন :

১. টেরোড্যাক্টিলের ডিম।

[চ] অদৃশ্য প্রাণী :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও।

[ছ] অমীমাংসিত বিস্ময়কর রহস্য (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক বা প্রাণীবিষয়ক) :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ইজিপ্সীয় আতঙ্ক ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও চী-চিং ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও কোচাবাম্বার গুহা

৫. প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স ৬. মানরো দ্বীপের রহস্য ৭. কম্পু ৮. একশৃঙ্গ অভিযান।

[জ] অসৎ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তির অপব্যবহার :

১. প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও ২. প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল ৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও গোরিলা ৫. মরু রহস্য ৬. কর্ভাস ৭. ডাঃ শেরিং-এর স্মরণশক্তি ৮. শঙ্কুর শনির দশা ৯. শঙ্কুর সুবর্ণ সুযোগ ১০. হিপনোজেন ১১. মহাকাশের দূত ১২. নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো ১৩. প্রোফেসর শঙ্কু ও ইউ. এফ. ও. ১৪. শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান ১৫. সেপ্টোপাসের ক্ষিদে ১৬. ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট ১৭. ময়ূরকণ্ঠী জেলি।

[ঝ] বিবিধ :

১. টেরোড্যাক্টিলের ডিম ২. ভূতো (অপরাধবোধ সঞ্জাত বিভ্রম ?) ৩. অসমঞ্জবাবুর কুকুর (ব্যঙ্গ) ৪. প্রোফেসর শঙ্কু ও খোকা (শিশু প্রতিভাধর)।

(এই শ্রেণীবিভাগে কাহিনীর মুখ্য প্রবণতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই, উদাহরণ স্বরূপ, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পটিতে একটি রোবট চরিত্র থাকলেও সেটি 'রোবট'-শ্রেণীভুক্ত হয় নি।)

ভিন্ন দৃষ্টিকোণেও সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশনের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, বিশেষত শঙ্কু-কাহিনীর। ভৌগোলিক অভিযান ও ঐতিহাসিক অভিযান। লেখক স্বয়ং শঙ্কুর গল্পকে সায়েন্স ফিকশন অভিহিত করেন নি, 'শঙ্কু কাহিনী' বা 'প্রোফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার' বলে অভিহিত করেছেন। যদিও একটি শঙ্কু-কাহিনী (প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত) প্রকাশিত হয়েছিল সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা 'আশ্চর্য'-য়। অন্যান্য লেখার ক্ষেত্রেও, বয়স্কপাঠ্য রচনা বাদ দিলে লেখক স্বয়ং কখনো 'সায়েন্স ফিকশন' তকমাটি লাগান নি 'অনুকূল' অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দমেলা'র বিশেষ সায়েন্স ফিকশন সংখ্যায়।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিযানের ও ভ্রমণের উপাদান শঙ্কু-কাহিনীর একটি বিশেষ আকর্ষণ হলেও সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশনের মুখ্য আবেদন নয়। কিশোরপাঠ্য হিসাবে রচিত হয়েও তার স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভের ও নিহিতার্থের হদিশ এই 'অ্যাডভেঞ্চার'-এর উপাদান থেকে সংগ্রহ করা যাবে না। সত্যজিৎ রায় ছোটবেলা থেকেই জুল ভার্নের প্রতি আকৃষ্ট। তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, এখনও হই, ভার্নের গল্পের মধ্যে প্রাণ মাতানো নিখুঁত বর্ণনার অঢেল প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে পাঠককে আকর্ষণ ক'রে স্তম্ভিত ক'রে রাখার ক্ষমতা দেখে।' একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি বলছেন : 'ভার্ন যেসব কায়দায় গল্প ফাঁদতেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো, তিনি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনাকে সুকৌশলে নতুন ধাঁচে সাজিয়ে গল্পের চরিত্রগুলিকে তারই মধ্যে বসাতেন এবং সেই সাজানো কাহিনীটিকে চমৎকারভাবে কল্পনা রঙীন

ফ্যানটাসি গল্পের প্যাটার্নে বুনে যেতেন।' ('এস. এফ.' – 'নাউ' পত্রিকা থেকে অনূদিত)[২৩]। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শঙ্কু-কাহিনীর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিযান-সংক্রান্ত পর্বগুলির পিছনে ভার্ন-এর অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সত্যজিৎ যদি ভার্নকেই মডেল করতেন, তা হলে তাঁর সায়েন্স ফিকশন তাঁর পূর্বসূরিদের বালখিল্যতা অতিক্রম ক'রে যেটুকু অগ্রসর হতো সে শুধু পরিবেশনের গুণে – আর্দ্র আবেগ-বর্জিত ঋজু ভাষা, মরচে পড়া বিশেষণের প্রতি বিরাগ, চলচ্চিত্রধর্মী এপিসোডের ধারা নির্মাণ ও শঙ্কু-কাহিনীতে ডায়েরি ফর্মের সুচিন্তিত প্রয়োগ তাঁর রচনার নির্মিতি ও লিপি-কুশলতার নিঃসংশয় প্রমাণ।

ভূগোল অথবা ইতিহাস, ভাষা অথবা অ্যাডভেঞ্চারের অতিরিক্ত যে-সুর যোজনা করেছেন সত্যজিৎ, এখানে সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে চাই। তাই কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার সংক্ষিপ্তসার বর্জন করার উপায় নেই।

'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পে প্রথম প্রোফেসর শঙ্কুর আবির্ভাব তাঁর ডায়রিটি আবিষ্কারের সূত্রে। একটি উল্কার গর্তের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট বিজ্ঞানীর এই ডায়রি যার কালির রং ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, যার কাগজ ছেঁড়ে না বা পোড়ে না। রকেট নির্মাণ পর্বের বিবরণ থেকে ডায়রি শুরু হয়। পরীক্ষামূলক প্রথম রকেটটি প্রতিবেশী অবিনাশবাবুর মূলোর ক্ষেত ধ্বংস করলেও অচিরে শঙ্কু দ্বিতীয় রকেট যোগে মঙ্গলপুরে পাড়ি দেন। তাঁর সঙ্গী পুরাতন ভৃত্য প্রহ্লাদ, বেড়াল নিউটন আর যন্ত্রমানুষ বিধুশেখর। অভিযান কালে প্রহ্লাদ রামায়ণ পড়ে সময় কাটায়, বিধুশেখর বাংলা শিক্ষা করে তার নির্মাতা শঙ্কুর কাছে এবং অবিলম্বে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্বিজু রায়ের গান জোড়ে 'ঘঙো ঘাংঙ কুঁক্ক ঘঙা আগাঁকেকেই ককুং ঘঙা'। মঙ্গলে অবতরণের পর, বিধুশেখরের উচ্চারণে 'ভীবং বিভং'। অর্থাৎ ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয় তারা। মঙ্গলীয় সৈন্যদের আক্রমণ এড়িয়ে কোনোক্রমে রকেটে চড়ে পিঠটান দেয় তারা এবং অজানা এক গ্রহ টাফায় এসে পৌঁছায়। পৃথিবীর চেয়েও প্রাচীন এক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে সেখানে। তাদের প্রত্যেকটি লোকই বিজ্ঞানী এবং এত বুদ্ধিমান একত্র হওয়ায় সেখানে নাকি নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তারা এখন অন্যান্য গ্রহ থেকে কমবুদ্ধি লোক আনিয়ে টাফায় বসবাস করাচ্ছে। বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা করতে নারাজ হওয়ায় ক্রুদ্ধ শঙ্কু তাদের ওপর নিজস্ব উদ্ভাবন নস্যাস্ত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু কিছু লাভ হয় না। তারা তখনো হাঁচতেই শেখে নি। ডায়রি এখানেই শেষ। আর গল্পের শেষে জানা যায় অমন অমূল্য ডায়রিটি শ'খানেক বুভুক্ষু পিঁপড়ে হজম ক'রে ফেলেছে।

সায়েন্স ফিকশনের প্রচলিত মালমশলা ব্যবহার ক'রে রচিত এই প্যারোডির

মধ্যে সুকুমার রায়ের স্পষ্ট ছায়াপাত। প্রোফেসর শঙ্কু 'হেশোরাম হুঁশিয়ারে'র আদলেই গঠিত। ডায়রির পাতা থেকে উদ্ধার ক'রে গল্প পরিবেশনের ঢঙটিও এক। কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় ১৯৬১-তে ইউরি গাগারিনের মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার সুবাদে স্ফীতগর্ব 'বিজ্ঞান' কিন্তু সেই বছরেই রচিত এই গল্পে কোনো আবেগময় আশাবাদ সঞ্চারিত করতে পারে নি। বরং বিধুশেখরের কণ্ঠে দেশ-প্রেমের গান মহাকাশ অভিযানের পিছনে জাতীয়তাবাদী অহমিকার ইঙ্গিত বহন করে। মনে পড়ে যায় প্রায় দশ বছর পরে 'প্রতিদ্বন্দ্বী'র চাকুরিপ্রার্থী সিদ্ধার্থ এ-যুগের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধ। প্রশ্নকর্তাদের প্রত্যাশিত মহাকাশ বিজয় বা মানুষের চন্দ্রাবতরণের উল্লেখ করে নি সে।

এস. এফ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের আরেকটি অনবদ্য প্যারডি 'টেরোডাক্টিলের ডিম'। বদনবাবু অফিস ছুটির পর আউটরাম ঘাটের কাছে একা বেঞ্চিতে বসে-ছিলেন। পাশে এসে বসল এক নতুন টাইম মেশিনের উদ্ভা:ক। এই যন্ত্রের নল দু'টো কানে ঢুকিয়ে বাঁ দিকে টিপলে অতীতে আর ডান দিকে টিপলে ভবিষ্যতে যাত্রা করা যায়। উদ্ভাবকের মুখে আশ্চর্য সব কাল-পর্যটনের কাহিনী শুনলেন বদনবাবু, কিন্তু নিজে যন্ত্রটিকে ব্যবহার করতে পারলেন না। কারণ উদ্ভাবক ও বদনবাবু উভয়েরই মাথায় চুলের সংখ্যা এক হলে তবেই তা সম্ভব হতো! বাড়ি ফেরার পথে বদনবাবু দেখলেন তাঁর মানিব্যাগটি খোয়া গেছে। কিন্তু পঞ্চান্ন টাকা বত্রিশ নয়া পয়সার চেয়ে অনেক বড় প্রাপ্তি ঘটেছে তাঁর। বদনবাবুর সাত বছরের ছেলে বিলটু পঙ্গু। তাকে তিনি রোজ গল্প শোনান। আজ বিলটুর সত্যিকার খুশির খোরাক সংগ্রহ করেছেন তিনি।

শুধু সায়েন্স ফিকশন নয়, সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম সেরা কাহিনী 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'। কাঁকুড়গাছি প্রাইমারি স্কুলে বাইশ বছর ধরে ভূগোল আর বাংলা পড়াচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁকে কেউ কখনো রাগতে দেখে নি। ছাত্ররা তো পিছনে লাগেই, এমনকি শনি-রবিবারে গ্রামের মান্যগণ্য উকিলের বাড়িতে যে আড্ডা বসে সেখানে বুড়োরাও তাঁকে অপদস্থ ক'রে আসর জমায়। ক্রেনিয়াস গ্রহ থেকে একটি মহাকাশযান যখন পথ ভুলে পঞ্চা ঘোষের বাঁশবাগানে অবতরণ করল, ভিন্‌গ্রহী অ্যাং-এর দেখা পেলেন বঙ্কুবাবু। 'আই অ্যাম বঙ্কুবিহারী দত্ত স্যার, বেঙ্গলি কায়স্থ স্যার' বলে নিজের পরিচয় দেন তিনি। এই নির্ভেজাল ছাপোষা সরল মানুষটি ভূগোল পড়ান, কিন্তু হিমালয়ের বরফ দেখেন নি, দীঘার সমুদ্র, সুন্দরবনের জঙ্গল, কি শিবপুরের বাগানের বটগাছটি পর্যন্ত নয়। বিচিত্র শক্তিধর অ্যাং তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের অপূর্ণ সাধ পূরণ করে এক বিচিত্র যন্ত্রের সাহায্যে এবং ফিরে যাওয়ার আগে একটি উপদেশ দিয়ে যায়, 'তোমার দোষ হচ্ছে যে তুমি অতিরিক্ত নিরীহ; তাই তুমি জীবনে উন্নতি কর নি।' পরের দিন উকিল

বাড়ির বৈঠকে বৈশাখী ঝড়ের মতো উদয় হন বঙ্কুবাবু। আমরা একটি নতুন মানুষকে আবিষ্কার করি যে আর নীরবে অপমান বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

বঙ্কুবাবুকে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিতেই পঁচিশটা গ্রহের ভ্রমণকারীর যে পৃথিবীতে আগমন তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কারণ নেই। মানবিক ও হিতকর উদ্দেশ্য বিনা সত্যজিৎ রায়ের কোনো গল্পেই গ্রহান্তরের আগন্তুকদের উদয় হয় নি। যেমন 'মহাকাশের দূত' গল্পের আগন্তুকরা মানবসমাজের খাদ্য, পরিবেশ দূষণ, শক্তি সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু সেখানে লক্ষ করার মতো, কোনো তৈরি সমাধান তারা উপহার দিয়ে যায় নি। তাদের প্রদত্ত একটি আশ্চর্য প্রস্তরখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো শুধু উদ্বুদ্ধ করে অক্লান্ত গবেষণাকে, মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা যোগায়। কিংবা 'অঙ্ক স্যার গোলাপী বাবু ও টিপু' গল্পে মাস্টারমশাই যখন সমস্ত রূপকথার কাহিনীকে কুসংস্কারের জনক বিবেচনা করেন, টিপুর দুঃখ দূর করতেই হামলাটুনির মাঠে ট্রিডিঙ্গিপিডি রেখে নেমে আসেন গোলাপীবাবু।

সত্যজিতের গল্পে গ্রহান্তরের আগন্তুকের এই নিহিতার্থ যে কষ্ট-কল্পনা নয় তার সাক্ষী 'দা এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য। চলচ্চিত্রটি গৃহীত না হওয়ার বৃত্তান্ত পরে আলোচিত হয়েছে, এখানে শুধু তার কাহিনীটি আমাদের বিবেচ্য।

১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারিতে জীবনীকার মারি সিটন-কে একটি চিঠিতে সত্যজিৎ লিখছেন :[১১]

> I am already at work on 2 more stories—both original. One, a science-fiction story involving a space ship with only one supremely intelligent Martian occupant—landing on the outskirts of a remote village with as little contact with 'civilization' as possible. Martian first taken for a monster, then for a God—and so on.

এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি চিহ্নের বন্ধনীর মধ্যে 'সভ্যতা'। এই 'সভ্যতা'র সঙ্গে ন্যূনতম সংস্পর্শে এসেছে যে উপান্তবর্তী গ্রামটি তারই সবচেয়ে লাঞ্ছিত অসহায় একটি বালকের ['হাবা'] সঙ্গেই শুধু গড়ে ওঠে পরম বুদ্ধিমান ও অলৌকিক ক্ষমতাধর 'এলিয়েন'-এর বন্ধুত্ব। হাবা-র সঙ্গে এলিয়েন লুকোচুরি খেলে, ব্যাং সাপ জোনাকি পোকা পদ্মফুল কাঠবিড়ালি আর বুলবুলি উপহার পেয়ে খুশি হয় এলিয়েন। ফেরার সময়ে হাবার কাছে শেখা ফুল-নদী-ধানক্ষেত নিয়ে সহজ একটি লোকগীতির সুর ভাঁজে। এলিয়েন আর হাবা, সদর্থক সভ্যতার দুই প্রতিনিধি, তাদের মধ্যে প্রযুক্তিগত সুবিধাভোগের স্তরভেদ ব্যতীত কোনো ব্যবধান নেই। এক দিকে এদের দু'জনের সম্পর্ক যত বিকশিত হয় তার প্রেক্ষাপটে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের তথাকথিত 'সভ্যতা'র স্বরূপ।

এই 'সভ্যতা'র প্রতিনিধি বাজোরিয়া ফোটোগ্রাফারদের সাক্ষী রেখে গ্রামোন্নয়নের ব্রত নেয় (গরিব দেশে ধনীর 'ইমেজ' রক্ষা বড় কঠিন)। ডেভলিন নামক এক ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগের সুবাদে মাকিন প্রযুক্তি এই ব্যবসায়ীর তুরুপের তাস। আর সাংবাদিক মোহন সেখানে সত্যদ্রষ্টা কিন্তু নিষ্ক্রিয়।

গ্রহান্তরের আগন্তুকদের অলৌকিক ক্ষমতা যেমন বঙ্কুবাবু বা হাবার মতো সরল অথচ পর্যুদস্ত মানুষেরই হিতার্থে নিয়োজিত হয় তেমনই সত্যজিতের বিভিন্ন গল্পে অত্যন্ত সাদামাটা মানুষই শুধু অর্জন করে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতা। প্রোফেসর শঙ্কু গিরিডিতে বসে অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেন খাঁটি দিশি উপকরণ কাজে লাগিয়ে। তেত্রিশ টাকা সাড়ে সাত আনার মধ্যে কাজ সারতে হয় বলে তাঁর রোবটের চোখ ট্যারা হয়। শুধু তাই নয় তাঁর উদ্ভাবনগুলির মধ্যে কোনোটারই কারখানায় অধিকসংখ্যায় উৎপাদন সম্ভব নয়। এগুলি মানুষের হাতের কাজ—এক ধরনের শিল্পকর্ম। কিন্তু প্রোফেসর শঙ্কু অলৌকিক ক্ষমতাধর নন। তিনি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। তাঁর বিচিত্র কার্যকলাপের বা অভিযানে সাফল্যের পিছনের কারণ সর্বদাই যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু শঙ্কু এমন অনেক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী যার শেষ পর্যন্ত কোনো সমাধান হয় না। শুধু তাই নয়, এমন পরিস্থিতিরও প্রায়ই উদ্ভব হতে দেখা যায় যেখানে শঙ্কু নীরব দর্শক, মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সমাজের চোখে অতি নগণ্য কোনো ব্যক্তি। যেমন নকুড়বাবু।

মাকড়দার অধিবাসী নকুড়বাবুকে 'কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস' চিঠি গ্রহণ করতে হয়। অতি গোবেচারা ও নিরীহ এই ব্যক্তিটি শঙ্কুর সামনে চেয়ারের ডগা ছুঁয়ে বসেন যখন, মুঠোয় ধুতির কোঁচা, ঘাড়ের হেলানো ভঙ্গিটিতেও কৃতার্থতা আর অফুরন্ত বিনয়। 'নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো' গল্পে তাঁরই হস্তক্ষেপে শঙ্কু তাঁর অপহৃত গবেষণাপত্র ফিরে পান। নকুড়বাবু সব অর্থেই সাধারণ হলেও তাঁর অদ্ভুত একটি ক্ষমতা, তিনি অন্যের মন পড়তে পারেন, ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পান, এমন কি নিজে যা কল্পনা করেন অন্যকে দেখাতে পারেন। শঙ্কু ও নকুড়বাবু কুচক্রী বিজ্ঞানীর খপ্পরে পড়লে নকুড়বাবু সোনার শহর এল ডোরাডোর লোভ দেখিয়ে ব্রেজিলের গহন জঙ্গলের মধ্যে টেনে আনেন দুর্বৃত্তকে। এবার তাঁর কাজে লাগে বহুদিন আগে পড়া শ্রীগুরু লাইব্রেরির বরদা বাঁড়ুজ্জের ব্রেজিল বিষয়ক একটি বই। যাতে ছবি এঁকেছিলেন মদন পাল। সোনার শহর এল ডোরাডোর বাড়িগুলো অবশ্য ছবিতে দেখতে হয়েছিল টোল-খাওয়া টোপরের মতো—তাও সিধে নয় ট্যারচা। কিন্তু সাহেব ব্রাজিলের জঙ্গলের মধ্যে তাই দেখেই বলল, এল ডোরাডো ইজ ব্রেথ-টেকিং! সাহেবদের ঠকিয়ে তিনি শেষপর্যন্ত ঠাকুমার জন্য তিরিশ টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ সংগ্রহ করতে পেরেই সবচেয়ে খুশি।

নকুড়বাবুর তাও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, কিন্তু পাপাডোপুলসের তো তাও নয়। এথেন্সের রাস্তায় পকেট মারতে সিদ্ধহস্ত সে—এইমাত্র। কিন্তু 'হিপনোজেন' গল্পে তারই দৌলতে রক্ষা পেয়েছিল শঙ্কু ও বিজ্ঞানী সামারভিল্। অস্লোর উপকণ্ঠে এক মধ্যযুগীয় কেল্লার ঢং-এর বাড়িতে ধনকুবের ক্রাগের আমন্ত্রণে এসে ফাঁদে পড়েছিল তারা। ক্রাগ বিজ্ঞানী, স্বয়ং আয়ুবৃদ্ধির উপায় বার ক'রে ইতিমধ্যে তিনবার অবধারিত মৃত্যুকে ঠেকিয়েছে। কিন্তু এবার তার মৃত্যু আসন্ন জেনে বিজ্ঞানীদের ডেকে এনেছে। ক্রাগের মৃত্যুর পর তারা যাতে ক্রাগের নির্দেশ অনুসারে আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলে। ক্রাগের দুই রোবটের প্রহরা এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় নেই। সবচেয়ে আশংকার কথা ক্রাগ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিকারী রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বৈজ্ঞানিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে হিপ্‌নোজেন নামে মারাত্মক এক রাসায়নিক দ্রব্য। পাপাডোপুলস শেষে রোবটের পকেট মেরে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ছিঁচকে চোরের কীর্তির পাশে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ম্লান প্রতিপন্ন হয় নৈতিকতার কারণে।

আয়ুবৃদ্ধির তৃষ্ণা (আর পরশপাথরের সন্ধান)—এই থিম্ নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন সত্যজিৎ—যাতে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে অনেক ধরনের ক্রাগকে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু তার মধ্যে 'ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট' গল্পটির মেজাজ একেবারেই আলাদা। রিটায়ার্ড স্কুল মাস্টার নিশিকান্তবাবু বাতের চিকিৎসা করাতে করিমগঞ্জে মাধব ডাক্তারের কাছে এসে ঘটনাচক্রেই ম্যাকেঞ্জি সাহেবের বাগানে আবিষ্কার করেন প্রায় অমৃত-সম একটি অচেনা ফল। বহু ভিটামিন ও অচেনা রাসায়নিক সমৃদ্ধ, স্বাদগন্ধে ও উপকারিতায় যার জুড়ি নেই। নিশিকান্ত বাবু প্রথমে নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন নি এত বড় একটা আবিষ্কারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। তারপর অবশ্য তাঁর মনে হয়, এই যে মানুষ এত রকম শাকসব্জি ফলমূল শস্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করছে, তার শুরু কিভাবে হল তাও কি জানি আমরা? আম জাম কলা কমলা ইত্যাদি কে বা কারা প্রথম খেয়ে সেটাকে খাদ্য হিসাবে প্রমাণ করল, ইতিহাসে তার কি কোনো উল্লেখ আছে? গল্পের শেষে পৌঁছে আমরা দেখি সাধারণ ইতিহাসের এই রেওয়াজের সঙ্গেই সংগতি রেখে ম্যাকেঞ্জি ফ্রুটের আবিষ্কারক নিশিকান্তবাবুর নামটিও আর কোনোদিন নথিবদ্ধ হবে না। এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিশিকান্তবাবুর আবিষ্কারটিকে কুক্ষিগত করেছে ফলের চাষ শুরু করেছে ও কারখানা খুলেছে সংরক্ষক রসে ভরা টিনে পুরে ফলটি বেচবার জন্য। একদিকে নিম্নবিত্ত আবিষ্কারক যেমন স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হলেন, অন্যদিকে আকাশছোঁয়া দাম ফলটিকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে গেল।

আটপৌরে মানুষরাই শুধু সত্যজিতের জগতে আশ্চর্য বা অলৌকিক মানবিক

ক্ষমতাবলে উজ্জ্বল নয়, অমানুষ রোবটও কখনো কখনো মানুষের অমানবিক আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'অনুকূল' একই নামধারী একটি রোবটের কাহিনী। রোবট সাপ্লাই এজেন্সির দোকান থেকে নিকুঞ্জবাবু তাকে ভাড়া ক'রে আনেন। সাধারণ গৃহভৃত্যের সব কাজই করে সে, শুধু রান্না ছাড়া। প্রথমেই নিকুঞ্জবাবুকে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়, বাড়ির বাইরে কোনো কাজে যাতে তাকে পাঠানো না হয়, যেমন পান-সিগারেট ইত্যাদি আনাতে। 'তুই' বলে সম্বোধনটাও তার পছন্দ নয়, আর গায়ে হাত তোলা তো মোটেই বরদাস্ত করবে না— প্রতিশোধ নেবেই এবং তার ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। নিকুঞ্জবাবুর এক কাকা কিছুদিনের জন্য বাড়িতে আসেন অতিথি হিসাবে। তাঁকে সতর্ক করা সত্ত্বেও হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গিয়ে তিনি অনুকূলকে চড় মারেন। কারণ, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান গাইছিলেন, অনুকূল তাঁর কথার ভুল ধরেছিল। যথা প্রত্যাশিত, অনুকূলের শক্-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। পরে জানা যায়, আরো একটি কারণ প্ররোচিত করেছিল অনুকূলকে। আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন নিকুঞ্জবাবু, এবার কাকার মৃত্যুতে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনিই লাভ করবেন। অনুকূল আমাদের ঘরে চিরাচরিত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটিকে বেজায় অস্বস্তিকর ক'রে তোলে। অনুকূলের কীর্তি আমাদের সত্যজিতের সেই অনবদ্য লিমেরিক-টিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়:

রামফাঁকিবাজ চাকর জোটে সাধনবাবুর ভাগ্যে,
বাবু বলেন, 'রোবট রাখি। চাকরগুলো যাক্‌গে।'
রোবট হল কাজে বহাল,
তার ফলে আজ বাবুর কি হাল?
রোবট বলে, 'কই রে ব্যাটা!' বাবু বলেন, 'আজ্ঞে?'

— কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯০।

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশন নির্ভেজাল বাঙালি ঘরের সন্তান। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা ৭২ নং-এর মেসবাড়ি ছেড়ে বেরোবার পরে বাঙালির খোলস পুরো ত্যাগ করেন। অভিযান কালে অলস নিদ্রাপ্রিয় মামাবাবুর বাঙালিআনাও আর গল্পের স্বার্থরক্ষায় জরুরি নয়। সত্যজিতের কাহিনীতে শুধু বাঙালি পোশাকে ও কিছু বিশেষ ভোজ্যের প্রতি আসক্তিসম্পন্ন চরিত্র আন্তর্জাতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হয় না। বাঙালি মন ও মানুষ সেখানে কাহিনী-কাঠামো বা মূল্যবোধের সংঘাত-কেন্দ্রিক সমস্যা ইত্যাদির অরগ্যানিক দাবি পূর্ণ করে।

আমাদের অত্যন্ত পরিচিত চেনাজানা মানুষ; মাঝারি মানুষ অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত হয় যাদের দৈনন্দিন ছকে বাঁধা জীবন, সত্যজিতের দুনিয়ায় কল্পনার দুঃসাহস বা অলৌকিক কিছু ক্ষমতা অর্জনের সূত্রে তাদের রূপান্তর ঘটে যায়। এক অর্থে ইচ্ছাপূরণের কাহিনী নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশেষ মূল্যবোধেরও

পরিচায়ক। রোবট, কম্পিউটার, উড়ন্ত চাকি, এলিয়েন, টেলিপ্যাথি—সায়েন্স ফিকশনের সব উপকরণই ব্যবহার করেছেন তিনি। কিন্তু যন্ত্রমানুষ ভিন্‌গ্রহী বা প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জৈবিক বা যন্ত্রকৌশলের ব্যাখ্যা নয়, এই পৃথিবীরই চেনা মানুষের উপর অচেনা আলো ফেলে তিনি সাহিত্য নামক গবেষণাগারে মূল্যবোধ নিয়ে পরীক্ষণ চালান।

সত্যজিতের সায়েন্স ফিকশনে অলৌকিক ও ব্যাখ্যাতীত নানা প্রসঙ্গের উত্থাপন বহু সমালোচককে বিভ্রান্ত করেছে এবং তাঁর এই জাতীয় কাহিনীকে 'সায়েন্স ফিকশন'-এর পরিবর্তে 'সায়েন্স ফ্যান্টাসি' অভিহিত ক'রে তাঁরা স্বস্তি লাভ করেছেন। এর পিছনে বলাই বাহুল্য ভার্নকে সায়েন্স ফিকশনের ও ওয়েল্‌স-কে সায়েন্স ফ্যান্টাসির আদর্শ প্রতিনিধি রূপে কল্পনা ক'রে নেওয়ার একটি ভ্রান্ত যুক্তির সমর্থন আছে। সাহিত্যে ফ্যান্টাসির সঙ্গে বাস্তবতার কোনো বিরোধ নেই। ফ্যান্টাসি (যেমন সত্যজিতের গল্পের অলৌকিক পরিমণ্ডল বা ব্যক্তি-বিশেষের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা) আসলে সত্য অন্বেষণের হাতিয়ার। ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে বা অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি ক'রে নিয়ে মানুষ, মানুষের সম্পর্ক ও সমাজকেই যা পরখ করে। বঙ্কু, নকুড় বা নিশিকান্তবাবুর মতো ছাপোষা মাঝারি মানুষদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড আসলে আরো বিস্ময়কর ও অলৌকিক একটা ঘটনাকেই পরিস্ফুট ক'রে তার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করতে চায়। শুধু বিষয়-বৈভবের দাপটেই দুনিয়াদারী চালাবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করা যায় আমাদের সমাজে। এবং প্রোফেসর শঙ্কু সাধারণ মানুষ না হয়েও সে বিষয়ে সচেতন বলেই সম্ভবত তাঁর বিস্ময়কর সব উদ্ভাবন কখনোই বৈষয়িক কাজে লাগে না। ব্যবসায়ী-দের কারখানায় যার ভুরি ভুরি উৎপাদনও সম্ভব নয়।

'আশ্চর্য' ও এস. এফ. সিনে ক্লাব

বাংলা ভাষার এবং ভারতের প্রথম সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা 'আশ্চর্য' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-র জানুয়ারি মাসে। আকাশ সেন ছদ্মনামে অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে এস.এফ.-কে জনপ্রিয় করার আন্দোলন। 'আশ্চর্য'র প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র।

'আশ্চর্য'র প্রথম সংখ্যাতেই ওয়েল্‌স-এর 'টাইম মেশিন' উপন্যাস ও ব্র্যাড-বেরির গল্প 'সার্সাপেরিলার গন্ধ'-র অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা সম্পাদকের সুবিবেচনার পরিচয় বহন করে। তা ছাড়া এই সংখ্যাতে ফ্রেডারিক ব্রাউনের গল্প 'ব্রহ্মাস্ত্র', সমরজিৎ কর ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের দু'টি মৌলিক কাহিনী এবং আর্থার সি. ক্লার্ক-এর পরিচিতি সহ কৌতুক-চিত্র ও কমিক স্ট্রিপও প্রকাশিত হয়েছিল।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কিছু সাহিত্যিককে এস.এফ.-চর্চায় উৎসাহিত করেছিল 'আশ্চর্য', সত্যজিৎ রায়কে লাভ করেছিল উৎসাহী পরামর্শদাতা ও লেখক হিসাবে। তা ছাড়া 'আশ্চর্য'র লেখককুলের মধ্যে সম্পাদক সহ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর, রণেন ঘোষ ও মনোরঞ্জন দে প্রমুখ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু 'আশ্চর্য'র বড় আবিষ্কার গুরনেক সিং ও দিলীপ রায়চৌধুরী।

ব্র্যাডবেরির ভক্ত গুরনেক সিং-এর 'হারানো ছেলে', 'মৃত্যুদূত', 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে' ইত্যাদি গল্প পড়লে বিশ্বাস করা শক্ত লেখক বঙ্গসন্তান নন। অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তিনি ব্র্যাডবেরির কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'মঙ্গল স্বর্গ'।

রাবার-টেক্‌নোলজিস্ট রসায়নবিদ দিলীপ রায়চৌধুরীর ভারতে পারমাণবিক গবেষণার ভিত্তিতে রচিত 'অগ্নির দেবতা হেফেস্‌টাস' বা সেযুগে সাধারণ মানুষের প্রায় অশ্রুত প্লাজ্‌মা বা লেসার্‌-কেন্দ্রিক কাহিনী 'ক্লুগেল ব্লিংস্‌', 'প্লুটোর অভিশাপ', কি 'টিথোনাস'-এর আবেদন আজও অমলিন। ১৯৬৬-তে এই তরুণ প্রতিভাধরের অকাল প্রয়াণে সত্যজিৎ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধনের শোক-বার্তা প্রকাশিত হয়েছিল আশ্চর্য-র পাতায়।[২২] আমেরিকায় প্রবাসী হওয়ার পর জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন কর্মী গুরনেক সিং-কেও হারিয়েছি আমরা।

এস. এফ.-এর পালে হাওয়া লাগাতে বদ্ধপরিকর 'আশ্চর্য'-র কর্তাদের আরেক কীর্তি — আকাশবাণী থেকে বারোয়ারি সায়েন্স ফিকশন গল্প সম্প্রচার। ১৯৬৬-র ১৬ ফেব্রুয়ারি 'সবুজ মানুষ' নামে গল্পপাঠের আসরে হাজির হয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী ও সত্যজিৎ রায়।

'আশ্চর্য'য় সত্যজিৎ রায়ের কাহিনী 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত' ও 'ময়ূরকণ্ঠী জেলি' ছাড়া প্রকাশিত হয়েছিল 'নাউ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'SF' প্রবন্ধের অনুবাদ। সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারও প্রকাশিত হয়েছিল, যা এস.এফ. সিনে ক্লাব সূত্রে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হবে।

পাঁচ বছর চলার পর 'আশ্চর্য' বন্ধ হয়ে যায়। অদ্রীশ বর্ধনের সম্পাদনায় আবার নতুন এস.এফ. পত্রিকা 'ফ্যানটাসটিক' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫-এ। সত্যজিৎ রায় এই পত্রিকার নামাংকন (Logo) ক'রে দেন।

'আশ্চর্য' প্রকাশের দু'বছরের মধ্যে এই পত্রিকাকে ঘিরে স্থাপিত হয় 'এস.-এফ. সিনে ক্লাব' যার প্রাণপুরুষ ছিলেন সক্রিয় সভাপতি সত্যজিৎ রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও সেক্রেটারি।

১৯৬৫-র ২৬ জানুয়ারি ক্লাবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ 'ভিলেজ অফ দা ড্যাম্‌ড্‌' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্মরণী-পুস্তিকায়

সত্যজিৎ রায় লিখেছিলেন : 'প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি সায়েন্স ফিকশনের ভক্ত ; তাই এস. এফ. সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমায় এতখানি নাড়া দিয়েছে। এ ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমি আনন্দিত ; এ ধরনের ক্লাব বোধ করি শুধু এদেশেই সর্ব প্রথম নয়, বিদেশেও আর নেই। ক্লাবের উদ্বোধন উপলক্ষে এই কামনাই করছি সারা পৃথিবী থেকে বাছাই করা সেরা এস এফ. ফিল্মের বহু মনোগ্রাহী এবং চিন্তা-উন্মেষক প্রদর্শনী যেন সভ্যরা দেখতে পান।' (– আশ্চর্য, ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, ইংরেজি থেকে অনূদিত)।

এস.এফ. সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সত্যজিৎ রায়কে প্রেরিত ওয়াল্ট ডিজনি, রে ব্র্যাডবেরি, আর্থার সি ক্লার্ক ও কিংসলি অ্যামিসের অভিনন্দন পত্র-গুলি স্মরণী-পুস্তিকায় এবং পরে তার অনুবাদ 'আশ্চর্য'য় (১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল।

স্মরণী-পুস্তিকার প্রচ্ছদ থেকে ক্লাবের লোগো-সহ মেম্বারশিপ কার্ড, পোস্টকার্ড ইত্যাদি সবই ডিজাইন করেন সত্যজিৎ রায়। প্রদর্শিত প্রতিটি চিত্রও নির্বাচন বা অনুমোদন করতেন তিনি। মান সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কোনো ছবি প্রদর্শিত হতো না। অজানা ছবির ক্ষেত্রে synopsis দেখে প্রাথমিক নির্বাচনের পর সত্যজিৎ রায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিণ্ডসে স্ট্রিটের প্যাটেল ইণ্ডিয়ার প্রোজেকশন রুমে কাটিয়েছেন। দিল্লি, বম্বে, এমনকি বিদেশ সফরকালেও ক্লাবের জন্য ছবি সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। জাপানে চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত সত্যজিৎ রায় জাপানি এস. এফ. ফিল্ম সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলে উৎসবের উদ্যোক্তারা দ্বিধাগ্রস্তভাবে জানিয়েছিল, জাপানে এখনো মনস্টার জাতীয় ফিল্মেরই প্রাধান্য, সত্যজিৎ রায়ের ক্লাবে দেখানোর উপযুক্ত কিছু নেই। এই ধরনের নানা সংবাদ সহ ক্লাবের নানা ক্রিয়াকলাপের কথা নিয়মিত প্রকাশিত হতো 'আশ্চর্য'র 'এস. এফ. সিনে ক্লাবের টুকরো খবর' বিভাগে। প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের কাহিনীর সারাংশ বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। 'আশ্চর্য' ও 'এস. এফ. সিনে ক্লাব' ছিল পরস্পরের সম্পূরক।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম – 'দা ইনক্রেডিব্‌ল শ্রিংকিং ম্যান', 'দা ফেবুলাস ওয়ার্লড অফ জুল ভার্ন', 'দা ম্যান ফ্রম দা ফার্স্ট সেঞ্চুরি' ও 'এ জেস্টার্স টেল' (চেক্‌), 'দা গোলেম' (নির্বাক, ১৯১৫), ডিজনি-র 'দা সন অফ ফ্লাবার', ব্র্যাডবেরির কাহিনী অবলম্বনে 'দা ইলাস্ট্রেটেড ম্যান' ও 'ফারেনহাইট ৪৫১', কুবরিকের 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' ও '২০০১—এ স্পেস ওডিসি' ইত্যাদি।

১৯৭৬-এর মার্চ সংখ্যা 'আশ্চর্য'র পাঠক ও 'এস. এফ. সিনে ক্লাব'-এর সদস্যদের কাছে বহন ক'রে আনে প্রায় অবিশ্বাস্য এক সুখবর। সত্যজিৎ রায় এস. এফ. চলচ্চিত্র তুলতে যাচ্ছেন। ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। ছবিটির প্রযোজনায় আগ্রহী

বিদেশী কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে।

সত্যজিতের এই অভিশপ্ত 'এলিয়েন'-এর কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে চলচ্চিত্রে এস.এফ. সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

চলচ্চিত্র তার শৈশবেই আকৃষ্ট হয়েছিল এস. এফ. থিমের প্রতি। বাক্স্ফূর্তির পূর্বেই এস এফ.-এর বিচিত্র কল্পনার দৃশ্য আবেদনের মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন চলচ্চিত্র-নির্মাতারা। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ১৯০২-এ গৃহীত জর্জ মেলিয়ে-র ১৬ মিনিটের ব্যঙ্গরসাত্মক ফ্যান্টাসি 'এ ট্রিপ টু দা মুন' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। নির্বাক যুগের সেরা চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে রাশিয়ার লিও কুলেশভ প্রথম এস.এফ-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। আলেক্সি তলস্তয়ের 'দা হাইপারবলয়েড অফ ইঞ্জিনিয়ার গ্যারিন' অবলম্বনে তিনি ১৯২৫-এ সৃষ্টি করেন 'লুচ্ স্মিয়েরচি' (মৃত্যু-রশ্মি)। সমালোচক জন ব্যাক্সটার ফিল্মটি সম্বন্ধে লিখেছেন[১] :

> Leo Kuleshov, one of the Soviet's greatest directors of the period, used this melodrama set in an unnamed Western country as a means of dramatising to the Russian people the sophistication of Soviet film-making, then equal to the world's best....'The Death Ray's degree of commitment was to remain unchallenged until the polemical onslaughts of 'On the Beach' near to our time.

(নেভিল শুট-এর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত 'অন দা বিচ্' পারমাণবিক বিস্ফোরণঘটিত বিভীষিকার এক আধুনিক এস. এফ. চলচ্চিত্র)।

কুলেশভের পরেই নির্বাক যুগের আরেক পরিচালককে আকৃষ্ট করেছিল এস. এফ.। ফ্রিৎজ ল্যাং। ডিক্টেটর-শাসিত ভবিষ্যতের হাই-টেক্ শহরের সেই বৃত্তান্ত, 'মেট্রোপলিস' (১৯২৭) চলচ্চিত্রের ভাষার নিপুণ প্রয়োগে যেমন 'ক্ল্যাসিক' রূপে বিবেচিত, তেমনই আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। কিন্তু এস. এফ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের আদ্যোপান্ত বিবরণ এই প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট নয়। সত্যজিৎ রায়ের 'এলিয়েন' প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তনের আগে এখানে 'আশ্চর্য' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'কুব রিক, ক্রুকো ও SF'-এর প্রাসঙ্গিক অংশটির প্রতি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্যজিৎ লিখছেন[২১] :

> কিন্তু এতকাল পৃথিবীর মধ্যে যারা সেরা পরিচালকের পর্যায়ভুক্ত তাদের কেউই এদিকে [SF-এর] এগোন নি। সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। গত বছরের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে Godard-এর Alphaville ছবি পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার। এ সম্মান SF ছবির ভাগ্যে এর আগে কখনো জোটে নি। Alphaville ছবির পরিচালকের প্রধান কৃতিত্ব ছিল, একটি ও

কৃত্রিম সেট তৈরি না ক'রে, আজকের দিনের প্যারিস শহরের রাস্তাঘাটে হোটেল আপিস ইত্যাদিতে ছবি তুলে, কেবলমাত্র আলো ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের চাতুর্যের জোরে ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-শাসিত এক প্যারিসের চেহারা ছবিতে এনে ফেলেছিলেন। কলাকৌশলের দিক থেকে এ ছবি অবিস্মরণীয় সে কথা বলতে দ্বিধা নেই।

ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ও আমেরিকার স্ট্যানলি কুবরিকের আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় আমরা একাধিক মার্কিন ও ফরাসি ছবিতে পেয়েছি। সম্প্রতি এঁরা দু'জনেই এল্স্ট্রি স্টুডিওতে পাশাপাশি ফ্লোরে কাজ ক'রে দু'জন নামকরা SF লেখকের কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে দু'টি ছবি তুলেছেন। ত্রুফো তুলেছেন রে ব্র্যাডবেরির Fahrenheit 451, ও কুবরিক তুলেছেন তাঁরই অনুরোধে এবং সহযোগিতায় আর্থার ক্লার্ক রচিত 2001 : A Space Odyssey. আমি এবার লণ্ডনে গিয়ে আর্থার ক্লার্কের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে এল্স্ট্রি-তে উঁকি দিই। ত্রুফোর ছবি শুনলাম তোলা শেষ, কিন্তু কুবরিক তখনও তুলে চলেছেন A Space Odyssey. ফ্লোরে গিয়ে মহাকাশযানের অভ্যন্তরের সেট দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কুবরিকের সঙ্গে দু-মিনিট কথা বলে যিনি এই রকেটের নকসা করেছেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম। শুনে অবাক হলাম তিনি নাকি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রকেট ডিজাইনার। এবং তাঁর পরিকল্পিত রকেট নাকি এর আগেই মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে! সিনেমার কাজ কেন করছেন জিগ্যেস করতে হেসে বললেন, এতে পয়সা অনেক বেশি।

কুবরিক ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের বহর ও উৎসাহ দেখে Space Odyssey নির্মাতাদের দাবি মানতে অসুবিধা হয় না। এঁদের মতে এত বড় SF ছবি নাকি এর আগে কখনো হয় নি, এবং এ ছবি আত্মপ্রকাশ করার পর অন্তত দশ বছর নাকি অন্য কোন প্রযোজক মহাকাশ নিয়ে ছবি করার সাহস পাবেন না।

সত্যজিৎ কিন্তু এই নিবন্ধ লেখার কয়েক মাস পূর্বেই 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন সে-কথা আমরা মারি সিটন-কে লেখা তাঁর চিঠি থেকে আগেই জানতে পেরেছি। বিশাল ব্যয়বহুল 'স্পেশাল এফেক্ট'-এর চোখ-ধাঁধানো আড়ম্বরের কথা ধরলে সত্যিই স্পেস ওডিসি-র পর এ-ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে সত্যজিতের মতো ভারতীয় পরিচালকের পক্ষেও ব্রতী হওয়া দুঃসাহসের কাজ ছিল। কিন্তু মহাকাশ-বিষয়ক এস.এফ. চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্যজিতের কল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। 'এলিয়েন'-এর কাহিনী সূত্রে তার পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তবু, স্পেস ওডিসি-র বাজেটের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও 'এলিয়েন' প্রযোজনা করার জন্যও বিদেশী সহযোগিতা অপরিহার্য

ছিল। কাজেই সাহস নয়, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন সত্যজিৎ।

১৯৬৭-র মার্চ সংখ্যা 'আশ্চর্য'-য় লেখা হল, সত্যজিতের এই সায়েন্স ফিকশন গৃহীত হবে বাংলাতেই, অভিনেতাদের মধ্যে থাকবেন একজন খ্যাতনামা আমেরিকান এবং চলচ্চিত্র গ্রহণের কাজ শেষ হওয়ার পরে সত্যজিতের কাহিনী অবলম্বনে আর্থার সি. ক্লার্ক রচনা করবেন একটি উপন্যাস। প্রসঙ্গক্রমে, আর. ডি. বনশলের 'গুপী গায়েন'-সহ এই এস.এফ. ফিল্মের প্রযোজনার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসার কথাও জানানো হয়।

'আশ্চর্য'র পরবর্তী সংখ্যার ঘোষণা, ইংরেজিতে চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়া রচনার কাজ সম্পূর্ণ। সত্যজিৎ রায়ের মুখে কাহিনীটিও শুনেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অদ্রীশ বর্ধন। বাংলাদেশের বীরভূম বা বাঁকুড়ার কোনো গ্রামে ছবিটির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে। টড-অ্যাও স্ক্রিনে প্রদর্শনের উপযোগী চিত্রটি বিদেশী ক্যামেরায় তোলা হবে। আর্ট ডিরেক্টর ভারতীয় হলেও মেক্-আপ ম্যান আসবেন বাইরে থেকে। আসবেন স্পেসশিপ তৈরির এক্সপার্ট-ও। ছবির আমেরিকান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মার্লোন ব্রাণ্ডো ও স্টিভ ম্যাকুইন উভয়েই আগ্রহী।

১৯৬৭-র মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সত্যজিৎ রায়ের সায়েন্স ফিকশন ফিল্ম "অবতার" প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার'। সত্যজিৎ রায় জানান, মাড়োয়ারির ভূমিকায় অভিনয়ে পিটার সেলার্স রাজি হয়েছেন আগাগোড়াই আমেরিকান ইংরেজিতে কথা বলবেন, কিন্তু সেলার্সের বাংলাতে বলার খুব ইচ্ছা, তাই হয়ত তাঁকে কিছু সুযোগ দেওয়া হতে পারে। আমেরিকানের চরিত্রাভিনয়ে মার্লোন ব্রাণ্ডো আগ্রহী, কিন্তু সত্যজিৎবাবুর ইচ্ছা স্টিভ ম্যাকুইনকে নেওয়ার। ম্যাকুইন-কে না পেলে পল নিউম্যান। কাহিনীর নামকরণ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ বলেন, ইংরাজিতে The Alien—বাংলায় সম্ভবত 'অবতার'। গল্পের একটি ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল এই সাক্ষাৎকারে। সত্যজিৎ রায়ের মূল কাহিনী অবলম্বনে আর্থার সি. ক্লার্ক একটি উপন্যাস রচনা করবেন—এই বক্তব্য আবার সমর্থিত হয়। ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা প্রসঙ্গে বিদেশী এজেন্ট মাইক উইলসনের নামও উল্লিখিত হয়।

মাইক উইলসনের সঙ্গে সত্যজিতের হলিউড ও ইংলণ্ড সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্যে সত্যজিতের নামের সঙ্গে মাইকের নিজের নাম যুক্ত করা, বিদেশী প্রযোজক প্রদত্ত অগ্রিম টাকা উধাও হওয়া ইত্যাদি ঘটনার কথা অত্যন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে কৌতুক কাহিনীর মতো সত্যজিৎ রায় ১৯৮০ তে লিপিবদ্ধ করেছেন স্টেটসম্যান পত্রিকায়। 'Ordeals of the Alien' নামে দুই কিস্তিতে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৯] মাইক উইলসন সত্যজিতের ভাষায় 'সীতা হরণ' করেছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত 'এলিয়েন'-এর অধ্যায়ে তাও যবনিকাপাত হয় নি। সেটি ঘটল 'এলিয়েন'-এর চিত্রনাট্যের মিমিওগ্রাফ-করা

কপি থেকে অনেক আইডিয়া আত্মসাৎ ক'রে স্পিল্‌বার্গের ই. টি. আবির্ভূত হওয়ার পর। 'আজকাল' দৈনিকপত্রে দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন 'সত্যজিৎ, এলিয়েন ও স্পিলবার্গ'-এ তার পূর্ণ বিবরণ আছে।[১৭] মারি সিটনের 'সত্যজিৎ রায়' গ্রন্থে 'এলিয়েন' বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা, চিত্রনাট্যের অংশ ও সত্যজিতের আঁকা গ্রহান্তরের অপার্থিব আগন্তুকের দু'টি স্কেচ সাক্ষী যে স্পিল্‌বার্গের ই. টি. 'এলিয়েন'-এর অপভ্রংশ।

উপসংহার

তিনের দশকে 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষার জন্মের পর একটি ঘরানা গড়ে উঠেছিল মূলত মার্কিন একটি উপচার রূপেই। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত 'ভৌতিক কাহিনী', 'গোয়েন্দা কাহিনী' ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দেবে মনে হয়েছিল মনোরঞ্জক লঘু সাহিত্যের এই নতুন শাখা। প্রযুক্তি বিলাসে মত্ত অ্যাফ্‌লুয়েন্ট সোসাইটির পলাতক মনোবৃত্তির দৌলতে জনপ্রিয়তাও অর্জন করবে বলে আশা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে সায়েন্স ফিকশন 'পত্রিকা' বা 'গোষ্ঠিকেন্দ্রিক' উন্মাদনার সঙ্গে সঙ্গে মনোরঞ্জক সাহিত্য হিসাবেও তার আবেদন হারিয়েছে। 'সায়েন্স ফিকশন' পরিভাষাটি জন্মের পূর্বেই যারা এই শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন যেমন শেলি, ভার্ন, ওয়েল্‌স কি চাপেক – তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ব্র্যাডবেরি, স্ত্রুগাৎস্কি, লেম বা সত্যজিতের মতো মননশীল মানবতাবাদী সাহিত্যিকরা। নীতি ও মূল্যবোধ নিরপেক্ষ প্রবল পরাক্রান্ত বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জগতের একটি বিবেক-বন্ধন রচনাসূত্রেই এস. এফ. চর্চায় ব্রতী তাঁরা। এমনকি এস.এফ. যেখানে এই সেতুবন্ধনে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে সেখানে এস.এফ.-এর আশ্রয়েই এস. এফ-কে সমালোচনা করতে দ্বিধাগ্রস্ত নন সাহিত্যিকরা।

বিদেশে সায়েন্স ফিকশন আজ সিরিয়াস অধ্যয়নের বিষয়। ওহিও-র উস্টার কলেজের 'Extrapolation' পত্রিকা ১৯৫৯ থেকে এস. এফ. বিষয়ক অ্যাকাডেমিক আলোচনায় ব্রতী। মননশীল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো দু'টি নাম 'Foundation' (নর্থ-ইস্ট লণ্ডন পলিটেক্‌নিক) ও 'Science Fiction Studies' (ইণ্ডিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটি)। কয়েক শো পাঠক্রম আছে সায়েন্স ফিকশন বিষয়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'সাইকোলজি'র ছাত্রদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে এস. এফ. কাহিনীর অভিনব সংকলন 'Introductory Psychology Through Science Fiction'। নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্স। যার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ল্যারিওনরাইটার্স ওয়ার্কশপ, সায়েন্স ফিকশন রিসার্চ অ্যাসো-

সিয়েশন ও মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আন্তর্জাতিক সায়েন্স ফিকশন সিম্পোশিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে রায়ো ডি জেনিরোয় (১৯৬৯), টোকিও-য় (১৯৭০) এবং সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সায়েন্স ফিকশন মহলের জন্য বুদাপেস্তে (১৯৭১)।

বাংলায় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে সিরিয়াস কোনো গবেষণা হয় নি। বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় সায়েন্স ফিকশন আজও অচ্ছুৎ। 'অন্বেষা' নামে বিজ্ঞান পত্রিকার একটি কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭-তে।[১৬] আর এ-বছর 'শব্দ-শাব্দিক' প্রকাশ করেছে কল্পসমাজ ও কল্পবিজ্ঞানের একটি বিশেষ সংখ্যা।[২০] ১৯৮৭-র 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী।[১৯] কিন্তু এ ফর্দ ব্যতিক্রমেরই।

এই অবস্থার জন্য বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। শিশু ও কিশোরদের জন্যই শুধু সায়েন্স ফিকশন লেখা হবে, এটাই এখনো অবধি রেওয়াজ। আর সেই সঙ্গে সায়েন্স ফিকশনের দু'টি বাংলা পরিভাষা 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে'র সঙ্গে 'কল্পবিজ্ঞানের গল্পে'র ঠাণ্ডা লড়াই জারি করেছেন কিছু স্পর্শকাতর পণ্ডিতমন্য ব্যক্তি। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কিছু সমালোচক মনে করেন কল্পবিজ্ঞানের গল্প কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট জাতের, সেখানে ফ্যান্টাসির দাপট বেশি এবং বিজ্ঞানের অপলাপের সুযোগ আছে। এর থেকে আরো একটি ভ্রান্ত অনুমানের হদিশ পাই আমরা, যা সায়েন্স ফিকশনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সুপ্ত ক্ষমতা উপলব্ধি করতে না পেরে তাকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ক'রে তোলার কাজে নিযুক্ত করার পথনির্দেশ মনে করে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মনু দ্বাদশ', অথবা এই প্রবন্ধে আলোচিত সত্যজিৎ রায়ের রচনাগুলিকে আমরা 'কল্পবিজ্ঞানের গল্প' আখ্যা দিই বা 'বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প', – সায়েন্স ফিকশনের চর্চা এই আদর্শ অনুসরণ করেই সার্থক হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ ও উল্লেখপঞ্জি

১. John Baxter, *Science Fiction in the Cinema*, 1970.

২. Evgeni Brandis, 'The Horizons of Science Fiction', *Soviet Literature*, January, 1983.

৩. Vladimir Gaskov, 'A Test of Humanity', *Soviet Literature*, January, 1983.

৪. Harry A. Katz, et al, *Introductory Psychology Through Science Fiction*, 2nd. ed., 1977.

৫. P. S. Krishnamoorthy, *A Scholar's Guide to Modern*

American Science Fiction, 1983.

৬. V. S. Muraviov, 'Invitation to the Strange Land' (in Russian), *Science Fiction : English & American Science Fiction*, Moscow, 1979.

৭. Patrick Parrinder, *Science Fiction : Its Criticism & Teaching*, 1980.

৮. Rabikin, E. S. & Scholes, R., *SF : History, Science, Vision*, 1977.

৯. Satyajit Ray, 'Ordeals of the Alien' I & II, *The Statesman*, Oct. 4 & 5, 1980.

১০. Franz Rottensteiner, *The Science Fiction Book*, 1975.

১১. Marie Seton, *Satyajit Ray*, 1972 (Vikas).

১২. Philip Strick, *Science Fiction Movies*, 1976.

১৩. Richard E. Ziegfeld, *Stanislaw Lem*, 1985.

১৪. *The Statesman*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮৬।

১৫. অদ্রীশ বর্ধন, 'বাংলায় কল্পবিজ্ঞান', যুগান্তর, ১১ ও ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

১৬. অন্বেষা, বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা. সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৭।

১৭. আজকাল, ২৫ মে, ১৯৮৭।

১৮. আশ্চর্য (সম্পাদক : আকাশ সেন). ১৯৬৩-১৯৬৮।

১৯. দেশ, ২৮ নভেম্বর, ১৯৮৭।

২০. শব্দ-শাব্দিক. জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৮৮।

২১ সত্যজিৎ রায়, 'কুবরিক ক্রফো ও SF', আশ্চর্য, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৬

২২. সত্যজিৎ রায়, 'শোকবার্তা' (দিলীপ রায়চৌধুরী), তদেব।

২৩. সত্যজিৎ রায়, 'এস এফ' ('নাউ' পত্রিকা থেকে অনুবাদ : অসীম বর্ধন), আশ্চর্য, জানুয়ারি, ১৯৮৭।

২৪. সিদ্ধার্থ ঘোষ, 'বাংলা সায়েন্স ফিকশনের ঐতিহ্য', তৃতীয় নয়ন (১৮৮২ থেকে আধুনিক কাল অবধি বাংলা সায়েন্স ফিকশন গল্পের সংকলন), ১৯৮৬।

২৫. স্তানিসোয়াভ লেম, পৃথিবী কি ক'রে বাঁচলো (অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), ১৯৭৯।

২৬. স্তানিসোয়াভ লেম, মুখোশ ও মৃগয়া (অনুবাদ : ঐ), ১৯৮৫।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'আশ্চর্য'-র কপি ও 'এস এফ. সিনে ক্লাব' সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছি শ্রী অদ্রীশ বর্ধনের সৌজন্যে। অন্যান্য গ্রন্থ, পত্রিকা ইত্যাদি পাঠের সুযোগ ও এই বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করেছি শ্রী সন্দীপ রায়, শ্রী দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, শ্রী শংকর ঘটক, শ্রী নীহার ভট্টাচার্য ও শ্রী ধরণী ঘোষ-এর কাছে। গ্রন্থপঞ্জিভুক্ত মুরাভিওভ-এর মূল রুশ রচনাটির ইংরাজি সার-সংক্ষেপ ক'রে দিয়েছেন সুমিতা ঘোষ।

পরিপূরণ

অশোক উপাধ্যায়

ছবি তোলা : বাঙালির ফোটোগ্রাফি-চর্চা : সিদ্ধার্থ ঘোষ।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা ৯

[গ্রন্থ সমালোচনার বদলে এই বিভাগে ইদানিং প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কোনো কোনো বাছাই বই নিয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করা হবে। এর প্রধান লক্ষ্য হবে সূত্রাকারে বইগুলির ভুল-ভ্রান্তি ও বিচ্যুতিগুলি ধরিয়ে দেওয়া, যাতে পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি সংশোধনের জন্য বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে সম্ভবক্ষেত্রে পরিপূরক তথ্যও সরবরাহ করা হবে। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির কিছু সুফল আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে কাউকে হেয় করা বা ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে নিষিদ্ধ। লেখকের মতো সমালোচকও ভুল করেন। তাই সমালোচকদের ভুলও ক্ষেত্রবিশেষে তুলে ধরা হবে।। পারস্পরিক সহযোগিতাই সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সুস্থ ও গঠনমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারে। সিদ্ধার্থ ঘোষ এক্ষণ-এর নিয়মিত লেখক এবং 'ছবি তোলা' বইখানির সূত্রপাত এই পত্রিকারই শারদীয় ১৩৯২ সংখ্যায় ঐ নামে প্রকাশিত দীর্ঘ প্রবন্ধটি থেকে। তাঁর আলোচ্য বইটি দিয়েই এই বিভাগ শুরু হল। বলা বাহুল্য, 'ছবি তোলা' বইটিকে বাংলায় প্রকাশিত সাম্প্রতিক বইগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা বলে আমরা বিবেচনা করি। – স. এ]

—

১. শিরোনামহীন ভূমিকায় বলা হয়েছে : 'গবেষণার সময়সীমা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যে সাধারণভাবে সীমিত…।' অর্থাৎ এ-বইয়ের কাল-সীমা ১৯০১ থেকে ১৯২৫। অথচ বইটিতে ভারতে ফোটোগ্রাফির আগমন (১৮৪৪) থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত কালের ইতিহাস আলোচিত।

২. ভারতের প্রথম পেশাদার আলোকচিত্রী যদি মঁসিয়ে মঁতেইরো হন (১৮৪৪), তবে দ্বিতীয় জন বোধ হয় মেং ডগলেশ সাহেব। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ মুদ্রিত (১৮৪৬ সাল ৭ এপ্রেল) বিজ্ঞাপনে প্রকাশ : '…মেং ডগলেশ সাহেব আশ্চর্য্য এক যন্ত্রদ্বারা ছায়া আকর্ষণ করিয়া ঠিক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন,

আপনার প্রতিমূর্ত্তি করাইতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় তাঁহারা ইটালীর আরমাণি বাজারের দক্ষিণে প্রথম সংখ্যক বাটী যাহাতে বড় একটা নিম্ব বৃক্ষ আছে ঐ বাটীতে উক্ত সাহেবের নিকট গিয়া ছবি করাইবেন, ক্ষুদ্র ২ ছবির মূল্য ১২। বড় ২ ছবির মূল্য ৫০ টাকা, অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে ছবি হয়, তৎপরে আর ২ কর্ম্মেতে চারি পাঁচ মিনিট লাগে এই অল্পক্ষণের পরে প্রকৃতছবি লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং স্ত্রীলোকদিগের ছবি করাইতে হইলে সাহেবকে আপনার-দিগের বাটীতে আনাইতে হয়, তাহাতে ৮ টাকা অধিক লাগে, স্ত্রীলোকদিগকে সাহেবের সাক্ষাতে আসিতে হইবেক না, সাহেব অন্তরে থাকিয়া ছবি করিয়া দিবেন, অতএব সাধারণ লোকেরা ছবি করণোপলক্ষে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন।' – দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, ১৮১৮-১৮৬৭, রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ১৩৪৬, পৃ ৮৭।

৩. ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের আদিপর্বে যে-সব বাঙালি সমিতির সদস্য হন, তাঁদের নামের তালিকা দিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন : 'সোসাইটি কি ভাবে প্রথমে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ সব চরিত্রদের আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু শেষ অবধি তা মুষ্টিমেয় ধনীব্যক্তির শৌখিন বিচরণের স্থান হয়ে ওঠে।' সোসাইটির সদস্য মাত্রেই ফোটোগ্রাফির চর্চা করতেন না। তাই লেখক ১৮৫৭-পূর্ববর্তী অধ্যায়ে রাজেন্দ্রলাল ছাড়া কানাইলাল দে ও প্রিয়নাথ শেঠের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। ৪২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত চৌদ্দ জন বাঙালি সদস্যের মধ্যে কারা 'সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র', আর কারাই বা 'শৌখিন ধনীব্যক্তি' তা পরিষ্কারভাবে বলা উচিত ছিল। সাংস্কৃতিক জগতের যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছিলেন তাঁরা কি দরিদ্র ছিলেন একজনও? আর ধনী সদস্যরাও তো সকলে ফোটো-গ্রাফির চর্চা করতেন না। ফোটোগ্রাফির শখ সর্বকালেই ব্যয়বহুল। কাজেই 'শৌখিন ধনীব্যক্তি' ছাড়া এ শখ চরিতার্থ করা সেকালে কোন সাধারণ চাকরি-জীবীর পক্ষে সম্ভব হতো? রাজেন্দ্রলাল-কানাইলাল-প্রিয়নাথ-গৌরদাস-ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মতো 'সাংস্কৃতিক জগতের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রদের' ফোটোগ্রাফি চর্চাও কি এক অর্থে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানদের 'শৌখিন বিচরণ' নয়? প্রসঙ্গত, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে সিং-রূপে উল্লেখ অত্যন্ত দৃষ্টিপীড়াদায়ক।

৪. ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখক জানিয়েছেন, শ্রী রাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা-দর্পণ' বইয়ে কলকাতার একটি লুপ্ত বাগানবাড়ি 'গর্ডন্‌স্ ফলি' সম্বন্ধে কিছু তথ্য পেশ করেছেন। বইটির সংস্করণ ও পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল। আমরা রাধারমণ বাবুর বইয়ে 'গর্ডন্‌স্ ফলি'র কোনো উল্লেখ দেখি নি, তাতে অবশ্য 'ফরস্টার'স ফলি'-সম্পর্কে আলোচনা আছে (দ্র. কলিকাতা-দর্পণ, ১ম সংস্করণ, পৃ ৪৯ : ভবানী-পুরের প্লট ৬)।

৫. ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 'বিদেশে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই রাজন্যবর্গের একাংশ বহু অর্থব্যয়ে বিদেশী ফোটোগ্রাফারদের নিয়ে আসেন নিজেদের সভাসদরূপে। অবশ্য ত্রিপুরার মহরাজারা যে এর ব্যতিক্রম …।' অথচ ১১২ পৃষ্ঠায় জানানো হয়েছে : 'মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে এক ফরাসি ফোটোগ্রাফার কিছুদিন আগরতলায় চাকুরি করেছিলেন।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

বীরচন্দ্র মাণিক্য কার সাহায্যে ফটো তুলতে শেখেন ? এ প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য : 'ফটোগ্রাফী বিদ্যার আবিষ্কারের অল্পপরে মহারাজ এক জন ফরাসীকে বেতনভোগী করিয়া রাজধানী লইয়া আসেন এবং তাঁহার সাহায্যে কলোডিয়ান্ প্রণালীতে ফটো তুলিতে আরম্ভ করেন।—দ্র. স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর, প্রদীপ, ৪ ভাগ ৬ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮, পৃ ১৯৯ এই ফরাসিই কি 'ছবি তোলা'র ১১২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অ্যাপোলোনিয়াস ? ঐ পৃষ্ঠার ৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদের উদ্ধৃতি অংশটি শুদ্ধ নয়, শুদ্ধ পাঠ নিম্নরূপ : ' তিনি… সার্ভে জেনারেল অফিসের প্রসিদ্ধ টার্নার সাহেবের সাহায্যে হাফ টোন ব্লক্ তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন।'

৬. উৎস-পঞ্জিতে বহু বইয়ের প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয় নি। প্রকাশকাল, স্থান এবং প্রকাশকের উল্লেখসহ স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থপঞ্জি থাকা উচিত ছিল। পৃ ২২৬-এর ৩০ সংখ্যক পাদটীকায় মন্মথনাথ চক্রবর্তীকে 'অন্নদা-জীবনী'র লেখক বলা হয়েছে। 'অন্নদা-জীবনী' 'শিল্প ও সাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক ছাপা হয়, সেখানে লেখক হিসেবে শরচ্চন্দ্র দেবের নাম ছিল। মুদ্রিত গ্রন্থে লেখকের নাম না থাকলে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ-এ শরচ্চন্দ্রকেই লেখক বলা হয়েছে। পৃ ২২৩-এর ৩২ সংখ্যক বইটির পূর্ণ নাম 'কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস'। 'কলিকাতাস্থ' শব্দটি বাদ পড়েছে।

৭. 'বিষয় ফোটোগ্রাফি : গ্রন্থ ও নিবন্ধ' অধ্যায়ে বাদ পড়েছে—আদীশ্বর ঘটকের 'ফটোগ্রাফী শিক্ষা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ, এর ১৭ বছর পরে প্রকাশিত তাঁর ৫ম পুত্র কমলাপতি ঘটকের লেখা 'ফটো-শিল্প', মণীন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সহজ ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র শিক্ষা, মধুসূদন শীলের 'ফটো শিক্ষা'।

আলোকচিত্রচর্চার প্রতি মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ যখন মনোযোগী হয়ে ওঠে তখন থেকেই বাংলা সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ ও ফোটোগ্রাফি মুদ্রণ বাড়তে থাকে। বিশেষ ক'রে এই শতকের প্রথম পাদের সাময়িকপত্রগুলি ঘাঁটলে এর প্রমাণ মেলে। উদাহরণত, 'প্রবাসী'র কথা ধরা যাক। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০৮) থেকেই প্রবাসী ফোটো প্রকাশে জোর দেয়। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় ছিল 'প্রবাসী বাঙ্গালী' শিরোনামে ব্যাগ কাঁধে নেওয়া এক শিশুর ফোটো, তলায় লেখা ছিল : "প্রবাসী"র জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে। এই শব্দ-

বন্ধ থেকে বোঝা যায়, প্রবাসীতে প্রকাশের জন্যই কিছু ফোটো তোলা হতো। ঐ বছরের ৩য় সংখ্যায় আষাঢ় প্রকাশিত হয় রাজা রামমোহন রায়ের ডেথ মাস্ক-এর ফোটো, নিচে লেখা হয়েছিল : *Photographed for The Prabasi By G. N. Mukerji Bros., & Calcutta.* একই সংখ্যায় কাশ্মীর-চিত্রাবলী' শীর্ষক প্রবন্ধে ১১ টি ফোটো প্রকাশিত হয়, কয়েকটি কোণে GNM এই স্বাক্ষর ছিল। অনুমান করা চলে এগুলিও পূর্বোক্ত জি এন মুখার্জি ব্রাদার্স-এর তোলা। ঐ বছরের ৬ষ্ঠ-৭ম যুগ্ম সংখ্যায় (আশ্বিন-কার্তিক) 'কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর' নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাতে ১৭ টি ফোটো ছিল। এর মধ্যে চারটির (খৃষ্টান মজুরেরা জল তুলিবার চাকায় কাজ করিতেছে, কোচিন ব্যাকওয়াটারে মাছ ধরিবার জাল পাতা হইয়াছে, কোচিন ব্যাকওয়াটারে মাছ ধরিবার জাল (উত্তোলিত) এবং ত্রিবাঙ্কোরে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া নির্মিত খাল) – 'ফোটোগ্রাফ লেখককৃত'। প্রবন্ধটির লেখক সতীশচন্দ্র মৌলিক। একই বর্ষের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত আরো কিছু ফোটোগ্রাফ উল্লেখযোগ্য : টোডা উপজাতীয়দের সম্পর্কে (অগ্রহায়ণ পৌষ), ফতেপুর সিক্রি শহরের (ফাল্গুন-চৈত্র) চিত্র। 'ইউরোপিয়ান ফোটোগ্রাফারের চোখে ভারত' অধ্যায়ে বিদেশি ফোটোগ্রাফারদের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ফোটো থেকে বাঙালি আলোকচিত্রীর ভারত দর্শনের অনুরূপ একটি অধ্যায় যোগ করা চলে। এতদ্ব্যতীত এই কালপর্বের বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ফোটোগ্রাফি বিষয়ক নিবন্ধগুলির একটি তালিকাও (অন্তত পরিশিষ্টে) কাঙ্ক্ষিত ছিল। সাধারণ সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধেও যে মুক্তদৃষ্টি সুস্থ বৈজ্ঞানিক বোধের পরিচয় মেলে মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত 'সুধা' পত্রিকায় (২য় খণ্ড, ৫-৬ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৯) 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের 'প্রেতাত্মার ফটোগ্রাফ' শীর্ষক অংশে (পৃ ১৫২-৩) তার পরিচয় আছে : 'আমাদের দেশে যেমন এখনও অহরহঃ বুজরুকি চলিতেছে,...বিলাতে পরলোকগত আত্মার ফটোগ্রাফ তুলিয়া এখনও অনেকে সেইরূপ লোককে প্রতারণা করিতেছে।' পরবর্তী অংশে লেখক প্রেতচ্ছবি তোলার কৌশল ব্যক্ত করেছেন।

৮. 'আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত ৮টি প্রবন্ধের উল্লেখ কেন নেই এ বইয়ে বোঝা গেল না। তিনটি বিবেকজ্যোতি মৈত্র-র লেখা পৃথিবীর প্রথম স্টুডিও কলকাতায়, কলকাতায় ফটোগ্রাফির প্রথম যুগ পার্ক স্ট্রীটের সেই বাড়িটি), কমল সরকারের 'বিদ্যাসাগরের শেষ ফটোগ্রাফার'। সবক'টিই তো এই বইয়ের পূর্বে প্রকাশিত।

৯. ভাবের অভিব্যক্তি বিষয়ক ফোটো-সংগ্রহের তালিকায় একটি বইয়ের উল্লেখ নেই, তারকনাথ বাগচীর চিত্রে ভাব-বৈচিত্র্য' (১৩৩০)। দেবকণ্ঠ বাগচী পরিচায়িত এই বইয়ে ৩৫টি ফোটো আছে। তারকনাথের এ ধরনের বহু প্রতিচ্ছবি

সমকালের সাময়িকপত্রে লভ্য।

১০. ১৬৮-৯ পৃষ্ঠায় 'চিত্র রাখি-সংক্রান্তি' নামের অ্যালবামটির জনকত্ব নিয়ে: সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে 'যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী প্রণীত' অর্থ তো খুবই সহজ - ফোটোগুলি যামিনীপ্রকাশের তোলা। এইচ বোসের তোলা হলে জি এন মুখার্জি ব্রাদার্স ব্লক তৈরি করবেন কেন, ইউ. রায় কোম্পানি থাকতে! পাঁচজন ফোটোগ্রাফার যদি একই দৃশ্যের ফোটো তোলেন, তবে চারজনের ছবিই তো 'প্রায় সম্পূর্ণ মিলে যায়'।

১১. ১৭৯ পৃষ্ঠার টার্ফ ক্লাবের ফোটোগ্রাফার পি বোস এবং তাঁর দাদা কাপ. অ্যাণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী এস. বোসের উল্লেখ আছে। পি বোস হলেন প্রেমতোষ বসু। বিচিত্রকর্মা এক বাঙালি। বিত্তশালী পিতার সন্তান, সর্বস্বান্ত হন স্বদেশী আন্দোলনে সাহায্য ক'রে। শেষজীবন কাটে ইংলণ্ডে, সেখানেই মারা যান নিউমোনিয়া রোগে। আক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিত কারণ ছিল উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাব। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রেমতোষ 'ক্ষণিকা'র মুদ্রাকর ছিলেন। তাঁর জীবনী 'সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধানে' লভ্য। এস বোস সর্বতোষ, প্রেমতোষের দাদা নন, অব্যবহিত অনুজ। যে সর্বতোষ বোসের নাম ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য-তালিকায় আছে (পৃ ৩২৭), তিনিই এই সর্বতোষ।

১২. ৩৩১ পৃষ্ঠায় আহিরিতোলা স্ট্রিট অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটকে হাড়কাটা বলা হয়েছে। এই ভুল অনেকেই করেন। প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের পূর্বনাম চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন। বর্তমানে যেটি নবীনচাঁদ বড়াল লেন সেটিই হাড়কাটা। রাস্তাটি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিট থেকেই বেরিয়েছে।

১৩. ৬৭ পৃষ্ঠায় হাটখোলার বাসিন্দা গিরীন্দ্রকুমার দত্তের উল্লেখ আছে। গিরীন্দ্রকুমার হাটখোলা দত্ত পরিবারের সন্তান হলেও থাকতেন নিমতলায়।

১৪. 'বিষয় ফোটোগ্রাফি : গ্রন্থ ও নিবন্ধ' অধ্যায়ে আদীশ্বর ঘটকের জীবৎকাল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোনো পরিচয় দেওয়া হয় নি। এবং নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর পিতা কাশীশ্বর ঘটকের কারিগরি চর্চায় সাফল্যের কথা জানানো হয়েছে (পৃ ৭৩)।

আদীশ্বর প্রথম জীবনে সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা করেন—পাখোয়াজ, তানপুরা, বাঁশী ও হারমোনিয়াম বাজাতে পারতেন। এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েন, আর্থিক কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। হোমিওপ্যাথি শিখে চিকিৎসক হিসেবে জীবিকা অর্জন করেন। নামডাকও হয়। সাত বছর এই পেশায় থাকার পর সাতাশ বছর বয়সে প্রথমে চিত্রবিদ্যা শেখেন, পরে ফোটোগ্রাফিও। এবং এগুলিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনে দক্ষতা থাকায় সুনামের অধিকারী হন। ফোটোগ্রাফি ও ছবি আঁকা শেখানোর জন্য দু'টি বইও লেখেন। পরবর্তীকালে তন্ত্র, জ্যোতিষ ও আবহবিজ্ঞানের চর্চা করতেন। শেষজীবনে ধর্ম-

কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েকটি যৌগিক ক্রিয়ায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। তান্ত্রিক সাধনাতেও সাফল্য অর্জন করেন। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় আবহবিদ্যা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১–১৪ বর্ষ)।

যে গ্রন্থ থেকে লেখক আদীশ্বরের জীবৎকাল জেনেছেন তাতে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তার সূত্রের উল্লেখ ছিল। উপরিধৃত অনুচ্ছেদে পরিবেশিত তথ্য সেই সূত্র থেকেই গৃহীত। (দ্র. শোক-সংবাদ : ৺আদীশ্বর ঘটক, ভারতবর্ষ ১৪ বর্ষ ১ খণ্ড ২ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, পৃ ১০৫১ – ১০৫২।)

আদীশ্বরের পিতা কাশীশ্বর নাকি কারিগরি চর্চায় উৎসাহী ছিলেন, তিনি নাকি ওয়াটার সাইকেল বোট নামে একটি জলচর সাইকেল উদ্ভাবন করেন। এই মূল্যবান তথ্যের উৎস হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন যে প্রবন্ধের, তা থেকেই কিঞ্চিৎ অংশ এখানে উদ্ধৃত হল : 'প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার দক্ষিণে চেৎলা নামক স্থানে প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল ৺ কাশীশ্বর ঘটক মহাশয়ের পুত্র ২৪ পরগণা বেহালানিবাসী জগদীশ্বর ঘটক ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঐ ওয়াটার সাইকেলের আবিষ্কার করেন।' (দ্র. উমাপতি ঘটক, ওয়াটার সাইকেল বোট, ভারতবর্ষ, ১৪ বর্ষ ১ খণ্ড ৪ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ ৬৯১।)

তাহলে বোঝা গেল, পিতা কাশীশ্বর নন, পুত্র জগদীশ্বরই ওয়াটার সাইকেল বোটের আবিষ্কারক। জগদীশ্বর আদীশ্বরের অগ্রজ, ইনি ধানভানা কল প্রভৃতিরও আবিষ্কার করেন। সে যাই হোক, বাঙালির ফোটোগ্রাফি-চর্চার ইতিহাসে ওয়াটার সাইকেলের আবিষ্কারের প্রাসঙ্গিকতা কি?

১৫. পরিশিষ্টে ফোটোগ্রাফিক স্টুডিও ও ফোটোগ্রাফারের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে কলকাতার ফোটোগ্রাফার এইচ সি চন্দ্র-র নাম বাদ পড়েছে।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

[১৮৬৩-১৯১৫]

স্কেচ সত্যজিৎ রায়

পুনর্মুদ্রণ

উপেন্দ্রকিশোর

সুকুমার রায়

[শ্রাদ্ধ বাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক পঠিত]

জন্ম — মসূয়া, ময়মনসিংহ ; ২৮শে বৈশাখ, ১২৭০ ।

মৃত্যু — কলিকাতা, ৪ঠা পৌষ, ১৩২২ ।

তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত ৺লোকনাথ রায় অল্প বয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবারমাত্র সকলের অনুরোধে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন জমীদার তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ করায় তিনি অচিরে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এরূপ একাগ্রভাবে তিনি তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট হ'ন যে তাঁহার পিতা, পুত্রের সংসার ত্যাগের আশঙ্কায়, ডামর-গ্রন্থ নরকপাল মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণাদি ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জ্জন করেন। এই শোকে লোকনাথ তিনদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র।

লোকনাথের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীন-চেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চ্চনাদিতে তিনি স্বরচিত স্তোত্রাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কাব্যকুশলতার যে-সকল পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যগুণে ব্রাহ্মণের বিচার-সভায় মধ্যস্থের আসন লাভ করিতেন। কথিত আছে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের অনধিকারচর্চ্চায় ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ জানাইবার জন্য এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আন্দোলনকারীগণ তাহাতেই নিরুৎসাহ হ'ন।

একবার বিধবাবিবাহসম্পর্কে-জাতিচ্যুত কোন দরিদ্রের গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সমাজহিতৈষীগণ কর্তৃক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সমাজের বাধা নিষেধ ও শাসন অনুশাসনাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য "মুন্সী শ্যামসুন্দর"কে জাতিচ্যুত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।

শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত সারদারঞ্জন রায় বর্ত্তমানে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচবৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার স্বধর্ম্মনিরত আচারনিষ্ঠ হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। তদবধি তিনি উপেন্দ্রকিশোর নামেই পরিচিত।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়নমসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রতিদিন সুসজ্জিত সমারোহে গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে যাইতেন—কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীগণ দেখিতেন যে ক্ষুব্ধ মনের অভিমান সর্ব্বদাই তাঁহার মুখশ্রীতে বিষাদ-রেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তারপর, ক্রমে তিনি স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; নানা বন্ধুসংসর্গে, খেলা ধূলার উৎসাহে, বাঁশী বাজাইয়া ও ছবি আঁকিয়া, তাঁহার মুকুল জীবন নব নব আনন্দে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্রমে কোন্ অলক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে শিল্প ও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁহার হৃদয়কে অল্পে অল্পে একেবারে অধিকার করিয়া বসিল।

অতি অল্প বয়সেই কেবল নিজের আগ্রহে বিনাশিক্ষা ও বিনাসাহায্যে, তিনি শিল্পসাধনায় কৃতিত্বলাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। একবার সার এস্‌লি ইডেন স্কুল পরিদর্শনের কালে তাঁহার খাতায় দৈবাৎ আপনার প্রতিকৃতি দেখিয়া তরুণ শিল্পীকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলেন, "তুমি ইহারই চর্চ্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও।"

শিক্ষকগণ বলিতেন, উপেন্দ্রকিশোর প্রতিদিন ক্লাসে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করেন, তিনি অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা সত্ত্বেও স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার মন নাই। রাত্রে তিনি আদৌ পড়েন না; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "শরৎকাকা পাশের ঘরে পাঠাভ্যাস করেন, তাহাতেই আমার পড়া হয়। দুইজনে পড়িতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল বাড়ে।" ইহার মধ্যে একদিন তিনি বাসায় আসিয়াই বলিলেন "গুপীদা, এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন। একটা গৎ শুনিয়াছি, দেরী করিলে ভুলিয়া যাইব।" সেই উৎসাহে সেই দিনই বেহালা বাদনের সূত্রপাত হইল।

সহৃদয় ছাত্রবৎসল শরৎচন্দ্র রায় তখন ময়মনসিংহের একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার স্নেহদৃষ্টি এই প্রতিভাবান বালকের উপর পড়িল। তিনি বলিলেন "এই উপেন্দ্রকিশোর কালে একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। শিল্প ও সঙ্গীতের ঝোঁক তাহার যতই প্রবল হউক, সে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিবেই। পিতা হরিকিশোর রায় হিন্দুসমাজের নেতা হউন, হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভাপতি হউন, উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতেই হইবে।"

তখন ব্রাহ্মভীতির যুগ। ব্রাহ্মসমাজ কখন্ কাহার সন্তানকে গ্রাস করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বঙ্গের অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত। শরৎচন্দ্র নামজাদা ব্রাহ্ম—হিন্দু-

সন্তানমাত্রেই তাঁহার সংসর্গবর্জ্জনে বিশেষভাবে উপদিষ্ট—তাঁহার এ সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে এবং বিশেষভাবে উপেন্দ্রকিশোরের সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ ও আত্মীয় গগনচন্দ্র হোমকে উৎসাহ দিয়া এই কার্য্যে ব্রতী করিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বালকের মনে ব্রাহ্ম-সমাজের বিষয়ে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল তাহা সন্ত্রস্ত অভিভাবকগণের শত বাধা নিষেধ শাসন নির্য্যাতন সত্ত্বেও ক্রমে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে চলিল।

এ দিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। শরৎবাবু ব্যাকুল হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রত্নমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন—কই, তাঁহার প্রিয়ছাত্র যে এখনও বেহালা ও তুলিকার মোহ ত্যাগ করিল না; এখনও যে সে পড়ায় মন দিল না! শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিও, তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিও না।" অনুতপ্ত বালক সেইদিনই গৃহে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যথা-সময়ে পরীক্ষান্তে ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া তিনি মহা সমারোহে "ব্রাহ্ম দোকানে" এক ভোজ দিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মদলে মিশিয়া, ব্রাহ্মছাত্রাবাসে বাস করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সতের বৎসর বয়সে তিনি যে ডায়ারি রাখিতেন তাহাতে তাঁহার সেই সময়কার জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় অনেক সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চায় ও চিত্রানুশীলনে তাঁহার অবসর সময়, এবং অনবসর কালও, কাটিয়া যাইত। নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য লইতে আসিত। যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হইলে লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

সেই সময় হইতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল; শিশুদিগের জন্য একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বাভাষ তাঁহার ডায়ারির মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। আর দেখা যায়, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। কলাবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিজ্ঞানমুখী প্রতিভা তাঁহাকে নানা সুযোগে নানা বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিত। এই জ্ঞানানুরাগ উত্তরকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে নানাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সক্ষম করিয়াছিল।

বিশ বৎসর বয়সে, তাঁহার পিতা হরিকিশোর রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার জীবনে এক বিষম পরীক্ষাসঙ্কট উপস্থিত হইল। নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজনেতার শ্রাদ্ধে যতপ্রকার সমারোহ দান দক্ষিণাদির ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহার আয়োজন হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম

আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় স্বাধীনচেতা অকুতোভয় যুবক উপেন্দ্রকিশোর বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রচলিত দেশাচারমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব না।" ক্ষুব্ধ রুষ্ট আত্মীয় স্বজন ঘোর বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন, সমাজ তাঁহার নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই একনিষ্ঠ আত্মস্থ মহাপুরুষ সকল নির্য্যাতন ও ভ্রূকুটিভঙ্গিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অশান্তির মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে আপন বিশ্বাস-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন, এবং সামাজিক উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহসঙ্কল্পের সংবাদ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অনাচার হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রতিবাদের তপ্ত নিঃশ্বাস কোন দিনই তাঁহার চিত্তের অটল স্থৈর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার চিরপ্রসন্ন স্বভাবের অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্য্যে তিনি এমন অক্লেশে বিরুদ্ধাচারীর হৃদয়ে আসন লাভ করিলেন যে, প্রতিবাদের কোলাহল আপনা হইতেই সসম্ভ্রমে থামিয়া গেল। এই সময় হইতেই, অথবা ইহার পূর্ব্বেই, তিনি শিশু সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হন। যে সময়ে মানুষ অসম্ভব রকমের উচ্চকথার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া শিশুদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একরূপ ভুলিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতির সহযোগে তিনি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুচিত্ত বিনোদনের এই ঐকান্তিক আগ্রহের উৎসকে যখন অন্বেষণ করি, তখন দেখি যে শিশুজীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদানে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম যে কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, এমন ভাষা পাই না যাহাতে তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারি। শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ "ছেলেদের রামায়ণ" মুদ্রণকালে তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলি উড্‌এন্‌গ্রেভারের হস্তে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহারই ফলে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত চিত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়া পড়েন। লঘুভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল,— যখন যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন এবং গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে অকালে আয়ুক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। "হাফটোন" শিল্প তখন সবেমাত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে— তখনও তাহার মূলসূত্রাদি

সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই ; মতসঙ্কুল অস্থিরতার মধ্যে তাহার কার্য্যপ্রণালীর সঙ্কেতাদি তখন সুসঙ্গতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার যে প্রকার সমাধান করেন, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। হাফটোনের যে-সকল প্রণালী পাশ্চাত্য-দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাতে বহুল পরিমাণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কৃতিত্ব নানাদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আজ বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা উপেন্দ্রকিশোর রায় বলিতে কেবল কৃতী শিল্পীকেই দেখিলেন, সাহিত্যকলাকুশল সঙ্গীত-রসজ্ঞকে দেখিলেন, তাঁহারা জানেন না কোন্ মনস্বী আত্মা আপনাকে এই সকল পরিচয়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা জানেন না, যে, কীর্ত্তিমান পুরুষ যতই কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, কিছুতেই তাঁহার নিরহঙ্কার বিনয়নম্রতাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

সংসারে স্বার্থব্যবসায়ী প্রবঞ্চক তিনি কম দেখেন নাই, নিজে ব্যবসায় সম্পর্কে ও সংসারের নানাক্ষেত্রে শতবার প্রতারিত হয়েছেন—কিন্তু তবু মানুষের উপর তাঁহার কি গভীর বিশ্বাস! মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি কি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা! অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাংসারিক ক্ষতি অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিয়াছেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও অকারণ সন্দেহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে সম্মত হয়েন নাই।

তাঁহার অন্তরের সংস্পর্শে যে আসে নাই, সে জানে না তাঁহার জীবনের প্রত্যেক সাধনার মধ্যে তিনি কি আনন্দরস সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যখন যাহাতে হাত দিতেন তদর্পিতপ্রাণ হইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন। শিশুদের জন্য লিখিতে বসিয়াছেন, চিত্ররচনার জন্য হস্তে তুলিকা লইয়াছেন—মনে হইত সংসারে তাঁহার অন্য কোন চিন্তা নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই ; উপস্থিত কর্ত্তব্যের আনন্দে তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা ও সাংসারিক সকল দুর্ভাবনার মধ্যে যেমন বেহালাখানি হাতে লইয়াছেন—অমনি তন্ময়। আর কোথায় দুঃখ, কোথায় বিপদ—মনে হয় এমন শান্তি এমন সান্ত্বনা বুঝি আর কিছুতে মিলে না। সত্যকে যিনি পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখিতে পান, কর্ত্তব্য তাঁহার কাছে শুষ্ক কর্ত্তব্যমাত্র থাকিতে পারে না—মনে হয় জীবনের সামান্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যেও তিনি আনন্দরস লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

দুরন্ত রোগনির্য্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্যকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া আসিতে-ছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও

তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তরপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি পরকালের কথা বলিয়া গেলেন; মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল! "আমার জন্য তোমরা শোক করিও না – আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব" – একি আশ্চর্য্য সান্ত্বনার কথা। যেমন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আনন্দের আহ্বানে অমর আত্মা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সাক্ষ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গিরিডি থাকিতে দুই দিন রোগাচ্ছন্ন দেহে তন্দ্রাগতবৎ পড়িয়া ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সেই সময়ের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। "এই সময়ে সকল যন্ত্রণাবিমুক্ত হইয়া আমি কি আনন্দে বাস করিয়াছি, কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি, – তোমরা তাহা জান না। তোমরা আমাকে ঔষধ পথ্যাদি যাহা দিয়াছ তাহার কি অপূর্ব্ব স্বাদ – আমি অমৃত জ্ঞানে তাহা পান করিয়াছি। আমার সকল ভয় ভাবনা দূর হইয়াছে – আমি সেই জ্যোতির রেখা দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, আমি এ দেহ নই, কিন্তু আমার এই দেহের জন্য তোমাদের কত যত্ন, তোমরা ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা কতরূপে তাহার সেবা করিতেছ। দেহ-বিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর অতীত লোকে মানুষ কি ভাবে অবস্থান করে, দয়াময়ের কৃপায় আমি তাহা স্পষ্ট দেখিলাম। দয়াল আমায় বুঝাইয়া দিলেন, "তোমাকে এইরূপ বিদেহী অবস্থায় থাকিতে হইবে।" দয়া কি জিনিষ! দয়া যে কল্পনা নয়, দয়াময় নাম যে শুধু আপাত তৃপ্তিপ্রদ নামমাত্র নয়, জীবন্ত জাগ্রত করুণা যে জীবনবেদের ছত্রে ছত্রে আপনার পরিচয় দিয়া যাইতেছে, অন্তিম সময়ে তাহার সাক্ষ্য এমন করিয়া কয়জনে দেয়?

গিরিডিতে যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সুব্যবস্থার কথা বারবার বলিতেন, "আমি রোগযন্ত্রণার সময়ে যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" গিরিডির দারুণ শীতের উপশমজন্য গরম কাপড় আনান হইল। কিন্তু দরজি কই? সেই উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে জামা প্রস্তুত করে কে? গুরুতর কর্ম্মের তাড়নায় কাহারও অবসর আর ঘটিয়া উঠে না। এমন সময় অযাচিতভাবে কোথা হইতে দরজি আসিয়া উপস্থিত! তখন ভক্তের আনন্দ দেখে কে! "দেখ ভগবানের দয়া।" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চিরজাগ্রত ইচ্ছা সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া অঘটন ঘটাইতে পারে, একথা আজ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি সুস্থতা লাভ করিবেন, এরূপ কথা তিনি বলিতে দিতেন না। বলিতেন—"ওরূপ ভাবিতে নাই। ভগবান যেরূপ বিধান করেন তাহার জন্যই যেন প্রস্তুত থাকিতে পার।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন দাদামহাশয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। দাদামহাশয় প্রার্থনার সময় বলেন, "তুমি ইঁহার জীবনের অপরাধ সমুদয় মার্জ্জনা কর।" এ প্রার্থনায় তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন, "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ডদান আবশ্যক হয়, দণ্ডই দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, রবিবার উষার প্রাক্কালে পাখীর কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখীরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" বলা হইল এখন সকাল হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত মৃদুভাবে যেন আপনমনে তিনি কি বলিলেন, ভাল বোঝা গেল না; কেবল শোনা গেল, "পাখীরা কি জানে? তারা বুঝতে পারে?" দুটি ছোট পাখী জানালার কাছে আসিয়া কিচিরমিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া বলিলেন, "ও কী পাখী! ও কী বলিয়া গেল, শুনিলে না? পাখী বলিল 'পথ পা' 'পথ পা'।" রবিবার দিবাবসানের সঙ্গে যখন সকলের আশারও অবসান হইয়া আসিল, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আত্মীয় স্বজন সকলে সমবেত হইলেন। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করিতেছিলেন, হয়ত অন্তিমে তাঁহাকে ক্ষয়রোগের যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি অজাতশত্রু, মৃত্যুও তাঁহার পরম মিত্ররূপে অবতীর্ণ হইল। মৃত্যুর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে দয়ালের শেষ দয়ার সাক্ষ্য রাখিয়া তিনি পরম শান্তিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত চিরশান্তিময় সুখের দেশে প্রস্থান করিলেন।

কি শান্তি! কি শান্তি! ভয়াবহ মৃত্যুর কি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি! তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার রোগক্লিষ্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমাকে অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম গান করিও।" প্রয়াণকালে উষালোকে সঙ্গীত হইতেছিল—যখন গান আরম্ভ হইল "জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে" তখনও তাঁহার মৃদুকম্পিত ওষ্ঠ যেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিল। তারপর আপনা হইতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্বাস থামিয়া গেল—অস্তমিত জীবনসূর্য্য কোন্ নূতন লোকে নূতন প্রভাতের নব আনন্দে উদিত হইল জানি না।

মৃত্যুর অতীত লোকের পাথেয়রূপে জীবনের সঞ্চিত পুণ্য আজ তাঁহার সম্বল রহিয়াছে। কায়মনোবাক্যে যিনি কোন দিন সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই, শাশ্বত চিরজাগ্রত সত্য আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। যে দয়ার সাক্ষ্য তিনি আজীবন বহন করিয়া গেলেন, সে দয়া আজও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যে আনন্দের

আস্বাদনে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব" সেই আনন্দ তাঁহার অনন্ত জীবনপথের শাশ্বত সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।

—

[উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় হাফটোন খোদাই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এবং যেসব প্রক্রিয়া ও যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহা ইউরোপ আমেরিকায় নূতন ও মূল্যবান্ বলিয়া আদৃত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাংলায় লেখা সহজ নয়; সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইংরেজীতে জানুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউ কাগজে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি চিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে। শিশুদের মাসিক-পত্র ও বহির জন্য ছবি আঁকিতে, তাহাদের জন্য ব্যঙ্গচিত্র বা কৌতুকজনক ছবি আঁকিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ছবিও তিনি বেশ আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার "সেকালের কথা"য়, মানুষের সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং অতি প্রাচীন মানুষদের সমকালে, পৃথিবীতে যে-সব জীবজন্তু ছিল, তাহাদের কতকগুলির ছবি ও বৃত্তান্ত আছে। এইসব ছবি তাঁহার নিজের আঁকা। এই ছবিগুলি দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর হল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন, ছবিগুলি এখানে ছোট-ছেলেদের চিত্তরঞ্জক বহিতে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এরূপ চিত্র বিলাতী প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইতে পারে। "সন্দেশে"র জন্য তিনি অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র নানা প্রকার ফুলের যে রঙীন ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর।

উপেন্দ্র বাবু পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রত্ন-জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান জানিতেন। অনেক বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এগুলি পল্লবগ্রাহীর মত এক আধটা বিলাতী সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ দেখিয়া লেখা নয়, বিশেষজ্ঞের মত লেখা। তাঁহার "অকাশের কথা"র অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার সম্পূর্ণ করিয়া বাহির করিবেন। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আরও একটি কতকদূর লেখা আছে। তাহা মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে।

কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং দক্ষতার সহিত উহা শিখাইতে পারিতেন। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যে স্বরালাপ ব্যবহার করিতেন, তাহা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝিতে পারিত। হার-

মোনিয়ম শিখাইবার জন্য তিনি একখানি বহি লিখিয়াছিলেন, উহার বেশ কাট্‌তি ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে হারমোনিয়মের দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এই জন্য তিনি ঐ বহির প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই।

তিনি শিশুদের জন্য রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে যে সব বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সমকক্ষ বহি বাংলা শিশুসাহিত্যে নাই। তিনি রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, উপকথা, বা আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা ছেলেদের জন্যই হউক বা বুড়োদের জন্যই হউক, তাঁহার বিমল রসিকতার মৃদু ও স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। লিখিতে তিনি যে আনন্দ পাইতেন, অপরে পড়িয়া সেই আনন্দ পাইত বলিয়া তাঁহার রচনা সাহিত্য নামের যোগ্য হইয়াছে।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমুদয় পুরাণে দেবদেবী সংপৃক্ত এক একটি আখ্যায়িকা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া একটি বহি লিখিবেন ; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় তাহা করিতে পারেন নাই। বাংলা ছাপার অক্ষর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলে হরফ ঢালাইয়ের কাজ, এবং ছাপাখানার কম্পোজ করার কাজ, অনেক সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য হয় ; এবং ইংরেজী যেমন টাইপ-রাইটার কল আছে, বাংলারও তেমনি হইতে পারে। কিরূপ অক্ষর করিলে ইহা হইতে পারে, তাহা আঁকিয়া, এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাও করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার অনেকটা জানেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নানাবিষয়িণী প্রতিভার কথা লিখিয়া মানুষটির পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁহার সদা-প্রসন্ন মূর্ত্তি, তাঁহার বিনয়নম্র সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, তাঁহার সরস বাক্যালাপ তাঁহার অন্তরের কতকটা সাক্ষ্য দিত। তিনি যেমন নম্র, তেমনি স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। এই স্বাধীনচিত্ততায় রূঢ়তা রুক্ষতা ছিল না। তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সঙ্গ ছেলে বুড়ো সকলেরই ভাল লাগিত। তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, যদিও ভক্তির কথা তাঁহার মুখে বড় শুনা যাইত না। — সম্পাদক, প্রবাসী।]

—

'প্রবাসী' পত্রিকায় মাঘ, ১৩২২ সংখ্যাটিতে সুকুমার রায়ের উপরোক্ত রচনা 'উপেন্দ্রকিশোর রায়' নামে প্রকাশিত হয়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সংযোজন অংশটিসহ এখানে সেটি পুনর্মুদ্রণ করা হল। — স এ।

পুনর্মুদ্রণ

গুপী গাইন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তোমরা গান গাইতে পার? আমি একজন লোকের কথা বলব, সে একটা গান গাইতে পারত। তার নাম ছিল গুপী কাইন, তার বাবার নাম ছিল কানু কাইন, তার একটা মুদীর দোকান ছিল। গুপী কিনা একটা গান গাইতে পারত, আর সে গ্রামের আর কেউ কিছু গাইতে পারত না, তাই তারা তাকে খাতির করে বলত গুপী 'গাইন'।

গুপী যদিও একটা বই গান জানত না, কিন্তু সেই একটা গান সে খুব করেই গাইত; সেটা না গেয়ে সে তিলেকও থাকতে পারত না, তার দম আটকে আসত। যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত। যখন সে মাঠে গিয়ে গাইত, তখন মাঠের যত গরু, সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। শেষে আর তার ভয়ে তার বাবার দোকানে খদ্দেরই আসে না, রাখালেরাও মাঠে গরু নিয়ে যেতে পারে না। তখন একদিন কানু কাইন তাকে এই বড় বাঁশ নিয়ে তাড়া করতে সে ছুটে মাঠে চলে গেল; সেখানে রাখালের দল লাঠি নিয়ে আসতে বনের ভিতরে গিয়ে খুব করে গলা ভাঁজতে লাগল।

গুপীদের গ্রামের কাছেই আরেকটা গ্রামে একজন লোক থাকত, তার নাম ছিল পাঁচু পাইন। পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার সখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে থাকত, আর মাথা নাড়ত আর চোখ পাকাত; আর দাঁত খিঁচাত, আর ভ্রূকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত, আর বলত, "আহা! আ-া-া!! অ-অ-অ-হ্-হ্-হ্!!!" শেষে যখন সে 'হাঃ, হাঃ হা-া-হ্!' বলে বাঘেরমত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। তাই থেকে সকলে তাকে বলত বাঘা পাইন'। তার এই 'বাঘা' নামই রটে গিয়েছিল; আসল নাম যে তার কি, তা কেউ জানত না।

বাঘা ঢোলক বাজাত আর রোজ একটা করে ঢোলক ভাঙ্ত। শেষে আর পাঁচু তার ঢোলকের পয়সা দিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঘার বাজনা বন্ধ হবে, তাও কি হয়? গ্রামের লোকেরা পাঁচুকে বল্ল, "তুমি না পার না হয় আমরাই সকলে চাঁদা করে ঢোলকের পয়সাটা দি'। আমাদের গ্রামে এমন একটা ওস্তাদ। হয়েছে, তার বাজনাটা বন্ধ হয়ে যাবে?" শেষে ঠিক হল যে গ্রামের সকলে চাঁদা

করে বাঘাকে একটা ঢোলক কিনে দিবে, আর সেই ঢোলকটি আর তার ছাউনী খুব মজবুত হবে, যাতে বাঘার হাতেও সেটা আর সহজে না ছিঁড়ে।

সে যা ঢোলক হল! তার মুখ হল সাড়ে তিন হাত চওড়া, আর ছাউনী মোষের চামড়ার। বাঘা সেটা পেয়ে যারপরনাই খুসী হয়ে বল্ল, 'আমি দাঁড়িয়ে বাজাব!'

তখন থেকে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই ঢোলক লাঠি দিয়ে বাজায়। দেড় মাস দিন রাত বাজিয়েও বাঘা সেটাকে ছিঁড়তে পারল না। ততদিনে তার বাজনা শুনে শুনে তার বাপ মা পাগল হয়ে গেল, গ্রামের লোকের মাথা ঘুরতে লাগল। আর দিন কতক এইভাবে চললে কি হত বলা যায় না, এর মধ্যে একদিন গ্রামের সকলে মিলে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে বাঘাকে বল্ল, "লক্ষ্মী, দাদা! তোমাকে দশ হাঁড়ি মিঠাই দিচ্ছি, অন্য কোথাও চলে যাও, নইলে আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব!"

বাঘা আর কি করে? তখন কাজেই তাকে অন্য একটা গ্রামে যেতে হল। সেখানে দু দিন না থাকতে থাকতেই সেখানকার সকলে মিলে তাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তারপর থেকে সে যেখানেই যায়, সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন সে করল কি, সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধার সময় তার নিজের গ্রামে গিয়ে ঢোলক বাজাতে থাকে, আর গ্রামের লোক তাড়াতাড়ি তাকে কিছু খাবার দিয়ে বিদায় করে বলে 'বাঁচলাম!' তারপর এমন হল যে আর কেউ তাকে খেতে দেয় না, আর তার ঢোলকের আওয়াজ শুনলেই আশপাশের সকল গ্রামের লোক লাঠি নিয়ে আসে। তখন বেচারা ভাবল, "আর না! মূর্খদের কাছে থাকার চেয়ে বনে চলে যাওয়াই ভাল। না হয় বাঘে খাবে, তবুও আমার বাজনা চলবে!" এই বলে বাঘা তার ঢোলটিকে ঘাড়ে করে বনে চলে গেল।

এখন বাঘার বেশ মজাই হয়েছে। এখন আর কেউ তার বাজনা শুনে লাঠি নিয়ে আসে না। বাঘে খাবে দূরে থাক, সে বনে বাঘ ভালুক কিছু নাই। আছে খালি একটা ভারী ভয়ানক জানোয়ার; বাঘা আজও তাকে দেখতে পায়নি, শুধু দূর থেকে তার ডাক শুনে ভয়ে থর থরিয়ে কাঁপে, আর ভাবে, 'বাবা গো! ওটা এলেই ত আমার ঢোলক শুদ্ধ আমাকে গিলে খাবে!'

সে ভয়ানক জানোয়ার কিন্তু আর কেউ নয়, সে গুপী গাইন। বাঘা যে ডাক শুনে কাঁপে, সে গুপীরই গলা ভাঁজা। গুপীও বাঘার বাজনা শুনতে পায়, আর বাঘারই মত ভয়ে কাঁপে। শেষে সে একদিন ভাবল, "এ বনে থাকলে কখন প্রাণটা যাবে, তার চেয়ে এই বেলা এখান থেকে পালাই।" এই বলে গুপী চুপিচুপি বন থেকে বেরিয়ে পড়ল। বেরিয়েই দেখে আর-একটি লোকও এক বিশাল ঢোল মাথায় করে সেই বনের ভিতর থেকে আসছে। তাকে দেখেই ভারী আশ্চর্য্য হয়ে

গুপী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কে হে?"

বাঘা বল্ল, "আমি বাঘা বাইন, তুমি কে?"

গুপী বল্ল, "আমি গুপী গাইন। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

বাঘা বল্ল, "যেখানে জায়গা যোটে, সেইখানেই যাচ্ছি। গ্রামের লোকগুলো গাধা, গান বাজনা বোঝে না, তাই ঢোলকটি নিয়ে বনে চলে এসেছিলাম। তা ভাই এখানে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারের ডাক শুনেছি, তার সামনে পড়লে আর প্রাণটি থাকবে না, তাই পালিয়ে যাচ্ছি।"

গুপী বল্ল, "তাই ত! আমিও যে একটা জানোয়ারের ডাক শুনেই পালিয়ে যাচ্ছিলাম। বল ত তুমি জানোয়ারটাকে কোথায় বসে ডাকতে শুনেছিলে?"

বাঘা বল্ল, "বনের পূর্ব্বধারে, বটগাছের তলায়।"

গুপী বল্ল, "আরে, সে যে আমারই গান শুনেছ! সে কেন জানোয়ারের ডাক হবে? সেই জানোয়ারটা ডাকে বনের পশ্চিম ধারে, হর্ত্তুকী তলায় বসে।"

বাঘা বল্ল, "সেত আমার ঢোলকের আওয়াজ; আমি যে ঐখানে থাকতাম!"

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল যে, তারা তাদের নিজেদের গান আর বাজনা শুনেই ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। তখন যে দুজনার হাসি! অনেক হেসে তারপর গুপী বল্ল, "ভাই, আমি যেমন গাইন, তুমি তেমনি বাইন! আমরা দুজন জুটলে নিশ্চয় একটা কিছু করতে পারি।"

একথায় বাঘারও খুবই মত হল। কাজেই তারা খানিক কথাবার্ত্তার পর ঠিক করল যে তারা দুজনায় মিলে রাজা মশাইকে গান শোনাতে যাবে। রাজা মশাই যে তাতে খুব খুসী হবেন, তাতে ত আর ভুলই নাই, চাই কি অর্দ্ধেক রাজ্য বা মেয়ের সঙ্গে বিয়েও দিয়ে ফেলতে পারেন।

গুপীর আর বাঘার মনে এখন খুবই আনন্দ, তারা রাজাকে গান শোনাতে যাবে। দুজনে হাসতে হাসতে আর নাচতে নাচতে এক প্রকাণ্ড নদীর ধারে এসে উপস্থিত হল; সেই নদী পার হয়ে রাজবাড়ী যেতে হয়।

নদীতে খেয়া আছে, কিন্তু নেয়ে পয়সা চায়! বেচারারা বন থেকে এসেছে, পয়সা কোথায় পাবে? তারা বল্ল, "ভাই, আমাদের কাছে তো পয়সা টয়সা নাই, আমরা না হয় তোমাদের গেয়ে বাজিয়ে শোনাব; আমাদের পার করে দাও।" তাতে খেয়ার চড়নদারেরা খুব খুসী হয়ে নেয়েকে বল্ল, "আমরা চাঁদা করে এদের পয়সা দিব, তুমি এদের তুলে নাও।"

বাঘার ঢোলকটি দেখেই নেয়েরও তার বাজনা শুনতে ভারী সাধ হয়েছিল, কাজেই সে একথায় আর কোন আপত্তি করল না। গুপীকে আর বাঘাকে তুলে

নিয়ে নৌকা ছেড়ে দেওয়া হল। নৌকো ভরা লোক, বসে বাজাবার জায়গা কোথায় হবে? অনেক কষ্টে সকলের মাঝখানে খানিকটা জায়গা হতে হতে নৌকাও নদীর মাঝখানে এসে পড়ল। তারপর খানিক একটু গুণগুণিয়ে গুপী গান ধরল, বাঘা তার ঢোলকে লাঠি লাগাল, আর অমনি নৌকাশুদ্ধ সকল লোক বিষম চমকে গিয়ে গড়াগড়ি আর জড়াজড়ি করে দিল নৌকা খানাকে উল্টে।

তখন তো আর বিপদের অন্তই নাই। ভাগ্যিস বাঘার ঢোলটি এত বড় ছিল, তাই আঁকড়ে ধরে দুজনার প্রাণ রক্ষা হল। কিন্তু তাদের আর রাজবাড়ী যাওয়া ঘটল না। তারা সারাদিন সেই নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে শেষে সন্ধ্যা বেলায় এক ভীষণ বনের ভিতরে গিয়ে কূলে ঠেকল। সে বনে দিনের বেলায় গেলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, রাত্রির ত আর কথাই নাই। তখন বাঘা বল্ল, "গুপী দা' বড়ই ত বিষম দেখ্‌ছি! এখন কি করি বল ত।" গুপী বল্ল, "করব আর কী? আমি গাইব, তুমি বাজাবে। নিতান্তই যখন বাঘে খাবে, তখন আমাদের বিদ্যেটা তাকে না দেখিয়ে ছাড়ি কেন?"

বাঘা বল্ল, "ঠিক বলেছ দাদা! মরতে হয় ত ওস্তাদলোকের মতন মরি; পাড়াগেঁয়ে ভূতের মত মরতে রাজী নই!"

এই বলে দুজনায় সেই ভিজা কাপড়েই প্রাণ খুলে গান বাজনা সুরু করল। বাঘার ঢোলটি সেদিন কিনা ভিজে ছিল, তাইতে তার আওয়াজটি হয়েছিল যারপরনাই গম্ভীর। আর গুপীও ভাবছিল, এই তার শেষ গান, কাজেই তার গলার আওয়াজটিও খুবই গম্ভীর হয়েছিল। সে গান যে কি জমাট হয়েছিল, সে আর কি বলব? এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা করে দুপুর রাত হয়ে গেল, তবু তাদের সে গান থামছেই না।

এমন সময় তাদের দুজনারই মনে হল যেন, চার দিকে একটা কি কাণ্ড হচ্ছে। ঝাপসা ঝাপসা কালো কালো, এই বড় বড় কি যেন সব গাছের উপর থেকে উঁকি মারতে লেগেছে; তাদের চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরুচ্ছে যেন মূলোর সার! তা দেখে তখনই আপনা হতে বাঘার বাজনা থেমে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে দুজনার হাতপা গুটিয়ে, পিঠ বেঁকে, ঘাড় বসে, চোখ বেরিয়ে মুখ হাঁ করে এল। তাদের গায়ে এমনি কাঁপুনি আর দাঁতে এমনি ঠক্‌ঠাক ধরে গেল যে আর তাদের ছুটে পালাবারও যো রইল না।

ভূতগুলি কিন্তু তাদের কিছু করল না। তারা তাদের গান বাজনা শুনে ভারী খুসী হয়ে এসেছে, তাদের রাজার ছেলের বিয়েতে গুপীর আর বাঘার বায়না করতে। গান থামতে দেখে তারা নাকি সুরে বল্ল, "থাম্‌লি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা!"

একথায় গুপীর আর বাঘার একটু সাহস হল; তারা ভাবল, "এ ত মন্দ মজা নয়, তবে একটু গেয়েই দেখি না।" এই বলে যেই তারা আবার গান ধরেছে,

অমনি ভূতেরা একজন দুজন করে গাছ থেকে নেমে এসে তাদের ঘিরে নাচতে লাগল।

সে যে কি কারখানা হয়েছিল, সে কি না দেখলে বোঝবার যো আছে? গুপী আর বাঘা তাদের জীবনে আর কখনো এমন সমজদারের দেখা পায় নি। সে রাত এমনি ভাবেই কেটে গেল। ভোর হলে ত আর ভূতেদের বাইরে থাকবার যো নাই, কাজেই তার একটু আগেই তারা বল্ল, "চল্ বাবা, মোদের গোদার বেটার বে'তে! তোদের খুসী করে দিব।'

গুপী বল্ল, "আমরা যে রাজবাড়ী যাব!" ভূতেরা বল্ল, "সে যাবি এখন, আগে মোদের বাড়ী একটু গান বাজনা শুনিয়ে যা! তোদের খুসী করে দিব।" কাজেই তখন তারা দুজনে ঢোল নিয়ে ভূতেদের বাড়ি চল্ল। সেখানে গান বাজনা যা হল, সে আর বলে কাজ নাই। তারপর তাদের বিদায় করবার সময় ভূতেরা বল্ল, "তোরা কি চাস?"

গুপী বল্ল, "আমরা এই চাই যে আমরা যেন গেয়ে বাজিয়ে সকলকে খুসী করতে পারি!" ভূতেরা বল্ল, "তাই হবে; তোদের গান বাজনা শুনলে আর সে গান শেষ হওয়ার আগে কেউ সেখান থেকে উঠে যেতে পারবে না। আর কি চাস?"

গুপী বল্ল, "আর এই চাই যে, আমাদের যেন খাওয়া পরার কষ্ট না হয়।" এ কথায় ভূতেরা তাদের একটি থলে দিয়ে বল্ল, "তোরা যখন যা খেতে বা পরতে চাস, এই থলের ভিতরে হাত দিলেই তা পাবি। আর কী চাস?"

গুপী বল্ল, "আর কি চাইব, তা ত বুঝতে পারছি না!" তখন ভূতেরা হাসতে হাসতে তাদের দু জনকে দু জোড়া জুতা এনে দিয়ে বল্ল, "এই জুতা পায়ে দিয়ে তোরা যেখানে যেতে চাইবি, অমনি সেখানে গিয়ে হাজির হবি।"

তখন ত আর কোন ভাবনাই রইল না। গুপী আর বাঘা ভূতেদের কাছে বিদায় হয়ে, সেই জুতা পায়ে দিয়েই বল্ল, "তবে আমরা এখন রাজ বাড়ী যাব!" অমনি সেই ভীষণ বন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল; গুপী আর বাঘা দেখল, তারা দু জন, একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় আর এমন সুন্দর বাড়ী তারা তাদের জীবনে কখনো দেখেনি। তারা তখনই বুঝতে পারল যে, এ রাজবাড়ী।

কিন্তু এর মধ্যে ভারী একটা মুস্কিল হল। রাজ বাড়ীর ফটকে যমদূতের মত কতগুলো দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল, তারা গুপী আর বাঘাকে সেই ঢোল নিয়ে আসতে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে বল্ল, "এইয়ো! কাঁহা যাতা হ্যায়?" গুপী থতমত খেয়ে বল্ল, "বাবা, আমরা রাজা মশাইকে গান শোনাতে এসেছি।" তাতে দারোয়ানগুলো আরো বিষম চটে গিয়ে লাঠি দেখিয়ে বল্ল, "ভাগো হিঁয়াসে!" গুপীও তখন নাক সিঁটকিয়ে বল্ল, "ঈস্! আমরা ত রাজার কাছে যাবই!"

বল্‌তেই অমনি সেই জুতার গুণে, তারা তৎক্ষণাৎ গিয়ে রাজা মশাইয়ের সামনে উপস্থিত হল।

রাজবাড়ীর অন্দর মহলে রাজা মশায় ঘুমিয়ে আছেন, রাণী তাঁর মাথার কাছে বসে তাঁকে হাওয়া করছেন, এমন সময় কথা নাই বার্ত্তা নাই – গুপী আর বাঘা সেই সর্ব্বনেশে ঢোল নিয়ে হঠাৎ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। জুতার এমনি গুণ, দরজা জানালা সব বন্ধ রয়েছে তাতে তাদের একটুও আটকায় নি। কিন্তু আসবার বেলা আটকাক আর নাই আটকাক; আসবার পরে খুবই আটকাল। রাণী তাদের দেখে বিষম ভয় পেয়ে, এক চীৎকার দিয়ে তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলেন; রাজা মশায় লাফিয়ে উঠে পাগলের মত ছুটাছুটি করতে লাগলেন; রাজবাড়ীময় হুলস্থূল পড়ে গেল; সিপুই সান্ত্রী সব খাঁড়া ঢাল নিয়ে ছুটে এল।

বেগতিক দেখে গুপী আর বাঘার মাথায় গোল লেগে গেল। তারা যদি তখন শুধু বলে 'আমারা এখান থেকে অমুক জায়গায় চলে যাব', তবেই তাদের জুতার গুণে সকল ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু সে কথা তাদের মনেই হল না। তারা গেল ছুটে পালাতে, আর দু পা যেতে না যেতেই বেচারারা মারটা যে খেল! জুতা, লাঠি, চাবুক, কীল, চড়, কানমলা, কিছুই তাদের বাকি রইল না। শেষে রাজা মশাই হুকুম দিলেন, "বেটাদের নিয়ে তিন দিন হাজতে ফেলে রাখ। তারপর বিচার করে, হয় এদের মাথা কাটিব, না হয় শূলে দিব, না হয় কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।"

হায় গুপী! হায় বাঘা! বেচারারা এসেছিল রাজাকে গান শুনিয়ে কতই বকসিস পাবে ভেবে, তার মধ্যে এ কি বিপদ? পিয়াদারা তাদের হাত বেঁধে মারতে মারতে একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে ফেলে রাখল। সেখানে পড়ে বেচারারা এক দিন আর গায়ের ব্যথায় নড়তে চড়তে পারল না। তাতে তেমন দুঃখ ছিল না, কিন্তু বাঘার ঢোলটি যে গেল, সেই হল সর্ব্বনাশের কথা! বাঘা বুক মাথা চাপড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে, আর বলছে, "ও গুপী দা!– ওঃ-ওঃ- হ-হ-হ-হ-অ-অ! আরে ও গুপী দা! মার খেলাম, প্রাণ যাবে, তাতে দুঃখু নেই – কিন্তু দাদা, আমার ঢোলকটি যে গেল!"

গুপীর কিন্তু ততক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সে বাঘার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বল্ল, "ভয় কি দাদা? ঢোল গিয়েছে, – জুতা আর থলে ত আছে! আমরা নিতান্ত বেকুব, তাই এতগুলো মার খেলাম। যা হোক, যা হবার হয়ে গিয়েছে, এখন এর ভিতর থেকে একটু মজা করে নিতে হবে।" বাঘা এ কথায় একটু শান্ত হয়ে বল্ল, "কি মজা করবে দাদা?" গুপী বল্ল, "আগে ত খাবার মজাটা করে নিই, তারপর অন্য মজার কথা ভেবে দেখ্‌ব এখন।"

এই বলে সে সেই ভূতের দেওয়া থলির ভিতরে হাত দিয়ে বল্ল, "দাও তো দেখি, এক হাঁড়ি পোলাও!" অমনি একটা সুগন্ধ যে বেরুল! তেমন পোলাও রাজারাও সচরাচর খেতে পান না। আর সে কি বিশাল হাঁড়ি! গুপী কি সেটা থলির ভিতর থেকে তুলে আনতে পারে? যা হোক কোন মতে সেটাকে বার করে এনে, তারপর থলিকে বল্ল, "ভাজা, ব্যঞ্জন, চাটনি, মিঠাই, দই, রাবড়ি, সরবৎ!—শিগগির শিগগির দাও!" দেখতে দেখতে খাবার জিনিসে আর সোনা রুপার বাসনে ঘর ভরে গেল। দুজন লোকে আর কত খাবে? সে অপূর্ব্ব খাবার খেয়ে তাদের গায়ের ব্যথা কোথায় চলে গেল তার ঠিক নাই।

তখন বাঘা বল্ল, "দাদা, চল এই বেলা এখান থেকে পালাই, নইলে শেষে কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।" গুপী বল্ল, "পাগল হয়েছ নাকি? আমাদের এমন জুতা থাকতেও কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে? দেখাই যাক না, কি হয়।" এ কথায় বাঘা খুব খুসী হল; সে বুঝতে পারল যে গুপীদা একটা কিছু মজা করবে।

দু দিন চলে গেল, আর একদিন পরেই রাজা তাদের বিচার করবেন। বিচারের দিন রাত থাকতে উঠে গুপী থলের ভিতর হাত দিয়ে বল্ল, "আমাদের দুজনের রাজ পোষাক চাই।" বলতেই তার ভিতর থেকে এমন সুন্দর পোষাক বেরুল যে তেমন পোষাক কেউ তয়েরই করতে পারে না। সেই পোষাক তারা দুজনে পরে, তাদের পুরাণো কাপড় আর বাসন কখানি পুঁটুলী বেঁধে নিয়ে, জুতা পায় দিয়ে তারা বল্ল, "এখন আমরা মাঠে হাওয়া খেতে যাব।" অমনি দেখে, রাজবাড়ীর বাইরের প্রকাণ্ড মাঠে চলে এসেছে। সে মাঠের এক জায়গায় তাদের পুঁটুলীটি লুকিয়ে রেখে, তারা বেড়াতে বেড়াতে এসে রাজবাড়ীর সামনে উপস্থিত হল।

দূর থেকে তাদের আসতে দেখেই রাজার লোক ছুটে গিয়ে তাঁকে খবর দিয়েছিল যে, "মহারাজ, দু জন রাজা আসছেন," রাজাও তা শুনে তাঁর ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাঘা আর গুপী আসতেই তিনি তাদের যারপরনাই আদর দেখিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার একটি ঘরে তাদের বাসা দেওয়া হল। কত চাকর, বামুন, পিয়াদা, পাইক তাদের সেবাতে লেগে গেল, তার অন্ত নাই।

তারপর গুপী আর বাঘা হাত পা ধুয়ে জলযোগ করে একটু ঠাণ্ডা হলেই, রাজা মশায় আবার তাদের খবর নিতে এলেন। তাদের পোষাক দেখে অবধিই তিনি ভেবে নিয়েছেন যে, 'না জানি এঁরা কত বড় রাজাই হবেন!' তারপর শেষে যখন তিনি গুপীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আপনারা কোন দেশের রাজা?" তখন গুপী হাত যোড় করে তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! আমরা কি রাজা হতে পারি? আমরা আপনার চাকর!"

গুপী সত্য কথাই বলেছিল, কিন্তু রাজার তাতে বিশ্বাস হল না। তিনি

ভাবলেন, 'কি ভাল মানুষ, কেমন নরম হয়ে কথা বলে। যেমন বড় রাজা, তেমনি ভদ্রলোকও দেখছি।' তিনি তখন আর বিশেষ কিছু না বলে তাদের দুজনকে তাঁর সভায় নিয়ে এলেন। সেখানে সে দিন সেই দুটো লোকের বিচার হবে, - তিন দিন আগে যারা গিয়ে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকেছিল। বিচারের সময় উপস্থিত, আসামী দুটোকে আনতে পিয়াদা গিয়েছে; কিন্তু তাদের আর কোথায় পাবে? এ তিন দিন তাদের ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই তালা খুলে দেখা হল, সেখানে কেউ নাই, খালি ঘর পড়ে আছে।

তখন ত ভারী একটা ছুটা ছুটি হাঁকা হাঁকি পড়ে গেল। দারোগা মশাই বিষম ক্ষেপে গিয়ে পিয়াদগুলোকে বকতে লাগলেন। পিয়াদারা হাত যোড় করে বল্ল, "হুজুর! আমাদের কোনো কসুর নাই; আমরা তালা দিয়ে রেখেছিলাম, তার উপর আবার আগাগোড়া দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ও দুটা ত মানুষ ছিল না, ও দুটা ছিল ভূত; নইলে এর ভিতর থেকে কি করে পালাল?"

এ কথায় সকলেরই বিশ্বাস হল! রাজা মশাইও প্রথমে দারোগার উপর রেগে তাঁকে কেটেই ফেলতে গিয়েছিলেন, শেষে ঐ কথা শুনে বল্লেন, "ঠিক! ও দুটো নিশ্চয় ভূত। আমার ঘরও ত বন্ধ ছিল, তার ভিতর এত বড় ঢোল নিয়ে কি করে ঢুকেছিল?"

তা শুনে সকলেই বলল, "হাঁ হাঁ, ঠিক ঠিক, ও দুটো ভূত!" বলতে বলতেই তাদের শরীর শিউরে উঠল, গা বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল। তখন তারা বাঘার সেই ঢোলটির কথা মনে করে বল্ল, "মহারাজ! ভূতের ঢোল বড় সর্ব্বনেশে জিনিস! ওটাকে কখনো আপনার ঘরে রাখবেন না। ওটাকে এখনি পুড়িয়ে ফেলুন।'

রাজামশাইও বল্লেন, "বাপরে! ভূতের ঢোল ঘরে রাখব? এক্ষুণি ওটাকে এনে পোড়াও!"

যেই এ কথা বলা, অমনি বাঘা দু হাতে চোখ ঢেকে 'হাউ হাউ হাউ হাউ' করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল!

সে দিন বাঘাকে নিয়ে গুপীর কি মুস্কিলই হয়েছিল। ঢোল পোড়াবার নাম শুনেই বাঘা কাঁদতে আরম্ভ করেছে, ঢোল এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে না জানি সে কি করবে! তখন, সেটা যে তারই ঢোল, সে কথা কি আর বাঘা সামলে রাখতে পারবে? কি সর্ব্বনাশ! এখন বুঝি ধরা পড়ে প্রাণটাই হারাতে হয়।

গুপীর বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল যে বাঘাকে নিয়ে ছুটে পালায়। কিন্তু তার ত আর যো নাই; সভায় বসবার সময় যে সেই জুতাগুলো পা থেকে খুলে রাখা হয়েছে।

এ দিকে কিন্তু বাঘার কাণ্ড দেখে সভাময় এক বিষম হুলস্থূল পড়ে গেছে। সবাই ভাবছে, বাঘার নিশ্চয় একটা ভারী অসুখ হয়েছে, আর সে বাঁচবে না। রাজবাড়ীর বৈদ্যি ঠাকুর এসে বাঘার নাড়ী দেখে যারপরনাই গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। বাঘাকে খুব করে জোলাপের ওষুধ খাইয়ে তার পেটে বেলেস্তারা লাগিয়ে দেওয়া হল। তারপর বৈদ্যি ঠাকুর বল্লেন যে, 'এতে যদি বেদনা না সারে, তবে পিঠে আর একটা, তাতেও না সারলে দুপাশে আর দুটো বেলেস্তারা লাগাতে হবে।'

এ কথা শুনেই বাঘার কান্না তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। তখন সকবে ভাবল যে, বৈদ্যি ঠাকুর কি চমৎকার ওষুদই দিয়েছেন, দিতে দিতেই বেদনা সেরে গেছে।

যা হোক, বাঘা যখন দেখল যে তার কান্নাতে ঢোল পোড়াবার কথাটা চাপা পড়ে গেছে, তখন সেই বেলেস্তারার বেদনার ভিতরেই তার মনটা কতক ঠাণ্ডা হল। রাজামশায় তখন তাকে খুব যত্নের সহিত তার ঘরে শুইয়ে রেখে এলেন; গুপী তার কাছে বসে তার বেলেস্তারায় হাওয়া করতে লাগল।

তারপর সকলে ঘর থেকে চলে গেলে, গুপী বাঘাকে বল্ল, "ছি, ভাই, যেখানে সেখানে কি এমন করে কাঁদতে আছে? দেখ দেখি, এখন কি মুস্কিলটা হল!" বাঘা বল্ল, "আমি যদি না কাঁদ্‌তুম, তা হলে ত এতক্ষণে আমার ঢোলকটি পুড়িয়ে শেষ করে দিত। এখন না হয় একটু জ্বলুনি সইতে হচ্ছে, কিন্তু আমার ঢোলকটা ত বেঁচে গেছে!"

বাঘা আর গুপী এমনি কথাবার্ত্তা বলছে। এদিকে রাজামশায় সভায় ফিরে এলে দারোগামশায় তাঁর কাণে কাণে বল্লেন, "মহারাজ, একটা কথা আছে, অনুমতি হয় ত বলি।" রাজা বল্লেন, "কি কথা?" দারোগা বল্লেন, "মহারাজ, ঐ যে লোকটা গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদল, সে আর তার সঙ্গের ঐ লোকটা, —সেই দুই ভূত; আমি তাদের চিনতে পেরেছি।" রাজা বল্লেন, "তাইত হে, আমারও একটু যেন সেই রকমই ঠেকছিল। তা হলে ত বড় মুস্কিল দেখছি। বলো ত এখন কি করা যায়?"

তখন একথা নিয়ে সভার মধ্যে ভারী একটা কাণাকাণি শুরু হল। কেউ বল্ল, "রোজা ডাক, ও দুটোকে তাড়িয়ে দিক্।" আর একজন বল্ল, "রোজা যদি তাড়াতে না পারে, তখন ত সে দুটো ক্ষেপে গিয়ে একটা বিষম কিছু করতে পারে। তার চেয়ে কেন রাত্রে ঘুমের ভিতরে ও দুটোকে পুড়িয়ে মারুন না।"

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল, কিন্তু এরমধ্যে একটু মুস্কিল এই দেখা গেল যে, ভূতদের পোড়াতে গেলে রাজবাড়ীতেও তখন আগুন ধরে যেতে পারে। শেষে অনেক যুক্তির পর এই স্থির হল যে, একটা বাগান বাড়ীতে তাদের বাসা দেওয়া হবে; বাগানবাড়ী পোড়া গেলেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। তখন রাজামশায় বল্লেন যে, "সেই ঢোলটাকেও তা হলে সেই বাগানবাড়ীতে নিয়ে রাখা

যাক; বাগানবাড়ী পোড়াবার সময় এক সঙ্গে সকল আপদ চুকে যাবে।”

বাগানবাড়ী যাবার কথা শুনে গুপী আর বাঘা খুব খুসী হল। তারা ত জানে না যে এর ভিতরে কি ভয়ানক ফন্দি রয়েছে; তারা খালি ভাবল যে বেশ আরামে নিরিবিলি থাকা যাবে, সঙ্গীত চর্চ্চারও সুবিধা হতে পারে। জায়গাটি খুবই নিরিবিলি আর সুন্দর। বাড়ীটি কাঠের, কিন্তু দেখতে চমৎকার। সেখানে গিয়ে দেখতে দেখতে বাঘা ভাল হয়ে গেল। তখন গুপী তাকে বল্ল, “ভাই, আর এখানে থেকে কাজ কি? চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।” বাঘা বল্ল, “দাদা, এমন সুন্দর জায়গায় ত আর থাকতে পাব না, দু দিন এখানে রইলাম বা। আহা, আমার ঢোলকটি যদি থাকত!”

সেদিন বাঘা বাড়ীর এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুপী বাগানের এক জায়গায় বসে গুণগুণ করছে, এমন সময় হঠাৎ বাঘা ভয়ানক চ্যাঁচামেচি ক'রে উঠল। তার সকল কথা বোঝা গেল না, খালি ‘ও গুপী দা! ও গুপী দা!’ ডাকটা খুবই শোনা যেতে লাগল। গুপী তখন ছুটে এসে দেখল যে, বাঘা তার সেই ঢোলটা মাথায় করে পাগলের মত নাচছে, আর যা'তা আবোল তাবোল বলতে বলতে ‘গুপী দা, গুপী দা’ বলে চ্যাঁচাচ্ছে। ঢোল পেয়ে তার এত আনন্দ হয়েছে যে সে আর কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, গুছিয়ে কথাও বলতে পারছে না। এমনি করে প্রায় আধ ঘণ্টা চলে গেলে পর বাঘা একটু শান্ত হয়ে বল্ল, “গুপী দা, দেখছ কি, এই ঘরে আমার ঢোলকটি—আরে কি মজা—হাঃ হাঃ হাঃ” বলে আবার সে মিনিট দশেক খুব নেচে নিল। তারপর সে বল্ল, “দাদা, এত দুঃখের পর ঢোলকটি পেয়েছি, একটা গান গাও, একটু বাজিয়ে নি।” গুপী বল্ল, “এখন নয় ভাই, এখন বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে বারান্দায় বসে দুজনায় খুব করে গান বাজনা করা যাবে।”

রাজামশাই কিন্তু ঠিক করেছেন, সেই রাত্রেই তাদের পুড়িয়ে মারবেন। দারোগার উপর হুকুম হয়েছে যে, সেদিন সন্ধ্যার সেই বাগান বাড়ীতে মস্ত ভোজের আয়োজন করতে হবে। দারোগা মশায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক নিয়ে সেই ভোজে উপস্থিত থাকবেন; খাওয়া দাওয়ার পর গুপী আর বাঘা ঘুমিয়ে পড়লে, তাঁরা সকলে মিলে এক সঙ্গে সেই কাঠের বাড়ীর চারদিকে আগুন দিয়ে তাদের পালাবার পথ বন্ধ করবেন।

সেদিনকার খাওয়া বেশ ভাল মতেই হল। গুপী আর বাঘা ভাবল যে লোক জন চলে গেলেই তারা গান বাজনা আরম্ভ করবে, দারোগা মশাই ভাবলেন যে গুপী আর বাঘা ঘুমোলেই ঘরে আগুন দেবেন। তিনি তাদের ঘুম পাড়াবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাব দেখে যখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে তারা না ঘুমালে তিনি সেখান থেকে যাবেন না, তখন গুপী বাঘাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় পড়ে নাক ডাকাতে লাগল।

একটু পরেই গুপী আর বাঘা দেখল যে লোক জন সব চলে গেছে, আর কারু সাড়া শব্দ নাই। তারপর আরেকটু দেখে, যখন মনে হল যে বাগান একেবারে খালি হয়ে গেছে, তখন তারা দুজনে বারান্দায় এসে ঢোল বাজিয়ে গান যুড়ে দিল।

এদিকে দারোগা মশায় তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, 'তোরা প্রত্যেক দরজায় বেশ ভাল করে আগুন ধরাবি ; খবরদার, আগুন ভাল করে না ধরলে চলে যাস্‌নি যেন।' তিনি নিজে গিয়েছেন সিঁড়িতে আগুন ধরাতে। আগুন বেশ ভাল মতই ধরেছে, দারোগা মশাই ভাবছেন 'এই বেলা ছুটে পালাই,' এমন সময় বাঘার ঢোল বেজে উঠল, গুপী গান ধরে দিল। তখন আর দারোগা মশাই বা তাঁর লোকদের কারু সেখান থেকে নড়বার যো রইল না, সকলকেই পুড়ে মরতে হল। ততক্ষণে গুপী আর বাঘাও আগুন দেখতে পেয়ে, তাদের জুতার জোরে, তাদের ঢোল আর থলেটি নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল।

সে দিনকার আগুনে দারোগা মশাই ত পুড়ে মারা গিয়েছিলেনই, তাঁর দলের অতি অল্প লোকই বেঁচে ছিল। সেই লোকগুলো গিয়ে রাজামশাইকে এই ঘটনার খবর দিতে তাঁর মনে বড়ই ভয় হল। পরদিন আরো দু চারজন লোক রাজসভায় এসে বল্ল যে, তারা সেই আগুনের তামাসা দেখতে সেখানে গিয়েছিল ; তারা তখন ভারী আশ্চর্য্য রকমের গান বাজনা শুনেছে, আর ভূত দুটোকে শূন্যে উড়ে পালাতে স্বচক্ষে দেখেছে। তখন যা রাজা মশায়ের কাঁপুনি! সে দিন আর তাঁর সভা করা হল না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে এসে ভূতের ভয়ে দরজা এঁটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন, এক মাসের ভিতরে আর বাইরে এলেন না।

এদিকে গুপী আর বাঘা সেই আগুনের ভিতর থেকে পালিয়ে একেবারে তাদের বাড়ীর কাছের সেই বনে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে প্রথমে তাদের দেখা হয়েছিল। তাদের বড় ইচ্ছা যে এত ঘটনার পর একবার তাদের মা বাপকে দেখে যায়। বনে এসেই বাঘা বল্ল, "গুপী দা, এইখানে না তোমায় আমায় দেখা হয়েছিল?" গুপী বল্ল, "হাঁ।" বাঘা বল্ল, "তবে, এমন জায়গায় এসে কি একটু গান বাজনা না করে চলে যেতে আছে?" গুপী বল্ল, "ঠিক বলেছ ভাই। তবে আর দেরী কেন? এই বেলা আরম্ভ করে দাও।" এই বলে তারা প্রাণ খুলে গান বাজনা করতে লাগল।

এর মধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়েছে। একদল ডাকাত হাল্লার রাজার ভাণ্ডার লুটে, তার ছোট ছেলে দুটিকে সুদ্ধ চুরী করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল, রাজা অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের পিছু পিছু প্রাণপণে ছুটেও তাদের ধরতে পারছিলেন

না। গুপী আর বাঘা যখন গান ধরেছে ঠিক সেই সময়ে সেই ডাকাতগুলোও সেই বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে গান একবার শুনলে ত আর তার শেষ অবধি না শুনে চলে যাবার যো নাই; কাজেই ডাকাতদের তখনি সেখানে দাঁড়াতে হল। সারা রাত্রের ভিতরে আর সে গান বাজনাও থামল না, ডাকাতদেররও সেখান থেকে যাওয়া ঘটল না। সকালে হাল্লার রাজা এসে অতি সহজেই তাদের ধরে ফেল্লেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে গুপী আর বাঘার গানের গুণেই তিনি ডাকাত ধরতে পেরেছেন তখন আর তাদের আদর দেখে কে? রাজকুমারেরাও বল্লেন, "বাবা এমন আশ্চর্য্য গান আর কখনো শোন নি; এদের সঙ্গে নিয়ে চল।' কাজেই রাজা গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরা আমার সঙ্গে চল। তোমাদের পাঁচশ টাকা করে মাইনে হল।"

এ কথায় গুপী যোড় হাতে রাজামশাইকে নমস্কার করে বল্ল, "মহারাজ, দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক। আমরা আমাদের পিতা মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হব।" রাজা বল্লেন, "আচ্ছা, এ দুদিন আমরা এই বনেই বিশ্রাম করছি। তোমরা তোমাদের মা বাপকে দেখে দুদিন পরে এসে এইখানেই আমাদের পাবে।"

গুপীকে তাড়িয়ে অবধি তার বাবা তার জন্য বড়ই দুঃখিত ছিল, কাজেই তাকে ফিরে আসতে দেখে তার বড় আনন্দ হল। কিন্তু বাঘা বেচারার ভাগ্যে সে সুখ মিলে নি। তার মা বাপ এর কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছিল। গ্রামের লোকেরা তাকে ঢোল মাথায় করে আসতে দেখেই বল্ল, "ঐ রে! সেই বাঘা বেটা আসছে, আবার আমাদের হাড় জ্বালিয়ে মারবে; মার বেটাকে!" বাঘা বিনয় করে বল্ল, "আমি খালি আমার মা বাবাকে দেখতে এসেছি; দুদিন থেকেই চলে যাব, বাজাব টাজাব না।" সে কথা কি তারা শোনে? তারা দাঁত খিঁচিয়ে তার মা বাপের মৃত্যুর কথা বলে, এই বড় বড় লাঠি নিয়ে তাকে মারতে এল, সে প্রাণপণে ছুটে পালাতে পালাতে ইট মেরে তার পা ভেঙ্গে মাথা ফাটিয়ে রক্তারক্তি করে দিল।

গুপী তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে তার বাপের সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সে দেখল যে বাঘা পাগলের মত হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে; তার কাপড় ছিঁড়ে ফালি ফালি আর রক্তে লাল হয়ে গেছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি বাঘার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে! তোমার এ দশা কেন?" গুপীকে দেখেই বাঘা একগাল হেসে ফেলেছে। তারপর সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্ল, "দাদা, বড্ড বেঁচে এসেছি! মুর্খগুলো আরেকটু হলেই আমার ঢোলকটি ভেঙ্গে দিয়েছিল!" গুপীদের বাড়ী এসে গুপীর যত্নে আর তার মা বাপের আদরে বাঘার দুদিন যতটা সম্ভব সুখেই কাটল। দুদিন পরে গুপী

তার মা বাপের কাছ থেকে বিদায় নিবার সময় বলে গেল, "তোমরা ভয়ের হয়ে থাকবে ; আমি আবার ছুটি পেলেই এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

তারপর কয়েক মাস চলে গিয়েছে। গুপী আর বাঘা এখন হাল্লার রাজার বাড়ীতে পরম সুখে বাস করে। দেশে বিদেশে তাদের নাম রটে গিয়েছে, - 'এমন ওস্তাদ আর কখনো হয় নি, হবেও না!' রাজা মশাই তাদের ভারী ভালবাসেন ; তাদের গান না শুনে একদিনও থাকতে পারেন না। নিজের দুঃখ সুখের কথা সব গুপীর কাছে বলেন। এক দিন গুপী দেখল রাজা মশায়ের মুখখানি বড়ই মলিন। তিনি ক্রমাগতই যেন কি ভাবছেন, যেন তাঁর কোনো বিপদ হয়েছে। শেষে একবার তিনি গুপীকে বল্লেন, "গুপী, বড় মুস্কিলে পড়েছি, কি হবে জানি না। শুণ্ডীর রাজা আমার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে।"

শুণ্ডীর রাজা হচ্ছেন সেই তিনি, যিনি গুপী আর বাঘাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলেন। তাঁর নাম শুনেই গুপীর মনে একটা চমৎকার মতলব এল। সে তখন রাজা মশাইকে বল্ল, "মহারাজ! এর জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার এই চাকরকে হুকুম দিন, আমি এ থেকে হাসির কাণ্ড করে দিব।" রাজা হেসে বল্লেন, "গুপী তুমি গাইয়ে বাজিয়ে মানুষ, যুদ্ধের ধারও ধার না, তার কিছু বোঝও না। শুণ্ডীর রাজার বড় ভারী ফৌজ, আমি কি তার কিছু করতে পারি ?" গুপী বল্ল, "মহারাজ, হুকুম পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ক্ষতি ত কিছু হবে না।" রাজা বল্লেন, "তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।" এ কথায় গুপী যারপরনাই খুসী হয়ে বাঘাকে ডেকে পরামর্শ করতে লাগল।

গুপী আর বাঘা সে দিন অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করেছিল। বাঘার তখন কতই উৎসাহ। সে বল্ল, "দাদা, এবারে আমরা দুজনে মিলে একটা কিছু করবই করব। আমার শুধু এক কথায় একটু ভয় হচ্ছে ; হঠাৎ যদি প্রাণ নিয়ে পালাবার দরকার হয় তবে হয়ত আমি জুতার কথা ভুলে গিয়ে সাধারণ লোকের মত কষে ছুট দিতে যাব, আর মার খেয়ে মারা হব। এমনি করে দেখ না সেবারে আমাদের গাঁয়ের মুর্খ্‌গুলোর হাতে আমার কি দশা হল!"

যা হোক, গুপীর কথায় বাঘার সে ভয় কেটে গেল, আর পরদিন থেকেই তারা কাজে লাগল। দিন কতক ধরে রোজ রাত্রে তারা শুণ্ডী চলে যায়, আর রাজ বাড়ীর আশ পাশে ঘুরে সেখানকার খবর নেয়। যুদ্ধের আয়োজন যা দেখতে পেল সে বড়ই ভয়ঙ্কর ; এ আয়োজন নিয়ে এরা হাল্লায় গিয়ে উপস্থিত হলে আর রক্ষা নাই। রাজার ঠাকুর বাড়ীতে রোজ মহা ধুমধামে পুজা হচ্ছে। দশ দিন এমনিতর পূজা দিয়ে, ঠাকুরকে খুসী করে তারা হাল্লায় রওয়ানা হবে।

গুপী আর বাঘা এর সবই দেখল। তারপর একদিন তাদের ঘরে বসে, দরজা এঁটে, সেই ভূতের দেওয়া থলিটিকে বল্ল, "নূতন ধরনের মিঠাই চাই, খুব সরেশ।" সে কথায় থলির ভিতর থেকে মিঠাই যা বেরুল, সে আর বলবার নয়। তেমন মিঠাই কেউ খায় নি, চোখেও দেখে নি। সেই মিঠাই নিয়ে বাঘা আর গুপী শুণ্ডীর রাজার ঠাকুর বাড়ীর বিশাল মন্দিরের চূড়ায় গিয়ে বসল। নীচে খুব পূজার ধূম—ধূপ, ধূনা, শঙ্খ, ঘণ্টা কোলাহলের সীমা নাই. আঙ্গিনায় লোকে লোকারণ্য। সেই সব লোকের মাথার উপরে ঝড়াৎ করে মিঠাইগুলো ঢেলে দিয়ে, বাঘা আর গুপী মন্দিরের চূড়া আঁকড়ে বসে তামাসা দেখতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যে সেই ধূপ ধুনা আর আলোর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কেউ তাদের দেখতে পেল না।

মিঠাইগুলো আঙ্গিনায় পড়তেই অমনি কোলাহল থেমে গেল। অনেকেই লাফিয়ে উঠল, কেউ কেউ চেঁচিয়ে ছুটও দিল। তারপর দু চার জন সাহসী লোক কয়েকটা মিঠাই তুলে, আলোর কাছে নিয়ে ভয়ে ভয়ে দেখতে লাগল। শেষে তাদের একজন চোখ বুঁজে তার একটু মুখে পুরে দিল। দিয়েই আর কথাবার্ত্তা নাই—সে দু হাতে আঙ্গিনা থেকে মিঠাই তুলে খালি মুখে দিচ্ছে আর নাচছে আর আহ্লাদে চ্যাচাচ্ছে। তখন সেই আঙ্গিনা শুদ্ধ লোক মিঠাই খাবার জন্য পাগলের মত কাড়াকাড়ি আর কিচিরমিচির করতে লাগল।

এদিকে কয়েক জন ছুটে গিয়ে রাজামশাইকে বলেছে যে, "মহারাজ! ঠাকুর আজ পূজায় তুষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে যে কি অপূর্ব্ব প্রসাদ, সে কথা আমরা বলতেই পারছি না।" সে কথা শুনবামাত্রই রাজামশাই প্রাণপণে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু হায়! ততক্ষণে সব প্রসাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত উঠান ঝাঁট দিয়েও রাজামশাইয়ের জন্য একটু প্রসাদের গুঁড়ো পাওয়া গেল না। তখন তিনি ভারী চটে গিয়ে বল্লেন, "তোমাদের কি অন্যায়! পূজা করি আমি, আর প্রসাদ খেয়ে শেষ কর তোমরা! আমার জন্যে একটু গুঁড়োও রাখ না! তোমাদের সকলকে ধরে শূলে চড়াব!" এ কথায় সকলে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে যোড়হাতে বল্ল, "দোহাই মহারাজ! আপনার প্রসাদ কি আমরা খেয়ে শেষ করতে পারি? বাপরে! আমরা খেতে না খেতেই ঝাঁ করে কোন্‌খান দিয়ে ফুরিয়ে গেল! আজ আমাদের প্রসাদগুলো আপনি মাপ করুন; কালকের যত প্রসাদ. সব মহারাজ একাই খাবেন!" রাজা তাতে বল্লেন, "আচ্ছা তাই হবে। খবরদার! মনে থাকে যেন।"

পরদিন রাজামশাই প্রসাদ খাবেন, তাই এক প্রহর বেলা থাকতেই তিনি ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় এসে আকাশের পানে তাকিয়ে বসে আছেন। আর সকলে ভয়ে ভয়ে একটু দূরে বসে তাঁকে ঘিরে তামাসা দেখছে। আজ পূজার

ঘটা অন্য দিনের চেয়ে শতগুণ; সবাই ভাবছে, দেবতা তাতে খুসী হয়ে রাজা মশাইকে আরো ভাল প্রসাদ দিবেন।

রাত দুপুরের সময় গুপী আর বাঘা আরো আশ্চর্য্য রকমের মিঠাই নিয়ে এসে মন্দিরের চূড়ায় বসল। আজ তাদের পরনে খুব জমকালো পোষাক মাথায় মুকুট, গলায় হার, হাতে বালা, কানে কুণ্ডল; তারা দেবতা সেজে এসেছে। ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু রাজামশাই আকাশের পানে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় গুপী আর বাঘা হাসতে হাসতে তাঁর উপরে সেই মিঠাইগুলো ফেলে দিল। তাতে রাজামশাই প্রথমে একটা চীৎকার দিয়ে তিন হাত লাফিয়ে উঠলেন, তারপর তাড়াতাড়ি সামলিয়ে গিয়ে, দু হাতে মিঠাই তুলে মুখে দিতে লাগলেন, আর ধেই ধেই করে নাচনটা যে নাচলেন!

এমন সময় গুপী আর বাঘা হঠাৎ মন্দিরের চূড়া থেকে নেমে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সকলে 'ঠাকুর এসেছেন' 'ঠাকুর এসেছেন' বলে কে আগে গড় করবে ভেবে ঠিক পায় না। রাজামশাই ত লম্বা হয়ে মাটিতে পড়েই রয়েছেন, আর খালি মাথা ঠুকছেন। গুপী তাঁকে বল্ল, "মহারাজ! তোমার নাচ দেখে আমরা বড়ই তুষ্ট হয়েছি; এস, তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি।" রাজা তা শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন; দেবতার সঙ্গে কোলাকুলি, সে কি কম সৌভাগ্যের কথা?

কোলাকুলি আরম্ভ হল; সকলে 'জয় জয়' বলে চ্যাঁচাতে লাগল। সেই অবসরে গুপী আর বাঘা রাজামশাইকে খুব করে জড়িয়ে ধরে বল্ল, "এখন তবে আমাদের ঘরে যাব!" বলতে বলতেই তারা তাঁকে শুদ্ধ একেবারে এসে তাদের নিজের ঘরে উপস্থিত। ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনায় সেই লোকগুলো অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে আকাশের পানে চেয়ে রইল, তারপর যখন রাজামশাই আর ফিরলেন না, তখন তারা যে যার ঘরে এসে বল্ল, "কি আশ্চর্য্যই দেখলাম! রাজামশায় সশরীরে স্বর্গে গেলেন! দেবতারা নিজে তাঁকে নিতে এসেছিলেন!"

এদিকে রাজামশাই গুপী আর বাঘার কোলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তাদের ঘরে এসেও অনেকক্ষণ তাঁর জ্ঞান হয় নি। ভোরের বেলায় তিনি চোখ মেলে দেখলেন যে সেই দুটো ভূত তাঁর মাথার কাছে বসে আছে। অমনি তিনি তাদের পায়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, "দোহাই বাবা! আমাকে খেয়ো না। আমি দুশ মোষ মেরে তোমাদের পূজা করব।"

গুপী বল্ল, "মহারাজ, আপনার কোন ভয় নাই। আমরা ভূতও নই, আপনাকে খেতেও যাচ্ছি না।" রাজামশাইয়ের কিন্তু তাতে একটুও ভরসা হল না। তিনি আর কোনো কথা না বলে মাথা গুঁজে বসে কাঁপতে লাগলেন।

এদিকে বাঘা এসে হাল্লার রাজাকে বল্ল, "কাল রাত্রে আমরা শুণ্ডীর রাজাকে ধরে এনেছি; এখন কি আজ্ঞা হয়?" হাল্লার রাজা বল্লেন, "তাঁকে নিয়ে এস।"

দুই রাজায় যখন দেখা হল, তখন শুণ্ডীর রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ধরে এনেছে। হাল্লা জয় করা ত তাঁর ভাগ্যে ঘটলই না, এখন প্রাণটিও যাবে। কিন্তু হাল্লার রাজা তাঁকে প্রাণে না মেরে শুধু তাঁর রাজ্যই কেড়ে নিলেন। তারপর তিনি গুপী আর বাঘাকে বল্লেন, "তোমরাই আমাকে বাঁচিয়েছ, নইলে হয়ত আমার রাজ্যও যেত প্রাণও যেত। আমি আর তোমাদের কি উপকার করতে পারি? শুণ্ডী রাজ্যের অর্দ্ধেক আর আমার দুটি কন্যা তোমাদের দুজনকে দান করলাম।"

তখন খুবই একটা ধূমধাম হল। গুপী আর বাঘা হাল্লার রাজার জামাই হয়ে আর শুণ্ডীর অর্দ্ধেক রাজ্য পেয়ে পরম আনন্দে সঙ্গীতের চর্চ্চা করতে লাগল। গুপীর মা বাপের মান্য আর সুখ তখন দেখে কে?

—

[উপেন্দ্রকিশোরের কাহিনী 'গুপী গাইন' সন্দেশ-পত্রিকার চৈত্র ১৩২১ (২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা) থেকে ভাদ্র ১৩২২ (৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা) পর্যন্ত মোট ৬ মাসে ছয় কিস্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান পুনর্মুদ্রণে সেই মূল পাঠ হুবহু গ্রহণ করা হয়েছে এবং ছ'টি কিস্তিকে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ ক'রে ছাপা হয়েছে। —স. এ.]

ক্রোড়পত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য

গুপী গাইন বাঘা বাইন

সত্যজিৎ রায়

পূর্ণিমা পিকচার্সের নিবেদন (১৯৬৯)

মূল কাহিনী : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

চিত্রনাট্য / সাজসজ্জা / গীত রচনা / আবহসংগীত ও পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়

আলোকচিত্র সৌমেন্দু রায়
শিল্প নির্দেশনা বংশী চন্দ্রগুপ্ত
সম্পাদনা দুলাল দত্ত
মেক আপ অনন্ত দাস
শব্দ গ্রহণ নৃপেন পাল / সুজিত সরকার / অতুল চট্টোপাধ্যায়
প্রধান কর্মসচিব অনিল চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা ভানু ঘোষ

নেপথ্যকণ্ঠে অনুপকুমার ঘোষাল, (গুপীর গান)
জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও অন্যান্য
প্রযোজনা নেপাল দত্ত / অসীম দত্ত

ভূ মি কা লি পি

গুপী গাইন তপেন চট্টোপাধ্যায়
বাঘা বাইন রবি ঘোষ
শুণ্ডি রাজা / হাল্লা রাজা সন্তোষ দত্ত
হাল্লার মন্ত্রী জহর রায়
জাদুকর বরফি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
আমলকির রাজা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
হাল্লার সেনাপতি শান্তি চট্টোপাধ্যায়
কয়েদখানার প্রহরী নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
ভূতের রাজা / জনৈক বৃদ্ধ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হাল্লার গুপ্তচর চিন্ময় রায়
গুপীর বাবা গোবিন্দ চক্রবর্তী
জনৈক বৃদ্ধ হরিধন মুখোপাধ্যায়
মোসাহেব অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
পেয়াদা কামু মুখোপাধ্যায়
শুণ্ডির অধিবাসী অশোক মিত্র

দৈর্ঘ্য ১১৭২১ ফুট সময় ১৩২ মিনিট

১

গুপী ধানক্ষেতের আল ধরে তানপুরা কাঁধে হেঁটে আসছে। মুখে হাসি। ছবি স্থির হয়ে যায়, পর্দায় লেখা পড়ে : 'কানু কাইনের ছেলে গোপীনাথের বড় গানের শখ।'

গুপী আবার হেঁটে চলে। দূরে মাঠে একজন বৃদ্ধ চাষাকে দেখতে পেয়ে গুপী ডাক দেয়।

গুপী ও দ্বিজু খুড়ো!

বৃদ্ধ কি গো!

গুপী এই ছাখো!

বৃদ্ধ ওটা কি?

গুপী তানপুরা, গান হবে।

বৃদ্ধ কি গান?

গুপী ওস্তাদের গান। গোপীনাথ ওস্তাদ। তুমি চাষা, আমি ওস্তাদ খাসা! হে হে, হেহে···

গুপী হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়।

গাঁয়ের মুখে একটা গাছতলায় বসে কয়েকজন বৃদ্ধ পাশা খেলছেন। তাঁদের কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে। গুপী তাঁদের দিকে এগিয়ে আসে। একজন বৃদ্ধ গুপীকে দেখতে পান।

প্রথম বৃদ্ধ ও বাবা! এ যে গদা হস্তে দ্বিতীয় পাণ্ডবের প্রবেশ দেখছি হে!

গুপী পেন্নাম হই ঠাকুরমশাইরা।

প্রথম বৃদ্ধ কানু কাইনের ছেলে না তুমি?

গুপী আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কি নাম তোমার?

গুপী শ্রী গোপীনাথ কাইন।

প্রথম বৃদ্ধ দেখি তোমার যন্ত্রখানা।

গুপী যন্ত্রখানা বৃদ্ধের হাতে দেয়। বৃদ্ধ দেখে গুপীকে ফেরত দিয়ে দেন।

প্রথম বৃদ্ধ সরেশ তানপুরাখানা হে! তা মূল্য কত নিল?

[ক]

গুপী কিছুই না। ঐ পাঁচপুকুরের গোঁসাই খুড়ো, তেনার কাছ থেকে পাওয়া।

প্রথম বৃদ্ধ পল্লব গোঁসাই! সে তো বড় ওস্তাদ হে!

গুপী খুব নাম ডাক। তা তিনি রোজ সকালে উঠে গলা সাধেন তো। আমার আবার খুব গান-বাজনার শখ। তা ক'দিন যাবৎ সেই ভোর বেলা উঠে গিয়ে তেনার গলা সাধা শুনছি। তা দেখি কি তেনার তানপুরা আছে দুইখানা, একখানা হাতে নেন, আরেকখানা রাখা থাকে সেই ঘরের কোনায়। তা আজ গিয়ে তারে বললাম কি,– আপনার ঐটা যেটা ব্যবহার করেন না, সেইটা আমারে দেন না! তা বলে কি ওটা তুই নিবি কি, ওটা তো অপয়া। আমি বললাম, আমার তাতেই হবে, ওইটাই দ্যান। তা বলে, অমনি দেবো কেন? তা বলি, পয়সা নেই আমার খুড়ো, আমরা হলাম মুদি, পয়সা কোথায় পাবো? তা বলে, কাজ ক'রে দে। বলি, কি কাজ বলেন। বলে, তামুক সেজে দে। দেলাম। বলে, পা টিপে দে। দেলাম। বলে, পাতকুয়ো থেকে জল তুলে দে। দেলাম। বলে, ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে, মেরে দে। তা-ও দেলাম। জানেন, এই ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর। বাঁশের এক এক ঘায়ে–

গুপী তানপুরাটাকেই দু'হাতে লাঠির মতো ধরে আঘাত হানার ভান করে। বৃদ্ধেরা ভয়ে পিছিয়ে যান।

বৃদ্ধগণ ও হো হো! বীরপুরুষ! বাঃ! তাতেই দিয়ে দিলে?

গুপী আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের হাতে এই কান-টান মুলে-টুলে দিয়ে দিলে। দেখুন না, এখন সব কান টান তাততেছে।

বৃদ্ধ সে কি হে! তোমার কান?

গুপী আমারও কান, এনারও কান। বললেন, যন্ত্রের সুর যন্ত্রের কানে আর তোমার সুর তোমার কানে। দু'টো একসঙ্গে করলে সুরে সুরে মিল হয়।

বৃদ্ধ সুরে সুরে–

অপর বৃদ্ধ ঠিক কথা!

দ্বিতীয় বৃদ্ধ হক কথা!

প্রথম বৃদ্ধ এক কাজ কর না কেন বাপু। একখানা গেয়ে শুনিয়ে দাও না কেন।

অন্য বৃদ্ধেরা যন্ত্রের আর কণ্ঠের দুই-এরই পরীক্ষা হয়ে যাক!

গুপী গাইবো?

বৃদ্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ, গাও।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ গাইবে বই কি!

গুপী বসে পড়ে।

গুপী কিন্তু, গান যে আমার একখানার বেশি আর শেখা হয় নি।

প্রথম বৃদ্ধ তা সেই একখানাই গাও।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ অতিরিক্ত তো বলা হয় নি তোমাকে!

গুপী কিন্তু সে তো সকালের গান ঠাকুরমশাইরা। ভৈরবী রাগিণী। সকাল কি এখনো আছে?

প্রথম বৃদ্ধ আছে গো আছে, বিলক্ষণ আছে। সকাল কি ওরকম ফস ক'রে চলে যায়!

দ্বিতীয় বৃদ্ধ আমার এই যষ্টির ছায়া যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ প্রস্তর খণ্ড স্পর্শ করছে, ততক্ষণ সকাল।

বৃদ্ধের লাঠির ছায়া পড়ে মাটিতে। ছায়া থেকে সামান্য দূরে পাথরের টুকরোটাকে দেখা যায়। গুপী তাকিয়ে দেখে।

প্রথম বৃদ্ধ তুমি গাও।

বৃদ্ধেরা লক্ষ করেন গুপী ইতস্তত করছে। শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে গাইবে বলে।

গুপী একটু ছায়াটার দিকে খেয়াল করবেন ঠাকুরমশাইরা—আমার আবার গাইবার সময় হুঁশ থাকে না।

বৃদ্ধেরা গুপীকে লক্ষ করেন। গুপী তান শুরু করে।

গুপী আ-আ-আ
দ্যাখরে নয়ন মেলে—

দ্বিতীয় বৃদ্ধ লাঠিটিকে সামান্য সরাতেই লাঠির ছায়া এসে পড়ে পাথরের ওপর। গুপীর হেঁড়ে গলার গান কোনো বৃদ্ধেরই মনঃপূত হয় না। প্রথম বৃদ্ধের চোখ পড়ে লাঠির ছায়ায়।

প্রথম বৃদ্ধ এ হে হে হে—

গুপী অসহায়ের মতো ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধেরা সবাই একসঙ্গে -

বৃদ্ধেরা সকাল ফুরিয়ে গেল।

বৃদ্ধদের মন্তব্যে গুপী দাঁড়িয়ে ওঠে।

প্রথম বৃদ্ধ সকাল শেষ।

গুপী সময়টা একটু কম হয়ে গেল। আর একটু সময় পেলে আপনাদের পুরো গানটা ভালো ক'রে শুনিয়ে দিতাম।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ দেখ গোপীনাথ, তুমি এক কাজ কর। রাজামশাই— বুঝেছ? এই আমাদের রাজামশাই সংগীতের খুব বড় সমঝদার। তাঁকে গিয়ে তোমার গানখানা একবার শোনাও।

গুপী হে হে! এ আপনারা কি যে বলেন ঠাকুরমশাইরা? রাজবাড়িতে আমায় ঢুকতে দেবেন কেন?

বৃদ্ধেরা আঃ হা! বলি তোমার ঢোকার প্রশ্ন উঠছে কেন—ঢুকবে তোমার গান, আর ঢুকবে একেবারে রাজামশাই-এর কানের ভেতর।

তৃতীয় বৃদ্ধ কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে গো!

গুপী আজ্ঞে! সেটা কেমন ক'রে হয় যদি একবারটি বলে দেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে রাজবাড়ির অবস্থান বোঝাতে থাকেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ শোনো, এই হল রাজবাড়ি, এই হল পাঁচিল। দোতলায় নৈঋত কোণে হল রাজার শয়ন-কক্ষ। এই হল তোমার বাসস্থান। এই তুমি চলে যাবে সোজা রাজবাড়ির দিকে। রাজামশাই ওঠেন খুব ভোরে। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে পৌঁছবে। পাঁচিলের ঐখানটায় বসে রাজবাড়ির দিকে মুখ ক'রে তুমি ছাড়বে তোমার গলা—তারপর দেখো কি হয়।

গুপী কী হবে ঠাকুরমশাইরা?

বৃদ্ধেরা দ্যাখ না কী হয়? তোমার কপাল ফিরে যাবে গোপীনাথ।

গুপী আপনাদের আর কি বলব? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমায় আশীর্বাদ করবেন। আমার বাপরে যদি বলি তা উনি কী বলেন জানেন—বলে, 'তুই মুদীর ছেলে তোর গলায় সুর আসবে কোত্থেকে'—আপনারা যদি একটু বইলে দেন—

বৃদ্ধেরা আমাদের কিছু বলতে হবে না। যা করার রাজামশাই করবেন।

চতুর্থ বৃদ্ধ আর শোনো। রাজামশাই যখন তোমার নাম জিজ্ঞেস করবে, তখন বলবে তোমার নাম গোপীনাথ গাইন।

গুপী গাইন!

বৃদ্ধ গানং করতি যঃ স গাইন।

গুপী 'গাইন' শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে চলে যায়। বৃদ্ধেরা আবার পাশা

খেলতে শুরু করেন।

গুপী পুকুর পাড় দিয়ে এসে, পিছনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়িতে প্রবেশ করে। গুপীর বাবা কানুকে দেখে গুপী বলে –

গুপী তুমি যে বল সুর নেই আর বটতলার বাবুরা যে সুখ্যাতি করলেন। ওদের গান গেয়ে শোনালাম। আর তাঁরা যে বললেন –

কানু কী বললেন ?

গুপী কিছু না।

কানু ঘটে কিছু দিয়েছে তোমার ভগবান, যে তাঁদের তামাসা তুমি বুঝবে ? গরিব বাপের সিধে কথায় তোমার হুঁশ গেল না। তুমি গেলে বটতলার বাবুদের গান শোনাতে। আর তেনারা করবে তোমার সুখ্যাতি আর তুমি সেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে তোমার কাজ-কম্ম ফেলে বসে থাকবে ? তুমি ভেবেছ কি ? যা দোকানে বস গিয়ে ! আর একটিবার যদি গানের গা শুনেছি কি তোমার ঐ তানপুরা যাবে উনোনের মধ্যে।

কানু রেগে সেখান থেকে চলে যায়। গুপী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

২

পরদিন, ভোরবেলা।
গুপীদের শোবার ঘরে দেখা যায় কানু ঘুমিয়ে আছে। গুপী আস্তে আস্তে তানপুরা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে খিড়কির দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। গুপী হেঁটে রাজবাড়ির পাশে টিপির কাছে পৌঁছে যায়।

রাজার শোবার ঘরে রাজাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়।
গুপী গান ধরে –

গুপী আ আ আ
দ্যাখরে ! নয়ন মেলে !
জগতের বাহার !

গুপীর গান শুনে রাজার ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্তি এবং রাগে রাজা বিছানা থেকে নেমে, জানলার কাছে এসে গুপীকে দেখতে পান। গুপী গাইছে –

গুপী দিনের আলোয় কাটে অন্ধকার
আহা মরি কী বাহার !

রাজা পেয়াদা !

পেয়াদা এসে রাজাকে সেলাম করে।

রাজা দেখো ! বাহারমে কৌন চিল্লাতা হ্যায়। উসকো পাকাড়কে ভিতরমে লে আও।

পেয়াদা জি হুজুর।

পেয়াদা সেলাম ঠুকে চলে যায়। রাজা রাগে আবার জানলার কাছে চলে যান।

গুপী ঢিপির ওপর বসে গান গাইছে। পেয়াদা পেছন থেকে এসে খোঁচা মারায় গান থেমে যায় গুপীর।

পেয়াদা চলো। চলো।

গুপী কোথায় ? রাজবাড়ির ভেতর ?

পেয়াদা হাঁ হাঁ, ভিতরে।

গুপী রাজামশাই ডেকেছেন ?

পেয়াদা হাঁ হাঁ, ডেকিয়েছেন।

গুপী আমার গান শুনেছেন ?

পেয়াদা হাঁ হাঁ, শুনিয়েছেন।

গুপী কিছু বলেছেন ?

পেয়াদা হাঁ হাঁ, বলিয়েছেন।

পেয়াদা গুপীকে নিয়ে চলে যায়।

রাজবাড়ির ভিতর। সিংহাসনে বসে রাজা বাটিতে দুধ খাচ্ছেন। পাশে মোসাহেববৃন্দ। দুধ খাওয়া শেষ হলে হাত দিয়ে মুখ মুছে ফেলেন।

রাজা কী নাম তোর ?

গুপী দাঁড়িয়ে। কি বলবে ভেবে পায় না। শেষে বলে ওঠে –

গুপী আজ্ঞে, আমার নাম ?

মোসাহেববৃন্দ হ্যাঁ হ্যাঁ, নাম জিজ্ঞেস করছেন। নাম বল, নাম বল।
গুপী আজ্ঞে আমার নাম শ্রী গোপীনাথ কাইন। গাইন, গাইন।
রাজা চেঁচাইছিলি কেনে?
মোসাহেববৃন্দ চেঁচাচ্ছিলি কেন? চেঁচাচ্ছিলি কেন?
গুপী আমি?
রাজা হ্যাঁ।
গুপী আমি তো চ্যাঁচাই নি রাজামশাই। আমি গান গাইছিলাম। ভৈরবী রাগিণী। এই যে আমার তানপুরা।
রাজা কই দেখি।
মোসাহেব তানপুরা দেখাও।
গুপী পাঁচপুকুরের গোঁসাইখুড়ো, তেনার কাছ থেকে পাওয়া।

গুপী এগিয়ে এসে রাজার হাতে তানপুরাখানা তুলে দেয়।

রাজা সপ্তক জানা আছে?

গুপী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মোসাহেববৃন্দ সাত স্বর। সাত স্বর জানা আছে?
গুপী আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজামশাই।
রাজা তৃতীয় স্বরটা কী?

গুপী হাতের কড় গুনতে গুনতে—

গুপী গা।
রাজা ষষ্ঠ স্বর?
গুপী ধা।
রাজা দুয়ে মিলে কি হয়?
গুপী দুয়ে মিলে—?

গুপী চিন্তায় পড়ে। হেসে ওঠে মোসাহেববৃন্দ।

রাজা গাধা।

তানপুরাখানা দু'হাতে ছুঁড়ে সামনের মেঝেতে ফেলে দেন রাজা। তানপুরাটা পড়ে ভেঙে যায়।

রাজা একে গাধার পিঠে তুলে গ্রামের বাইরে বার ক'রে দাও। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

গ্রামের রাস্তা। পেয়াদা ঢোল নিয়ে ঘোষণা করছে।

পেয়াদা রাজামশাইয়ের আদেশে গোপীনাথ কাইনকে আমলকি গ্রাম থেকে দূর কইরে দেওয়া হতিছে।

পেয়াদা গুপীকে ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় গ্রামের চৌমাথায়।
গুপীকে গাধার পিঠে তুলে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।
গুপীকে সবাই মিলে ধরে গাধার পিঠে ওঠায়, তারপর ধাক্কা দিয়ে গাধাকে ঠেলে দেয়।
গুপীর বাবা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি লক্ষ করেন।
গ্রামের বটতলার সেই পাঁচ বৃদ্ধ হাসিমুখে তামাসা দেখছেন।
গুপীর বাবা চোখের জল মুছে বাড়ির পথ ধরেন।
গুপী গাধার পিঠে চড়ে দূরে চলে যায়।

গ্রামের রাস্তা। একা গুপী গাধার পিঠে চড়ে চলেছে।

গুপী তৃতীয় সুর, ষষ্ঠ সুর।
গুপী চললো বহু দূর!

গুপী আপন মনে বলতে বলতে চলেছে। এক রাস্তা ছেড়ে গাধা অন্য রাস্তা ধরে।

গুপী গুপী চললো বহু দূর।
কোথায় চললি রে? চলি চলি চলি চলি
পথের যে নাই শেষ গো—
গুপী আছে বেশ গো।
কেবল আছে ভাবনা, ভাবনা।
সন্ধ্যা হইলে বনবাদাড়ে
বাঘে যদি ধরে।
গুপী যদি মরে?

রাস্তার ধারে বাঁশবন। পাশে ছোট ডোবায় জমে আছে জল। গুপী গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়ে।

গুপী কোমর ধইরে গেছে গো। র র র। যারে ব্যাটা যা, আমলকি ফিরে যা। যা, যা।

৩

গুপী সামনের বাঁশবনে প্রবেশ করে। এদিক ওদিক তাকায়।
দূর থেকে 'ঢপ্ ঢপ্' আওয়াজ ভেসে আসে। গুপী শব্দটাকে লক্ষ ক'রে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে এগোতে থাকে।
গাছের গুঁড়ির পাশে একটা ঢোল পড়ে আছে। গাছের উপর থেকে জল পড়ায় ঢোলের শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে গুপীকে ঢোলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। গুপীর চোখ পড়ে ঢোলের পাশে ঘুমন্ত বাঘার উপর। বাঘার অবস্থা দেখে গুপী ফিক ক'রে হেসে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় বাঘার।

বাঘা কেডা ?
গুপী আরে বাপ !
বাঘা চোপ্ !
গুপী চোপ্ !
বাঘা খবরদার !
গুপী খবরদার !

বাঘা হঠাৎই কথা থামিয়ে আপন মনে হাঁটু বাজাতে থাকে।

বাঘা ধিন্‌তা ধিন্‌তা
তাক ধিন্ ধিন্‌তা।

গুপী বাঘার দেখাদেখি-

গুপী ধিন্‌তা ধিন্‌তা
তাক ধিন্ ধিন্‌তা।

বাঘা আঙুল মটকায়। গুপীও বাঘার দেখাদেখি আঙুল মটকায়। বাঘা হাই তোলে। গুপীও হাই তোলে।
বাঘা লাফিয়ে ওঠে। বাঘার হাত লেগে ঢোল গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

বাঘা তবেরে !
গুপী তোমার ঢোল যে জল পইড়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে গো।

হঠাৎই দূরে বাঘের ডাক শোনা যায়। বাঘা সরে আসে গুপীর কাছে।

বাঘা কি নাম তোমার ?
গুপী আমার নাম ?

বাঘা তোমার না তো কার ?
গুপী আমার নাম শ্রী গোপীনাথ গাইন।
বাঘা নিবাস ?
গুপী আমলকি। তোমার ?
বাঘা হরতকি।
গুপী তা, তুমি এখানে যে ?
বাঘা তাড়ায়ে দেল। গাধার পিঠে তুইলে দূর ক'রে দেছে।
গুপী রাজামশাই ?
বাঘা জানলে কি কইরা ?
গুপী আমারও যে।
বাঘা এসে গেছে।

বাঁশবন। দূরে বাঘ আসতে দেখা যায়।
বাঘ এগিয়ে আসে। গুপী-বাঘা একদৃষ্টে বাঘের দিকে চেয়ে থাকে।

বাঘা এদিকে দেখছে।
গুপী আমাদের দেখছে।

বাঘটা ঘুরে দাঁড়ায়। ভয়ে গুপী-বাঘার দাঁতে দাঁত লেগে যায়।

বাঘা চইলা গেছে বোধ হয়।
গুপী যাই নি! যাই নি!

গুপী-বাঘা দাঁতে দাঁত চেপে একদৃষ্টে বাঘের দিকে তাকিয়ে থাকে।
বাঘটা একবার ওদের দিকে তাকিয়ে চ'লে যায়। ওদের ভয় কাটে।
বাঘা দৌড়ে ঢোল আনতে যায়।

বাঘা পলাইছে, পলাইছে। ভয় পেয়েছে।

বাঘা ঢোল নিয়ে ফিরে আসে গুপীর কাছে। শুরু করে ঢোল বাজাতে।

গুপী কেন ভয় পেয়েছে বলতো ?
বাঘা পাবে না—আমার নাম
বয়ে কাটি, ঘয়ে কাটি
ঢোলে চাঁটি বাঘা—
বাঘা বাইন
গুপী (হেসে) বাঘা বাইন।

বাঘা গান গাও, গান গাও, তুমি ত গাইন, তাহলে আর বাঘ আসবে না।

গুপী লাফিয়ে লাফিয়ে বাঘার ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে তাল মেলায়।

গুপী সা সা সাগারে
বাঘারে ভাগারে
সা সা সাগারে
বাঘারে ভাগারে
মোরা দু'জনারে
অকূল পাথারে।

গুপী-বাঘার পিছনে বাঁশবনের দৃশ্য বদলাতে থাকে।

গুপী মোরা দু'জনারে
অকূল পাথারে
ঝোপে ঝাড়ে ঝাড়ে

গুপী-বাঘা বাঁশবনের দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে ওঠে।

গুপী কেবা দেখে কারে
কেবা দেখে কারে—

বাঁশবনের ফাঁকে ফাঁকে ভূতেদের আসতে দেখা যায়। আস্তে আস্তে অসংখ্য ভূত বাজনার তালে নাচতে নাচতে এসে জড়ো হয়।
গুপী-বাঘা সেদিকে তাকিয়ে থাকে। গুপীর মুখে গান বন্ধ হয়ে যায়।

গুপী বাঘাদা একি হলো গো? ও বাবা! এ কি হইচে গো?
বাঘা থেমো না, গেয়ে যাও।

৪

বাঁশবনের পুরো দৃশ্যটা বদলে অন্ধকার হয়ে যায়। গুপী-বাঘা কি যেন দেখে হাত জোড় ক'রে বসে পড়ে। অন্ধকারের মধ্য থেকে নাচের বাজনা ভেসে আসে।

সঙ্গে একটা ভূতের পা সামনে এগিয়ে এসে নাচের ছন্দে তাল দেয়।

সব ভূতেরা এগিয়ে এসে নাচতে শুরু করে। প্রথমে রাজা ভূতের দল, পরে চাষা বা প্রজার দল, এর পর সাহেব ভূত এবং শেষে বানিয়া, বামুন আর পাদ্রি মিলে মোটা ভূতের দল।

নাচতে নাচতেই এদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগে এবং নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করে। সেই লড়াইতে প্রত্যেক দলের ভূতই মারা পড়ে। শেষে চারটি ভূতের দলকেই চার সারিতে একসঙ্গে নাচতে দেখা যায়। নাচের দৃশ্য অদৃশ্য হওয়া মাত্র ভূতের রাজার আবির্ভাব হয়। তিনি দুই হাত নেড়ে গুপী-বাঘাকে কাছে ডাকেন।

ভূতের রাজা গুপী বাঘা গুপী বাঘা
ভয় নেই, ভয় নেই
কাছে আয় কাছে আয়
তোরা বড় ভালো ছেলে
কাছে আয়।

গুপী-বাঘা অবাক হয়ে যায় ওদের নাম শুনে।

গুপী আপনি আমাদের চেনেন?
বাঘা আপনি আমাদের নাম জানেন?
ভূতের রাজা নাম জানি, ধাম জানি।
সব জানি।
রাজা দিল দূর ক'রে
ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই
কোথা যাবি, কিবা খাবি
জানা নেই জানা নেই
জানা নেই –
গুপী সত্যি রাজামশাই। আমাদের বড় মুশকিল।
বাঘা কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।
ভূতের রাজা আমি আছি, আমি আছি।
ভূতো রাজা খুশি হলে
বর দিই খুশি হলে বর দিই।
তিন বর –
গুপী-বাঘা তিন বর!
ভূতের রাজা শুধু তিন শুধু তিন।

ভেবে টেবে বল তোরা
কোন বর, কোন বর চাস
বল।

গুপী রাজামশাই আমাদের যেন খাওয়া-পরার কোনো ভাবনা না থাকে।

ভূতের রাজা খাওয়া পরা বেশ বেশ!
খেতে চেয়ে হাত তালি,
জামা চেয়ে হাত তালি।
এর হাতে ওর হাতে
মিলে তালি—
আর কোন বর চাস
বল—

বাঘা আমাদের খুব দেশ বেড়াবার বড় শখ রাজামশাই।

গুপী যদি একটু ঘুরে টুরে বেড়াতে পারতাম!

ভূতের রাজা দেশ দেখা, দেশ দেখা বেশ বেশ বেশ বেশ
জুতো জোড়া পায়ে পরে
কোথা যাবি নাম ক'রে
এর হাতে ওর হাতে
তালি দিবি তালি দিবি।

শূন্য থেকে গুপী-বাঘার সামনে এসে পড়ে দু'জোড়া নকশা করা নাগড়া জুতো।

গুপী রাজামশাই, যদি আমরা গান বাজনা ক'রে লোককে একটু খুশি করতে পারতাম!

ভূতের রাজা হবে হবে হবে হবে
গান হবে ঢোল হবে
সুর হবে তাল হবে লয় হবে
লোকে শুনে ভ্যাবাচ্যাকা
স্থির হয়ে থেমে যাবে
থেমে যাবে থেমে যাবে
থেমে যাবে—

বর দিয়ে ধীরে ধীরে ভূতের রাজা অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে আলোটাও মিলিয়ে যায়।

৫

সকাল। গুপী-বাঘা বাঁশবনে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর গুপীর ঘুম ভাঙে। মনে পড়ে যায় গত রাত্রের কথা, ভাবে সে কি স্বপ্ন দেখছিল? হঠাৎ পাশে পড়ে থাকা থলেটার দিকে নজর যায়। ভেতর থেকে বার ক'রে আনে ভূতের রাজার দেওয়া জুতো জোড়া। তারপর থলেটা নিয়ে উঠে পড়ে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। বাঘার ঘুম তখনো ভাঙে নি।

গুপী আপন মনে সুর ক'রে বলতে থাকে—

গুপী ভূতের রাজা দিল বর,
জবর জবর তিন বর!

গুপী বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে নদীর পাশে এসে দাঁড়ায়। সকালের সূর্য ওঠা দেখতে পায়। গুপী মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে হঠাৎ তান ধরে—

গুপী আ—আ—আ

গুপীর গলার আওয়াজে চমৎকার সুর। সে নিজের গলার সুরে নিজেই মুগ্ধ। আনন্দে হাত তালি দিয়ে মাটিতে একবার ডিগবাজি খেয়ে নেয়। বসা অবস্থায় মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে নদী, ওপারের সূর্যোদয়।

ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে ওঠে, তারপর গান ধরে।

গুপী দ্যাখরে নয়ন মেলে
জগতের বাহার,
জগতের বাহার—

দূরে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা যায়।

গুপী দিনের আলোয়
কাটে অন্ধকার।
কী বাহার!
কী বাহার!
দিনের আলোয়—
কাটে অন্ধকার।

বাঘা তখনো ঘুমোচ্ছে। সে হাত দিয়ে ঘুমের মধ্যেই মাছি তাড়ায়।

গুপী আহা মরি কী বাহার !
কী বাহার কী বাহার !

গুপীর গান শেষ হওয়া মাত্র ঢোলের আওয়াজ শোনা যায়। গুপী তাকিয়ে দেখে বাঘা ঢোলের র‍্যালা দিচ্ছে! গুপী সেদিকে ছুটে যায়। দু'জনে পাশাপাশি চলে আসার পর গুপী গাইতে শুরু করে।

গুপী ভূতের রাজা দিল বর।
জবর জবর তিন বর।
বাঘা এক দুই তিন।
গুপী জবর জবর তিন বর—
বাঘা এক দুই তিন।
গুপী যা চাই পরতে
খাইতে পারি।
বাঘা এক নম্বর, এক নম্বর।
গুপী যেখানে খুশি যাইতে পারি—
বাঘা দুই নম্বর, দুই নম্বর।
গুপী সানি ধাপা মা গা রে সা
গাইতে পারি।
বাঘা তিন নম্বর, তিন নম্বর।
গুপী কেমন সুন্দর—
ভূতের রাজা দিল বর!
বাঘা ভূতের রাজা দিল,
ভূতের রাজা দিল,
ভূতের রাজা দিল বর!
গুপী কেমন সুন্দর—

দু'জনে গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে।

গুপী আহা ভূত!
বাঘা বাহা ভূত!
গুপী কিবা ভূত!
বাঘা কিম্ভূত!
গুপী বাবা ভূত!
বাঘা ছানা ভূত!

গুপী খোঁড়া ভূত !
বাঘা কানা ভূত !
গুপী কাঁচা ভূত !
বাঘা পাকা ভূত !
গুপী সোজা ভূত !
বাঘা বাঁকা ভূত !
গুপী রোগা ভূত !
বাঘা মোটা ভূত !
গুপী আধা ভূত !
বাঘা গোটা ভূত !

হাঁটতে হাঁটতে গুপী-বাঘা অন্য দিকে চলে যায়। ওদের গান চলতেই থাকে—

গুপী আরো হাজার ভূতের রাজার দয়া
মোদেরই উপর।
ভূতের রাজা দিল বর।
তাইরে নাইরে নাইরে
আর ভাবনা কিছুই নাইরে।
তাক ধিন্ ধিন্‌না ধিন্‌তা
আর নাইকো মোদের চিন্তা—

বাঘা কেবল পেটে বড় ভুখ।
না খেলে নাই কোনো সুখ।

গুপী হাত তালি দেয়। বাঘা ঢোলে চাঁটি মারে। গুপী দৌড়ে আসে বাঘার দিকে।

গুপী আয়রে তবে খাওয়া যাক।
মণ্ডা মিঠাই চাওয়া যাক।

বাঘা কোর্মা কালিয়া পোলাও
জলদি লাও
জলদি লাও—

গুপী কোর্মা কালিয়া পোলাও
জলদি লাও
জলদি লাও—

গুপী-বাঘা হাত তালি দেয়। ওদের থেকে একটু দূরে প্রথমে আসন তারপর

সুদৃশ্য থালা-বাটি-গেলাসে পর পর সুখাদ্য এসে জড়ো হয়। গুপী-বাঘা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। গুপী দৌড়ে যায় খাবারের দিকে। বাঘা যায় নদীর দিকে।

গুপী বাঘা দা, বাঘা দা !
বাঘা হাতটা ধুয়ে আসি—

৬

গুপী-বাঘাকে পাশাপাশি বসে খেতে দেখা যায়। ওদের পাশে বসে থাকে একটা কুকুর। গুপী একটা হাড় চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করে—

গুপী তুমি দেশে ফিরে যাবে ?

বাঘা একটা হাড় চিবিয়ে রেখে বাটি থেকে আর একটা তুলে মুখে দেয়। খেতে খেতে বলে—

বাঘা দুর্ !
গুপী কেন ?
বাঘা আমার দেশে কেউ নেই।
গুপী বাবা-মা নেই ?
বাঘা বাবা-মা ভাই-বোন জগাই-মাধাই বোনাই-বেয়াই কেউ নাই !
গুপী তবে তো চিন্তার কথা !
বাঘা তুমি কর চিন্তা। আমার চিন্তা নাই—আমি পেট ভরে খাব আর প্রাণ ভরে ঘুরব।
গুপী ওই ছাখো ! তবে ত আমারো তোমার সাথে ঘুরতে হবে—একা তো পায়ে হাঁটতে হবে আর ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে, এক হাতে তো তালি বাজবে না !
বাঘা তুমি আমার সঙ্গে ঘুরতে চাও না ?
গুপী ঘুইরে কি হবে ?
বাঘা গানা বাজনা হবে, নাম-ডাক হবে। রাজকন্যার সাথে বিয়ে হবে

বাঘার খাওয়া হয়ে গেলে হাত ধুতে যায়। গুপী এগিয়ে আসে বাঘার দিকে।

গুপী কার সাথে বে হবে?

বাঘা রাজকন্যা।

গুপী হে হে! কোথায় পাবে রাজকন্যে?

বাঘা বলে দেখ! এতগুলো রাজা, এতগুলো দেশ আর রাজকন্যে নেই?

গুপী তা বটে!

বাঘা তবে একটা দেখে শুনে নিয়ে নিলেই হল।

গুপী দেখে শুনে বেছে নিলেই হল।

গুপী-মুখ ধুতে যায়।

বাঘা (আপন মনে) ভূতের রাজা দিল বর।

গুপী কী হল?

বাঘা থাকব কোথায়? ঘর তো নাই।

গুপী কী ঘর?

বাঘা বলে, কী ঘর? রেতের বেলায় কি গাছতলায় থাকব না কি? আবার যদি বাঘ আসে!

গুপী অ্যাই ছ্যাখো! ঘরের বর চাইলাম না কেন, বল দিকি।

বাঘা চাইব কী? তিনের বেশি বর তো ছিলই না। আমি তখনই বুঝেচি, তিন বর যথেষ্ট নয়!

দূর থেকে ওস্তাদি গানের শব্দ ভেসে আসে। গুপী-বাঘার দৃষ্টি ঘুরে যায় সেই দিকে।

পালকি চেপে ওস্তাদ গাইতে গাইতে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে বাজিয়ের দল এবং অন্যান্যরা মিছিল ক'রে চলেছেন।

মিছিল গুপী-বাঘার সামনে দিয়ে চলে যায়।

বাঘা কোথায় যাচ্ছে গো? কি ব্যাপার বল দেখি?

প্রশ্নটা গুপীকে করেই বাঘা বুঝতে পারে এর উত্তর দিতে পারবে মিছিলের লোকেরাই। বাঘা তাদের পিছনে দৌড়তে শুরু করে।

বাঘা ও দাদা! ও খুড়ো! ও চাচা! কোথায় যাচ্ছ গো?

জনৈক শুণ্ডি।

বাঘা সেখানে কি হবে গো?

জনৈক গানের বাজি হবে।

বাঘা কেন বাজি হবে? বাজি কেন?

জনৈক রাজা মশাইয়ের গান শোনার শখ হয়েছে। যাকে পছন্দ হবে, তারে রেখে দেবে।

গানের মিছিল চলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গুপী-বাঘা।

বাঘা বাপ্‌রে বাপ, কী দাপট!

গুপী জান বাঘাদা, রাজার যে সভা-গায়ক হবে না, তাকে কিন্তু রাজবাড়িতে রেখে দেয়, এটা আমি জানি।

বাঘা জান?

গুপী আমি জানি, ঠিক জানি।

বাঘা জান তো?

গুপী আমি জানি।

বাঘা জান তো? তবে চলো।

গুপী-বাঘা দু'জনেই ভূতের রাজার দেওয়া জুতো পরে।

বাঘা জায়গাটার নাম যেন বলল কী?

গুপী কী বললো বল তো?

বাঘা কী যেন একটা বললো হু – ণ্ডি?

গুপী ঝুণ্ডি! আমি ঠিক শুনেছি ঝুণ্ডি।

বাঘা ঠিক শুনেছ তো? তবে চলো। দাঁড়াও আমি ঢোলটা নিয়ে আসি।

বাঘা ঢোল নিয়ে আসে। গুপী জিজ্ঞেস করে–

গুপী ও বাঘাদা, বাসন কি হবে গো?

বাঘা থাক পড়ে থাক, চাইলেই তো পাবো!

উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো পাশে বসে থাকা কুকুরটাকে খেতে দেখা যায়।

বাঘা এই ব্যাটা, খেয়ে নে, পেট ভরে খেয়ে নে। কুকুরে খায় ভূতের খাবার।

গুপী হে হে!

গুপী-বাঘা পরস্পর হাত তালি দেয়। একসঙ্গে বলে ওঠে–

গুপী-বাঘা ঝুণ্ডি।

সঙ্গে সঙ্গে সাঁই ক'রে দু'জনে উঠে যায় শূন্যে। পরক্ষণেই নেমে আসে বরফের দেশে। বরফের ঢাল দিয়ে তারা গড়িয়ে পড়ে নিচে। সামলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাঘা উরি বাবারে!

গুপী উরি বাবারে! কি শীত! গরম জামা চাওয়া যাক।

দু'জনে মিলে 'গরমের পোশাক' বলে পরস্পর তালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ে গরম-জামা চলে আসে।

বাঘা ঝুণ্ডি?

গুপী অ্যাঁ, তাই তো শুনলাম!

বাঘা তোমার মুণ্ডি।

গুপী তবে কি?

বাঘা ছুণ্ডি। আমি ঠিক শুনেছিলাম।

গুপী তবে চলো, তাই যাওয়া যাক।

গুপী-বাঘা 'ছুণ্ডি' বলে তালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা শূন্যে উঠে যায়। পরক্ষণেই মরুভূমিতে আবির্ভূত হয় দু'জনে। তাদের গায়ে গরমের পোশাক। মরুভূমির গরমে তারা ছটফট করতে থাকে। পোশাক খুলে ফেলার চেষ্টা করে।

গুপী উরি বাবারে! উরি বাবারে!

বাঘা উরি বাবারে! উরি বাবারে! কি গরম!

গুপী ছুণ্ডি ছুণ্ডি! এখানে হবে তোমার গানের বাজি? আমি ঠিক জানি। আমি ঠিক শোনেছি। আমি ঠিক শো—

বাঘা তাই তো শোনলাম।

হঠাৎই গুপী-বাঘার মনে পড়ে যায় দেশটির নাম। 'শুণ্ডি' বলে তারা হাত তালি দিয়ে শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

৭

হাল্লা রাজ্য। মন্ত্রীর ঘর। গুপ্তচর এসে কুর্নিশ করে মন্ত্রীকে। মন্ত্রী তার সিংহাসনে বসে আছে।

গুপ্তচর সেলাম মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী এস গুপ্তচর। খবর কী?

গুপ্তচর আজ্ঞে, আমি শুণ্ডি থেকে আসছি।

মন্ত্রী শুণ্ডিতেই তো পাঠানো হয়েছিল তোমাকে, তাই না?

গুপ্তচর হ্যাঁ, মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী তবে, শুণ্ডি থেকে আসবে না তো বোগদাদ থেকে আসবে?

গুপ্তচর না, মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কেমন দেখলে?

গুপ্তচর আজ্ঞে নেই, মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী নেই?

গুপ্তচর নেই।

মন্ত্রী অস্ত্র-শস্ত্র?

গুপ্তচর নেই।

মন্ত্রী অস্ত্রও নেই?

গুপ্তচর নেই।

মন্ত্রী সৈন্য?

গুপ্তচর সৈন্যও নেই।

মন্ত্রী সৈন্যও নেই?

গুপ্তচর নেই।

মন্ত্রী তবে, ব্যাটারা করে কি? ঘোড়ার ঘাস কাটে?

গুপ্তচর অশ্বও নেই।

মন্ত্রী ঘোড়াও নেই?

গুপ্তচর নেই।

মন্ত্রী হাতি?

গুপ্তচর হাতিও নেই।

মন্ত্রী উট?

গুপ্তচর উটও নেই।

মন্ত্রী নেই, ওটাও নেই!

মন্ত্রী সিংহাসন থেকে উঠে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়। গুপ্তচর মন্ত্রীর পিছনে পিছনে এগিয়ে যায়।

মন্ত্রী হাঃ হাঃ হাঃ! বাঃ বাঃ! চমৎকার, যুদ্ধের কোনো ব্যবস্থা নেই! তবে আছেটা কি, শুনি?

মন্ত্রী দাঁড়িয়ে যায়। গুপ্তচর পিছনে।

গুপ্তচর ক্ষেতে ফসল আছে। গাছে ফল আছে, ফুল আছে। পাখি আছে। দেশে শান্তি আছে, সুখ আছে, হাসি আছে—

৮

গুপী-বাঘাকে দেখা যায় একটা গম ক্ষেতের মধ্যে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে থাকে তারা।

গুপী কী সুন্দর দেশ দেখেছো? কি রকম ফসল হয়েছে! আবার কোথায় যেন বাঁশি বাজছে।

বাঘা একজন চাষীকে দেখতে পেয়ে ডাকে।

বাঘা এই! এই দেশের নাম কি শুণ্ডি?

চাষী ঘাড় নাড়ে।

বাঘা রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার?

চাষী হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয়। চাষী কথা না বলায় গুপী-বাঘা একটু অবাক হয়। দু'জনে হাঁটতে শুরু করে।

গুপী বোবা না কি?
বাঘা হাবা হাবা।
গুপী চলো, যাওয়া যাক!

শুণ্ডির বাজার। গুপী-বাঘা পৌঁছায় বাজারের মধ্যে। বাজারে নানান পসরার দোকান। ওরা দু'জন ঘুরে ঘুরে সব দেখে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এক-জনকে জিজ্ঞেস করে—

বাঘা এখানকার রাজবাড়িটা কোথায় বলতে পার?
গুপী রাজবাড়ি? রাজবাড়ি?

সে লোকটাও বোবা। কিন্তু বাঘার কথা বুঝতে পেরে ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

যায়। মাঠের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়, ওদের দেখতে পেয়ে দু'টো বাচ্চা ছেলে তালি দিতে দিতে এগিয়ে আসে। সঙ্গের লোকটি বাঘাকে ইশারায় জানায়, বাচ্চা দু'টি ঢোলের বাজনা শুনতে চায়।
বাঘা ঢোল বাজায়। তারপর ওরা এগিয়ে যায়। বাচ্চা দু'টি আনন্দে তালি দিতে থাকে।

গুপী-বাঘাকে এবার একটি উঁচু পথের ওপর দেখা যায়। লোকটি দূরে রাজবাড়ি দেখিয়ে দেয়। গুপী-বাঘার চোখে পড়ে রাজবাড়ি।

গুপী বাঃ ?
বাঘা সুন্দর ! আচ্ছা ওখানে বুঝি গানের বাজি হবে ?

বয়স্ক লোকটি থলে থেকে দু'টো আপেল বের ক'রে গুপী-বাঘার দিকে এগিয়ে ধরে।

গুপী না না, আমরা অনেক খেয়েছি। আমাদের পেটে খিদা নাই।
বাঘা আমাদের ট্যাঁকে পয়সা নাই। গরিব তো ! এমনি দিচ্ছো !
গুপী তুমি বড় ভালো লোক।
বাঘা বড় দয়ালু !
গুপী তোমরা কথা বল না বুঝি ! বোবা ?
বাঘা চলো, যাওয়া যাক !

৯

শুণ্ডি রাজার দরবার। গানের আসর বসেছে। সবাই এক এক ক'রে নিজেদের আসন গ্রহণ করে। গুপী-বাঘাকেও সেখানে দেখা যায়।
ওস্তাদেরা যে যার জায়গায় বসে নিজেদের বাজনায় সুর বেঁধে নিচ্ছে। গুপী-বাঘা এসে নিজেদের আসন নিয়ে বসে।
বাদ্যকরের দল নিজেদের বাজনা ঠিক ক'রে নেয়। দেখাদেখি গুপী-বাঘা একবার ঢোলে চাঁটি মেরে দেখে নেয়।

১০

হাল্লার মন্ত্রীর ঘর। জাদুকর বরফি সেই ঘরে প্রবেশ করে। বরফি হাতের যাদু দণ্ডটি নাড়াতে নাড়াতে এবং নাচতে নাচতে এসে মন্ত্রীর সামনে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী তোমার ঐ তিড়িং বিড়িং বন্ধ কর। এখন বসো। কাজের কথা আছে।

বরফি তার হাতের যাদুকাঠিটি ঘুরিয়ে শূন্য থেকে হাজির করে একটি বসার চৌকি। সেটায় বসতে গিয়ে বরফি আসন শুদ্ধ ভেঙে পড়ে। ভাঙা আসনটিকে অদৃশ্য ক'রে আবার নতুন ধরনের বসার আসন উপস্থিত ক'রে সেটায় বসে।

মন্ত্রী তোমার যাদুর যা বহর দেখছি, তা তোমার মেয়াদ কদ্দিন?

বরফি তিন আঙুল দেখায়!

মন্ত্রী তিন বছর?

বরফি ঘাড় নেড়ে 'না' বলে।

মন্ত্রী তিন মাস?

বরফি তখনো 'না' বলে।

মন্ত্রী তিন দিন?

বরফি এবারে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে।

মন্ত্রী ও বাবা, এখন তো আর সময় নেই। যা কিছু এরই মধ্যেই শেষ করতে হবে। শোনো বরফি, শুণ্ডি রাজ্য দখল করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, বুঝেছ?

বরফি মাথা নাড়ে।

মন্ত্রী একেবারে হাতের কাছে পাকা ফলের মতো টসটস করছে। পেড়ে নিলেই হলো। কিন্তু প্রজারা তোমার মতো যদি বোবা হয়, তাহলে সে রাজ্য চালানো যায় কি?

বরফি মাথা নেড়ে 'না' বলে।

মন্ত্রী তারা যা চায়, সেটা যদি না বলে তাহলে তাদের সেটা পাবার পথ বন্ধ করা যায় কি? তোমার বদ্যিগিরি একটু দেখাও দিকি। বেশ কড়া ক'রে একটা ওষুধ তৈরি করো, যাতে এক ধাক্কায় সব ব্যাটারা একসঙ্গে কথা বলে ফেলে।

বরফি মাথা নেড়ে পকেট থেকে ওষুধের ফর্দ বার করে। ফর্দের তালিকায় বোবার ওষুধ দেখতে পায়।

মন্ত্রী পারবে? কালকের মধ্যেই চাই কিন্তু।

বরফি হাসে। মন্ত্রীর মুখেও হাসি দেখা যায়।

মন্ত্রী চলো। এবার রাজামশাইয়ের সঙ্গে ব্যাপারটা সেরে আসা যাক।

১১

হাল্লা রাজার ঘর। মন্ত্রী ও জাদুকর বরফি রাজার ঘরে প্রবেশ করে। রাজাকে সাদা কাগজ কেটে পাখি তৈরি করতে দেখা যায়।

মন্ত্রী পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। তোমাকে যে এবার একটু সিংহাসনে বসতে হবে বাবা।

রাজা কেন?

মন্ত্রী শুধু শুধু বসে বসে খেলা করলে লোকেরা যে ছ্যা ছ্যা করবে, সেটা কি ভালো হবে? আজ বাদে কাল যুদ্ধ্ হবে!

রাজা যুদ্ধ্?

মন্ত্রী হুঁ, খুব বড় যুদ্ধ্! তুমি রাজ্য বাড়াবে বলেছিলে। অস্ত্র-শস্ত্র সব মরচে ধরে যাবে।

রাজা কে যুদ্ধ করবে?

মন্ত্রী এই গ্যাখ, আবার খোকা-খোকা কথা বলে! দু'দিন ভালো ক'রে একটু যুদ্ধ্ ক'রে নাও, তারপর তোমার ছুটি।

রাজা ছুটি!

মন্ত্রী হ্যাঁ। এবার হাঁ কর, খেয়ে ফেলো।

মন্ত্রী রাজাকে ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করে। ওষুধ খাওয়ামাত্র রাজার মুখের

চেহারা বদলে যায়। দৃষ্টিতে আসে ক্রূরতা। রাজা রেগে বাইরে চলে যায়।

হাল্লা রাজার দরবার ঘর। রাজা চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢোকে।

রাজা যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!

১২

শুণ্ডি রাজাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি এসে সিংহাসনে বসেন এবং সবাইকে বসতে বলেন। সবাই যে যার আসন গ্রহণ করে।
রাজা ঘণ্টা বাজান। শুরু হয়ে যায় গানের বাজি। ওস্তাদেরা বিভিন্ন ধরনের গান গেয়ে পর পর শোনাতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর গুপী-বাঘা লক্ষ করে রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন। রাজাকে ঘুমোতে দেখে ওস্তাদ, যিনি গাইছিলেন, তাঁর গান থামান। তাতেও রাজার ঘুম না ভাঙায় বাঘা ঢোলে সজোরে একটা চাঁটি মারে। রাজার ঘুম ভেঙে যায়, জেগে উঠেই তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে গুপী-বাঘা উঠে পড়ে গান ধরে—

গুপী মহারাজা—তোমারে সেলাম!
বাঘা সেলাম! সেলাম!
গুপী মোরা বাংলা দেশের থেকে
এলাম।
বাঘা সেলাম!
গুপী মোরা বাংলা দেশের থেকে
এলাম।
মোরা সাদা সিধা
মাটির মানুষ
দেশে দেশে যাই।
মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন
আর ভাষা জানা নাই।
মহারাজা!
বাঘা রাজামশাই!

রাজা এবং অন্যান্য ওস্তাদেরা অবাক হয়ে গুপী-বাঘার গান শোনে—

গুপী তবে জানা আছে ভাষা অন্য
তোমারে শুনায়ে ধন্য
এসেছি তাহারি জন্য
রাজা—
মহারাজ!
মোরা সেই ভাষাতেই করি গান।
রাজা শোনো ভরে
মন প্রাণ।
এ যে সুরেরই ভাষা,
ছন্দেরই ভাষা—

গুপীর গানে রাজা দুলে ওঠেন। গানের তালে তিনি এপাশ-ওপাশ দুলতে থাকেন।

গুপী এ যে সুরেরই ভাষা,
ছন্দেরই ভাষা,
তালেরই ভাষা,
আনন্দেরই ভাষা।
ভাষা এমন কথা বলে
বোঝেরে সকলে—

অন্যান্য ওস্তাদেরাও গানের তালে দুলতে থাকেন।

গুপী রাজা উঁচা-নীচা,
ছোট-বড় সমান।
মোরা সেই ভাষাতেই
করি গান।
মোরা এই ভাষাতেই
করি গান
করি গান,
মহারাজ—
তোমারে সেলাম!

গান শেষ হলে রাজা প্রায় ছুটে এসে গুপী-বাঘাকে জড়িয়ে ধরেন। অন্যান্য ওস্তাদেরাও তাদের অভিনন্দন জানায়।

১৩

হাল্লা রাজা 'যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!' বলতে বলতে দরবারে ঢোকেন। এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে উঠে বসেন। পাশে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন—

রাজা দূত পাঠানো হয়েছে শুণ্ডিতে, যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে দূত পাঠানো হয়েছে?

মন্ত্রী আজ্ঞে?

রাজা আজ্ঞে! বলি যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে শুণ্ডিতে দূত পাঠানো হয়েছে? যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত?

মন্ত্রী আজ্ঞে ঢেঁড়া পেটাতে বলে দিয়েছি।

সিংহাসনে বসতে বসতে—

রাজা ঢেঁড়া ঢেঁড়া ঢেঁড়া
যত সব মেড়া—

মন্ত্রী তাছাড়া লগ্নের একটা ব্যাপার আছে, খাজনা আদায় আছে, ফস ক'রে তো আর যুদ্ধ করা যায় না!

রাজা ফিস ফিস করছ কেন, কানে বাতাস লাগে জানো না? যা বলবে উচ্চস্বরে বলবে।

মন্ত্রী আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাজা সেনাপতি কোথায়?

মন্ত্রী সেনাপতি! সেনাপতি!

অন্য এক ঘরে বসে খাবার খাচ্ছিল সেনাপতি। খাবার ফেলে ছুটে এসে রাজার সামনে দাঁড়ায়।

রাজা অত মোটা হচ্ছো কেন?

মন্ত্রী ও তো মহারাজা বরাবরই—

রাজা সৈন্যরা তোমাকে মানে?

সেনাপতি ঘাড় নেড়ে জানায় সৈন্যরা তাকে মানে।

মন্ত্রী তা মানে বৈকি মহারাজ, নিশ্চয়ই মানে। নিশ্চয়ই মানে।

রাজা কাল থেকে কুচকাওয়াজ শুরু করবে—কুচকাওয়াজ। আমি ছাদের ওপর থেকে দেখবো। যদি একটু গড়বড় দেখেছি তো তোমার গর্দান—

রাজা আঙুলের ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন গর্দান কাটা যাবে। এরপর হেসে সিংহাসনের পিছনে দেওয়ালে আটকানো ডার্ট-বোর্ডে ডার্ট ছুঁড়ে মারেন।

১৪

গুণ্ডি রাজবাড়ি। গুপী-বাঘাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওদের থাকার ঘরে নিয়ে আসা হয়। ঘরের মধ্যে সুদৃশ্য ফোয়ারা। দাঁড়ে অন্য দেশের পাখি। মধ্যিখানে টেবিল, তার ওপর পাত্রে রাখা নানান ফল।

গুপী ঘরের মধ্যে ফোয়ারা! এ আবার কোন দেশের পাখি গো?
বাঘা মন্দ না, ব্যবস্থা ভালোই। চলবে।
গুপী (পাত্রের ফল দেখে) একটা খেয়ে দেখবে নাকি?
বাঘা দাঁড়াও হাত-মুখটা ধুয়ে নিই।
গুপী তোমার জন্যেও রাখা আছে।

বাঘা ফোয়ারার জলে হাত মুখ ধুয়ে নেয়। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করে—

বাঘা তুমি তামাক সাজতে পারো? যাও তো আলবোলায় বেশ ভালো ক'রে তামাক সেজে নিয়ে এসো।
গুপী তুমি তামুক খাও?
বাঘা হ্যাঁ, সব খাই। (আপন মনে) ভূতের রাজা দিল বর—

বাঘা পাত্রে রাখা একটা কলা ছিঁড়ে নেয়, তারপর বিছানায় আধ শোয়া হয়ে কলাটা খেতে আরম্ভ করে।

গুপী আচ্ছা বাঘাদা—রাজা তো হলো, এখন রাজকন্যা কোত্থেকে আসবে? এ রাজার রাজকন্যা আছে বলে তোমার মনে হয়?
বাঘা থাকলেই কি তোমার সামনে ধেই ধেই ক'রে—

রাজার আসার শব্দ শুনে গুপী-বাঘা তাকায়।

বাঘা সেলাম রাজামশাই।
গুপী সেলাম।
রাজা তোমাদিগকে পাইয়া আমি যে কী পরিমাণ আহ্লাদিত

হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

বাঘা সে কি রাজামশাই, আপনি কথা বলেন ?

গুপী আপনি বোবা নন ?

রাজা তোমরা ভাবিয়াছিলে আমিও আমার প্রজাদিগের ন্যায় মূক। কিন্তু, তাহা নহে। দশ বৎসর পূর্বে আমি একবার সপরিবারে তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়াছিলাম – আমার অবর্তমানে এক অভূতপূর্ব মহামারীর প্রকোপে আমার প্রজারা তাহাদের বাক্‌শক্তি হারায়। আমার সভাগায়কগণও অব্যাহতি পায় নাই।

গুপী ও – তাই বুঝি গানের বাজি হল ?

রাজা তোমার অনুমান নির্ভুল। আমি সংগীতের একান্ত ভক্ত। সংগীত ব্যতীত আমার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব। তোমাদিগের সংগীত আমাকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছে।

রাজার পিছনের দরজা দিয়ে আলবোলা হাতে একজন প্রহরী প্রবেশ করে। গুপী-বাঘা অপ্রস্তুত।

গুপী আমাদেরও খুব ভালো লেগেছে রাজামশাই। আমাদের যে রাজা না, আমাদের গান-বাজনা শুনে দেশ থেকে দূর ক'রে দিয়েছিল !

রাজা ইহাও কী সম্ভব ?

গুপী হ্যাঁ, রাজামশাই। আমরা আগে এতো ভালো গাইতাম না। হলো কি –

বাঘা গলা খুলে গেল – মানে ওর গলা আর আমার হাত।

রাজা ও ! ঈশ্বর যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করেন।

বাঘা আপনার তামাকু এসেছে।

রাজা ও হো ! তাম্রকূট সেবনে আমার অভ্যাস নাই।

বাঘা ও ভুল করেছে। নতুন লোক তো ! এই নিয়া যাও, এখানে কেউ তামুক খায় না। আমরা তামাক খাই না।

১৫

শুণ্ডি রাজার দরবার। গুপী-বাঘা গান শুরু করে।

গুপী ও রাজা
শোনো শোনো শোনো শোনো
শুণ্ডি রাজা শোনো
বাঘা রাজা শোনো –

রাজা মুগ্ধ হয়ে গুপী-বাঘার গান শোনেন।

গুপী মোরা বড় খুশি
ভারি খুশি
বাঘা বেজায় খুশি
গুপী বেজায় খুশি
গুপী-বাঘা তোমার দেশে এসে –
গুপী এ দেশের নাই তুলনা
বাঘা এ দেশের নাই তুলনা
গুপী এ দেশের নাই তুলনা
এ দেশের মাটিতে যে ফলে সোনা।
এ দেশের কত বাহার!
বাঘা কত বাহার।
গুপী কত যে রূপ
কত যে গুণ যায় না গোনা।
ও রাজা! মোরা বড় খুশি হলাম
এমন দেশে, তোমার দেশে,
শুণ্ডি দেশে এসে।
এ দেশের লোকের মুখে
নাইরে ভাষা, নাইরে ভাষা –

গুপীর সেই বৃদ্ধ লোকটিকে মনে পড়ে যায়, যে গুপী-বাঘাকে আপেল খেতে দিয়েছিল। মনে পড়ে যায়, সেই বাচ্চা ছেলে দু'টির আনন্দে তালি দেওয়ার দৃশ্য।

গুপী এ দেশের লোকের মুখে
নাইরে ভাষা।
তারা তাও কাছে এসে
হেসে হেসে জানায় কত
ভালোবাসা।
এদেশের রাজামশাই –

বাঘা সেলাম রাজা!
গুপী এ দেশের রাজামশাই
দেখো তাঁর জাঁক জমকের
নেই কো বালাই।
এ রাজা, সোজা রাজা।
বাঘা সাদা রাজা।

গুপী-বাঘার পিছনে প্রজারা দাঁড়িয়ে থাকে।

গুপী এ রাজা মোদের স্বাখ ঠাঁই দিয়েছে।
যেমনটি চাই, তাই দিয়েছে।
তাই দিয়েছে এমন দেশে—
ও রাজা তাইত বলি, মোরা হেথা
দিব্যি আছি তোমার দেশে
শুণ্ডি দেশে এসে।

হঠাৎ দূতের আগমনে গান থেমে যায়। দূত রাজার দিকে এগিয়ে আসে, তার হাতে চিঠি। সবাই ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করে। দূত কুর্নিশ করে রাজাকে।

দূত আমি হাল্লা থেকে আসছি।
রাজা কী বার্তা আনিয়াছ, কহ।

দূত রাজার দিকে চিঠি বাড়িয়ে দেয়। রাজা দাঁড়িয়ে উঠে চিঠিটা নেন।

দূত আমাদের রাজামশাই এটা পাঠিয়ে দিলেন।

গুপী-বাঘা অবাক হয়ে ঘটনাটা দেখতে থাকে। রাজা চিঠিটা খোলেন এবং চিঠিটা পড়েই 'হা হতোঽস্মি'! বলে মাটিতে পড়ে যান। চিঠিটা রাজার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে দূত হাসে। দূত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চিঠিটা গুপীর হাতে দিয়ে যায়।

১৬

শুণ্ডি রাজপ্রাসাদের ছাদ। রাজা বিষণ্ণভাবে শহরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

চাঁদের আলোয় আবছা-শহর দেখা যায়। হঠাৎ 'রাজামশাই!' ডাক শোনা যায়।

রাজা কে?

গুপী আমরা।

রাজা আইস।

গুপী আচ্ছা, এ যুদ্ধ থামানো যায় না?

রাজা হাল্লার রাজা আমার সহোদর ভ্রাতা। সে ছিল শিশুর মতো সরল। বহুদিন তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই। আজ দেখিতেছি সে আমারই বিরুদ্ধে সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিন দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করিলে সে সসৈন্যে আসিয়া আমার রাজ্য দখল করিবে।

বাঘা আচ্ছা, এ যুদ্ধ থামানো যায় না?

রাজা যুদ্ধ থামানো কি সহজ কথা!

বাঘা ধরুন, আমরা যদি সেখানে যাই?

রাজা কোথায় যাইবে তোমরা?

বাঘা ঐ যে হাল্লা না কী বললেন।

রাজা তোমরা আমায় হাসাইলে।

বাঘা কেন?

রাজা হাল্লার দূরত্ব কত জান? বিশ যোজন! আমার রাজ্যে অশ্বও নাই, উষ্ট্রও নাই। এতখানি পথ পদব্রজে অতিক্রম করা কি সহজ কথা!

গুপী ঘোড়া-টোড়া আমাদের কিচ্ছু লাগবে না রাজামশাই। আমাদের পায়ে—

বাঘা আমরা পায়ে হেঁটে যাব। অভ্যেস আছে তো! একবারটি দিন না যেতে। যদি কিছু না করতে পারি, ফিরে আসবো। আমাদের তো কেউ চেনে না! আসি না একবার ঘুরে!

রাজা তোমরা এমনভাবে অনুরোধ করিলে কি আর সম্মত না হইয়া পারি! তবে, যদি কোনো উপায়ে, কোনো প্রকারে এই যুদ্ধ বন্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগের দুইজনার ভিতর একজনার সহিত আমি আমার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিব।

গুপী কন্যা!

বাঘা রাজকন্যা!

রাজা মণিমালা, আমার চক্ষের মণি! আমার বক্ষের হার!

বাঘা এখনো বিয়ে হয় নি বুঝি?

রাজা তাহার চিন্তায় আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছি।
বাঘা চলি রাজামশাই। কাল সক্কাল সক্কাল আমরা হাল্লা যাত্রা করবো।
গুপী আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমরা হাল্লার রাজাকে ধরে আপনার সামনে হাজির করবো।

১৭

গুপী-বাঘা রাজপ্রাসাদের দেউরি দিয়ে হাঁটছে।

বাঘা আর মাত্র তিনদিন সময় আছে, বুঝেছ? যা করণীয় তা এর মধ্যেই করতে হবে।
গুপী তা তো বুঝলাম। কিন্তু, তালি দেওয়া যায় কোথায় বল তো?
বাঘা চুপ! এগিয়ে চলো। কেউ দেখে ফেলবে।

রাজবাড়ির বারান্দায় রাজকন্যাকে দেখতে পাওয়া যায়। গুপী সেটা প্রথম লক্ষ করে। বাঘাকে ডাকে।

গুপী বাঘাদা।

বাঘা কাছে আসে।

বাঘা রাজকন্যা!
গুপী তুমি ঠিক জানো?

রাজকন্যা চেয়ে থাকে।

বাঘা মণিমালা?
গুপী ঝি-টি নয় তো?
বাঘা ঝি কখনো ফরসা হয়?
গুপী আমাদের দেখছে।
বাঘা সিধা আমার দিকে।
গুপী চইলা গেল।

বাঘা তোমারে দেখছে বোধ হয়! চলো।

১৮

হাল্লা রাজবাড়ির ছাদ। রাজা দুরবিন দিয়ে সামনের মাঠে কুচকাওয়াজ দেখছেন। দূরে মাঠে সৈন্যেরা বসে। প্রত্যেক সৈন্যের পাশে বসে রয়েছে তাদের বাহন উট। একধারে দাঁড়িয়ে সৈন্য-তদারকি করছে সেনাপতি।

সেনাপতি উট উঠো?···উট উঠো?

সৈন্যেরা সেনাপতির কথায় কর্ণপাতই করছে না।

রাজামশাই এসব দেখে বিরক্ত। রাগে পায়চারি করছেন। তাঁর পোশাকের প্রান্তভাগ ধরে, রাজাকে অনুসরণ করছে এক বামন-ভৃত্য। রাজার সঙ্গে মন্ত্রীও উপস্থিত।

রাজা এসব হচ্ছে কী?
মন্ত্রী কুচকাওয়াজ, জাঁহাপনা।
রাজা তোমার মুণ্ডু!

রাজা অন্যদিকে হেঁটে যান। তাঁকে অনুসরণ ক'রে বামন-ভৃত্য ও মন্ত্রীও হেঁটে যায়।

রাজা না হচ্ছে কুচ, না হচ্ছে কাওয়াজ—কিচ্ছু হচ্ছে না। যতসব ফিচকেমো আর ধাপ্পাবাজি! শুণ্ডিতে গিয়ে যখন মুখ থুবড়ে হোঁচট খেয়ে পড়বে, তখন আমার ইজ্জতটা থাকবে কোথায় শুনি! তোমার ঐ উদরের মধ্যে?

রাজা পায়চারি করতে করতে বলতে থাকেন।

রাজা যতসব লড়বড়ে ল্যাকপ্যাকে আর লটখটদের নিয়ে যুদ্ধ করছে—আমি সব ব্যাটাদের গর্দান নেবো—সব ব্যাটাদের।
মন্ত্রী ফস্ ক'রে কিছু ক'রে বসবেন না রাজাধিরাজ। একটু বিবেচনা ক'রে দেখবেন। ধরুন যদি গুপ্তচরের কথা তুচ্ছই হয়, ধরুন যদি শুণ্ডির

সৈন্য থেকেই থাকে, ধরুন যদি যুদ্ধ করতেই হয় –

রাজা ধরুন যদি, ধরুন যদি – আর যুদ্ধ কি গুঁতিয়ে করবে যে গর্দানের প্রয়োজন হবে। গর্দান থাকলেও যা, না থাকলেও তা।

মন্ত্রী হেঃ হেঃ হেঃ –

রাজা হেসো না!

রাজার বকুনিতে মন্ত্রীর হাসি থেমে যায়।

রাজা খাজনা আদায় হচ্ছে, না বকেয়া পড়েছে?

মন্ত্রী না, না, না, না।

রাজা ধাপ্পা দিও না।

মন্ত্রী ধাপ্পা কেন, মহাধিপতি! যারা খাজনা দিচ্ছে না, সব ব্যাটাদের আপনার কাছে ধরে আনতে বলে দিয়েছি – আপনি শুধুমাত্র একটু নরম গরম শুনিয়ে দিলেই সব ব্যাটা সুড় সুড় ক'রে কড়ি বার ক'রে দিয়ে দেবে।

১৯

হাল্লার গ্রামের পথ। পেয়াদা খাজনা না-দেওয়া অপরাধী প্রজাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে চাবুক মারতে মারতে। গুপী-বাঘা দূরে দাঁড়িয়ে দেখে।

গুপী কী ব্যাপার বল তো? কোথায় নে যাচ্ছে এদের?

গুপী-বাঘা লক্ষ করে এক প্রৌঢ় গ্রামবাসী দূরে উট নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

গুপী ও খুড়ো! ও খুড়ো!

গ্রামবাসী ঘুরে তাকায়।

গুপী ওদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে গো?

প্রৌঢ় রাজার বাড়ি। বিচার হবে।

বাঘা কেন? এরা কি ডাকাইত না কি?

প্রৌঢ় না না। খাজনা দেয় নাই। তাই বিচার হবে।

গুপী কেন ? খাজনা দেয় নাই কেন ?

প্রৌঢ় যে রাজা খেতে দেয় না, তারে আবার খাজনা দেবে কী ?

বাঘা বোঝলাম।

গুপী শুণ্ডির রাজা ঠিকই বলেছে। রাজবাড়িটা একবার দেখে এলে কেমন হয় বলতো ?

বাঘা তালি দিয়ে গেলে চলবে না, এমনি যেতে হবে।

২০

হাল্লা দরবার। রাজা বল্লম ছোঁড়া প্র্যাকটিস করছেন। মন্ত্রীকেও সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। রাজা বল্লম নিয়ে প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে গিয়ে খড়ের ডামির পেটে ঢুকিয়ে দেন। রাজা এবার মন্ত্রীকে যেতে বলেন।

রাজা যাও! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছো কী ?

বল্লম নিয়ে মন্ত্রী ডামির দিকে এগোতে থাকে এবং শেষ খোঁচাটি মারে।

গেটের ভেতর দিয়ে কয়েদিদের দল প্রবেশ করে। কয়েদিদের মধ্যে গুপী-বাঘাকে ছদ্মবেশে দেখা যায়।

মন্ত্রী কয়েদিদের দেখিয়ে রাজাকে বলে—

মন্ত্রী যারা খাজনা দেয় নাই তাদের ধরে এনেছে।

রাজা কোথায় ?

মন্ত্রী এই যে।

রাজা জল্লাদ ডাকো।

রাজা এক এক ক'রে কয়েদিদের দেখতে শুরু করেন। কয়েদিরা সব মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। এদের মধ্যে গুপী-বাঘাকেও দেখা যায়।

মন্ত্রী জল্লাদ !

রাজা হাঁক দিতে পার না তো মন্ত্রী হয়েছো কেন ?

মন্ত্রী (আরো জোরে) জল্লাদ !

ডাক শুনে চমকে ওঠে গুপী-বাঘা।

জল্লাদ প্রবেশ করে। তার হাতে খড়্গ।

রাজা সব ব্যাটাদের গর্দান নাও! লে কে টুকরো টুকরো করকে কুত্তাকো খিলা কর খাজনা আদায় কর।

জল্লাদ ও প্রহরী কয়েদিদের বল্লমের খোঁচা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েদিরা ভয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। গুপী-বাঘাও পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। হঠাৎ গুপী গান শুরু করে।

গুপী ওরে বাঘা রে!

সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় রাজা যেমন ছিলেন, সেই অবস্থায় স্থির হয়ে গেছেন। কয়েদিদের দল থেকে গুপী-বাঘা গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে।

গুপী বাঘা রে!

গান শুনে মন্ত্রীও স্থির।

বাঘা ওরে গুপী রে।
গুপী এবার ভেগে পড়ি
চুপি চুপি রে!
বাঘা এবার কেটে পড়ি
সরে পড়ি
ভেগে পড়ি
চুপি চুপি রে!

প্রহরীদের রাজার পোশাক ও মুকুট হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। গুপী-বাঘার পাশে মন্ত্রীকে দেখা যায়।

গুপী দেখে বিচিত্র এই
কাণ্ড কারখানা।
এদের রকম সকম
গিয়েছে জানা।
বাবা রে? বাবা রে?

অবাক চোখে মন্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকেন। গুপী-বাঘা গাইতে গাইতে এগিয়ে আসে।

গুপী দেখে বিচিত্র এই
কাণ্ড কারখানা

এদের রকম সকম
গিয়েছে জানা।
বাবা রে! বাবা রে!

খড়ের ডামির পাশে রাজাকে দেখা যায়।

গুপী শুনে হাল্লা রাজার হাঁকাহাঁকি
উড়ে গেল প্রাণের পাখি –
মুণ্ডু খানা যেতে বাকি
বাঘা মুণ্ডু গেলে খাবো টা কি?
মুণ্ডু ছাড়া বাঁচবো না কি?
গুপী বাবারে? বাবারে?
গুপী-বাঘা বাবারে? বাবারে?
বাঘা চাচারে নিজেরে বাঁচারে এবারে
গুপী চাচারে নিজেরে বাঁচারে এবারে
গুপী-বাঘা পালারে, পালারে, পালারে, পালারে –

গুপী-বাঘা গাইতে গাইতে গেট পেরিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

মন্ত্রীর সম্বিত ফিরে আসে। সে লাফ দিয়ে ওঠে।
রাজা হাতে বল্লম নিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছন থেকে মন্ত্রী এগিয়ে আসে।

মন্ত্রী এই দুই ব্যাটা শয়তান। মহা –

রাজা হাত থেকে বল্লম ফেলে দেয়।

রাজা না! না!
মন্ত্রী মহারাজ?

রাজা পালিয়ে যেতে চায়। মন্ত্রী তাঁকে ধরে ফেলে।

মন্ত্রী সর্বনাশ! চলো বাবা, রাজাবাবু, চলো চলো চলো।

রাজাকে ধরে নিয়ে যায় মন্ত্রী।

২১

একটি নির্জন পুকুরধারে গুপী-বাঘা খেতে বসেছে শ্বেত পাথরের থালা-বাটি সাজিয়ে।

গুপী আমার জানি কেমন কেমন লাগছে ভায়া।

বাঘা কেন?

গুপী আমি যখন গান গাই না, তখন যেন দেখলাম রাজার চোখে জল। ঐ রাজার চোখেও না জল দেখেছি।

বাঘা কিন্তু যখন হুম্বি করল না, বাপরে বাপ যেন রাজা কংস এয়েছে।

গুপী পাশে যেটা ছিল, বুড়োটা?

বাঘা ঐটাই মন্ত্রী।

গুপী ওটা রাক্ষস।

বাঘা রাবণ!

গুপী ওটাকে একটু চোখে চোখে রাখা দরকার।

বাঘা আমিও তাই ভেবেছি। সোজা ঐটার ঘরে গিয়ে হাজির হব। দেখি ব্যাটা কি করে?

গুপী আমাদের যদি দেখে ফেলে?

বাঘা তখন পালিয়ে যাবো। মনে থাকে যেন, আমরা হলাম গিয়ে গুপ্তচর। ওদের ফন্দিটা কি, না জানলে যুদ্ধ থামানো যাবে না।

২২

মন্ত্রীর ঘর। মন্ত্রী ও গুপ্তচরের মধ্যে কথা হচ্ছে। মন্ত্রী সিংহাসনে বসে মাংস খাচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে গুপ্তচর।

মন্ত্রী আজ রাত পর্যন্ত তোমাকে সময় দিলাম। এর মধ্যে তুই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলে ভালো, না পারলে গর্দান যাবে।

গুপ্তচর আর যদি পারি?

মন্ত্রী অমনি বকশিসের লোভ?

গুপ্তচর না মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী অ! মাংস খাবার শখ হয়েছে বুঝি?

গুপ্তচর অনেকদিন খাই নি মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী আচ্ছা তোমরা সব সময় খাই খাই কর কেন বল দিকি? আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে! চারদিকে তোড়জোড় চলেছে, তার মধ্যে আবার দুই ব্যাটা শয়তান কোত্থেকে এসে সব ব্যাগড়া দিতে আরম্ভ করেছে। আগে দুই ব্যাটাকে ধরে নিয়ে এস—তারপর খাবার কথা হবে। যাও!

গুপ্তচর চলে যায়। আসে জাদুকর বরফি।

মন্ত্রী এসো বরফি। বসো।

বরফি এগিয়ে এসে বসে। তারপর পকেট থেকে একটা ছোট কৌটো বার ক'রে অব্যর্থ লক্ষ্যে মন্ত্রীর সামনের টেবিলে ছুঁড়ে দেয়।

মন্ত্রী ওটা কি?

বরফি ইঙ্গিতে মুখের সামনে হাত নিয়ে বুঝিয়ে দেয় বোবার ওষুধ।

মন্ত্রী বোবার ওষুধ!

বরফি ঘাড় নাড়ে। মন্ত্রীর সিংহাসনের পিছনে গুপী-বাঘার আবির্ভাব হয়।

মন্ত্রী এই ওষুধ খেলে গোটা শহরের লোক কথা বলতে পারবে?

বরফি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানায়।

মন্ত্রী এবার তোমার নিজের ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল দিকিনি। এই ওষুধটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে? শুণ্ডিতে আর তুমি তো থাকবে না। যত ব্যাপার আমাকেই করতে হবে।

বরফি লাফিয়ে উঠে পড়ে। অঙ্গ চালনা ক'রে দেখায়।

বরফি গররর্ গররর্ পিস্।
মন্ত্রী এক চিমটে নিতে হবে?
বরফি নিরুগ্‌গ্ গুম্‌ম্ গুশ্‌শ্।
মন্ত্রী মাটিতে ঢালতে হবে?
বরফি কিমুশ্ গুম্‌ম্ গুশ্‌শ্।
মন্ত্রী তাতে অগ্নি সংযোগ করতে হবে।
বরফি উগুশ্‌শ্ ভুশ্‌শ্ মুশ্‌শ্।
মন্ত্রী খুব ধোঁয়ায় ভরে যাবে। সেই ধোঁয়াতে সবাই কথা বলতে পারবে তো!

বরফি অ্যা ! হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ !

মন্ত্রী শোনো বরফি । বসো, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে । দুই ব্যাটা ছোকরা এখানে এসেছে । তাদের গান শুনলে রাজার নেশা ছুটে যাচ্ছে । এমন একটা কড়া ওষুধ তৈরি কর যাতে নেশা আর না ছোটে । সেই ছোকরা দু'টো এখন কোথায় আছে বলতে পারো ?

বরফি লাঠি তুলে মন্ত্রীর দিকে দেখায় ।

মন্ত্রী উত্তর দিকে ?

বরফি ভুশ্‌—

বরফি অন্য দিকে লাঠি তুলে দেখায় ।

মন্ত্রী হাল্লার মধ্যে ?

বরফি ভুশ্‌—

মন্ত্রী নদীর এপারে ?

বরফি ভুশ ভুশ —

বরফি সোজা মন্ত্রীর দিকে লাঠি লক্ষ্য ক'রে দেখায় ।

মন্ত্রী অ্যাঁ, কেল্লার আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছে ?

বরফি গিররর্‌ এ ভুশ্‌ ।

মন্ত্রী এই ঘরের ভেতরে ?

বরফি হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ —

বরফি হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় । মন্ত্রী দাঁড়িয়ে ওঠে । গুপী-বাঘা সিংহাসনের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে ।

মন্ত্রী বরকন্দাজ !

গুপী-বাঘা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে । মন্ত্রী মাংসের হাড় ছুঁড়ে মারে । পরে দৌড়ে ধরতে যায় । গুপী-বাঘা সঙ্গে সঙ্গে গান ধরে ।

গুপী ওরে থাম্‌ !

সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত প্রহরী থেমে যায় ।

গুপী থাম্‌ ! থাম্‌ !

থেমে যায় মন্ত্রীমশাই ।

গুপী থেমে থাক্ !
ও মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রীমশাই
থেমে থাক্ !

গুপী টেবিলে রাখা ওষুধের কৌটোর দিকে এগিয়ে যায়, সেটা তুলে নিজের কাঁধের থলেতে ভরে নেয়। তারপর আবার ফিরে আসে।

গুপী যত চালাকি তোমার
জানতে নাই কো বাকি আর।

মন্ত্রী স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুপী মন্ত্রীর চারধারে ঘুরে গাইতে থাকে।

গুপী যত কার্দানি শয়তানি
সবই ফাঁক।
বাঘা চিচিং ফাক।
গুপী থেমে থাক।

বাঘা ও গুপী মন্ত্রীর জামা খুলে দেয়।

গুপী ও মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্রীমশাই –

মন্ত্রীর জামাটা নিয়ে গুপী-বাঘা বরকন্দাজের গায়ে চাপিয়ে দেয়। মন্ত্রীর দিকে এগিয়ে আসে। মন্ত্রীর ভুরু দু'টো নেড়ে গাইতে থাকে।

গুপী শুধু দেখেছ ঘুঘুটি
তাই এত ভুরকুটি !
পড়লে ফাঁদেতে
চুপসিয়ে যাবে জাঁক

বাঘা ঢোলের কাঠি দিয়ে মন্ত্রীকে খোঁচা মারে।

বাঘা জয় ঢাক !
গুপী ও মন্ত্রীমশাই
থেমে থাক
ও মন্ত্রীমশাই সাবধানে
থেকো ভাই
গা গা মাগা রেসা
বাঘা ধেরে কেটে তাক্

দুই প্রহরীর মাঝখান দিয়ে গুপী-বাঘা বেরিয়ে যায়। মন্ত্রীর ঘোর কেটে যাওয়া-মাত্র গুপী-বাঘার খোঁজে এগিয়ে যায়। ওদের না পেয়ে রেগে ওঠে প্রহরীর ওপর। প্রহরীর গা থেকে নিজের জামাটা খুলে নেয়।

কেল্লার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গুপী-বাঘার খোঁজে সান্ত্রীরা ছোটাছুটি করে।

২৩

পুকুর ধারে বাঘা শুয়ে আছে ওপর দিকে চেয়ে। মুখে হাসি। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা রাজকন্যার কথা ভাবছে।

গুপী ও বাঘাদা!

বাঘার ঘোর কেটে যায়। গম্ভীর হয়ে ওঠে মুখ।

বাঘা কী বল?

গুপী মনসা গাছের কাছে দাঁড়িয়ে।

গুপী এটা কী গাছ বলতো? মনসা নাকি? মন্ত্রীমশাইয়ে যদি এটার ওপর ফেলা যায় না—হেঁ হেঁ!

গুপী এগিয়ে আসে।

গুপী ঘুমোলে না কি? কি করা যায় বলো দেখি?
বাঘা (বিরক্ত হয়ে) ভাবো। ভাবো।
গুপী আজ আর কাল, এই দু'দিন। পরশু তো সৈন্য রওনা দেবে। যা করণের এর মধ্যে করতে হবে, বুঝেছ?
বাঘা জানি। জানি।
গুপী আমাদের কপালে রাজকন্যে-টন্যে নেই, বুঝেছ? ঐ বর পেয়ে যা পাওয়া, সেই পাওয়া।
বাঘা এই সব ছেড়ে কাজের কথা বল তো! রাজকন্যা, রাজকন্যা
গুপী প্যাটে ঘা পড়েছে না—মাথায় আর কিছু খুলছে না।

গুপী-বাঘা পাশাপাশি শুয়ে আছে।

গুপী এমন সরেস ঘি ওরা কোথায় পায় বলো তো ?
বাঘা গরুর ভূতের দুধের সরেস ঘি ।
গুপী ভূতেরাও কি এ খাবার খায় নাকি ?
বাঘা খেলেই হল । মরণ নাই । ব্যারাম নাই ।
গুপী না খেলেও হল, ভূত তো !

২৪

রাত্রি । বরফির ঘর । বরফি ওষুধ তৈরি করছে । মন্ত্রী ঘরে ঢোকে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ।

মন্ত্রী বরফি ! কত দেরি বাবা ? আমার তো দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না ।
বরফি গুরমুশ্‌, গুরমুশ্‌
মন্ত্রী ধৈর্য তো ধরেই আছি বাবা – তবে ভাবনা আমার কি জানো ? সময়মতো নেশা না ছুটলেই সর্বনাশ ! যতক্ষণ সিংহাসনে বসা, ততক্ষণ নেশা । বুঝেছ, নাহলে কারও এদেশে গর্দান থাকবে না । আমার তো নাই, তোমারও না ।

বরফি খ্যাক খ্যাক ক'রে হেসে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে বরফির মাথা বদলে গিয়ে অন্য মাথা হয়ে যায় । পরক্ষণেই নিজের চেহারায় ফিরে আসে ।

মন্ত্রী তোমার মস্করা এখন রাখ বাপু । মস্করার সময় এটা না । অনেক কাজ আছে । রাজাকে শায়েস্তা করতে হবে । তারপর দুই ব্যাটা শয়তান এসেছে, তাদের শায়েস্তা করতে হবে । বুঝছি যা, যাদুবিদ্যায় তারা তোমার চেয়ে কোনো অংশে কম না !

বরফি রেগে গিয়ে আবার নিজের চেহারা বদল ক'রে দেখায় ।

বরফি কর্শ্‌ কার্ফিন রিজিমিশি কিমিক্‌ কিমিশি –

বসে পড়ে বরফি ।

মন্ত্রী আহা, তুমি চটছো কেন ? চটছো কেন ? আমি এমনি বলছি আর কি । ওরা তো তোমার কাছে নস্যি, নস্যি !

বরফি এবার হেসে ওঠে। হাঁড়ি থেকে ওষুধ বার ক'রে দেখায়।

মন্ত্রী বোবার ওষুধ?
বরফি উহুঁ—
মন্ত্রী এত চূর্ণ খাবে কী ক'রে?

বরফি আঙুল দিয়ে নাক দেখায়।

মন্ত্রী নাকে গুঁজে দিতে হবে?
বরফি উঁশ্‌, উঁশ্‌ উঁশ্‌—

২৫

সন্ধ্যা। হাল্লার গুপ্তচরের দল গুপী-বাঘাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঠের একটা উঁচু জায়গা থেকে একদল গুপ্তচরকে নেমে যেতে দেখা যায়। অন্য আর একটি দলকে অন্য জায়গায় দেখা যায়।
গুপী-বাঘা পুকুরের ধারে ঘুমোচ্ছে।
গুপ্তচরের দলকে শহরের কবর-স্থানে খুঁজতে দেখা যায়।
একদল দূর থেকে গুপী-বাঘাকে পুকুর ধারে ঘুমোতে দেখে।
একটা জাল হাতে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে।
অবশেষে জাল দিয়ে তারা গুপী-বাঘাকে ধরে ফেলে।

২৬

হাল্লা রাজসভা। রাজা প্রবেশ করেন।

রাজা শুণ্ডি! শুণ্ডি!

সভাসদদের সামনে দিয়ে রাজা সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যায়। মন্ত্রী রাজার পিছন পিছন যায়।

রাজা শুণ্ডি! শুণ্ডি! শুণ্ডি! শুণ্ডি চলো!

সভাসদরা চমকে ওঠে। রাজা সিংহাসনে দাঁড়িয়ে ওঠেন। পাশে মন্ত্রী—

রাজা এরা যাচ্ছে না কেন?

সভাসদরা হেসে ওঠে।

রাজা সবাই হাসছে কেন?

সভাসদরা আবার হেসে ওঠে।

রাজা এরা হাসছে কেন?
মন্ত্রী আজ্ঞে! এরা ও সৈন্য নয় শাহেন শা!
রাজা তবে কী? তোমার গুষ্টির পিণ্ডি?

রাজা সিংহাসন থেকে তখন নেমে আসেন।

মন্ত্রী এরা সব দেশ-বিদেশ থেকে এসেছেন আপনার সঙ্গে দরবার করতে জাঁহাপনা। আজ মঙ্গলবার।
রাজা মঙ্গলবার!

রাজা দু'ধারের সভাসদদের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যান।

রাজা জল্লাদ ডাকো।
মন্ত্রী জল্লাদ?
রাজা জল্লাদ কো কাম তুম নেহি জানতে হো? জল্লাদ?
মন্ত্রী জানতে তো হয় মহারাজ, কিন্তু কার গর্দান নেবার কথা বলছেন?

সভাসদদের পিছন দিয়ে জল্লাদ এসে দাঁড়ায়।

রাজা আমি এখন গান গাইব।
মন্ত্রী গান? মহারাজ এখন গান গাইবেন।
রাজা গান। আমি যখন গাইতে বলবো সবাইকে, গাইতে হবে। যে না গাইবে তার গর্দান যাবে। বাজনদার!
মন্ত্রী এ কি ওষুধ দিলে বাবা বরফি?

বাজনদার নিচু দরজা দিয়ে প্রবেশ করে।

২৭

গুপী-বাঘাকে দেখা যায় হাল্লার জেলখানায়। তাদের এক পায়ে জুতো।

গুপী একবার শুণ্ডি বলে তালি মেরে দেখবে নাকি ? এক পাটিতে যদি অর্ধেক পথও যাওয়া যায় ?

গুপী-বাঘা দাঁড়িয়ে উঠে 'শুণ্ডি' বলে তালি দেয়। কিছুই হয় না। ওরা আবার বসে পড়ে।
গারদের বাইরে থেকে প্রহরী ওদের লক্ষ করে।

গুপী গান গেয়ে দেখবো, বাঘাদা ?
বাঘা কি হবে ? কচুপোড়া হবে। চাবি তো নাগালের বাইরে।

গুপী-বাঘা উঠে দরজার কাছে আসে, বন্ধ তালা লক্ষ করে।

বাঘা ঐ ত্যাখো।

জেলখানার দরজার বিরাট আকার তালা ধরে বাঘা গুপীকে দেখায়।

বাঘা ঐ ত্যাখো, ঐ হল চাবি, আর এই হল তালা। এখন করো কি করবে ?

২৮

হাল্লা রাজার দরবার।

দু-ধারে সভাসদরা দাঁড়িয়ে আছে। মন্ত্রীও উপস্থিত। রাজার ইচ্ছে হয়েছে গান গাইবেন। বাজনদারও উপস্থিত।

রাজা বাজাও!

বাজনদার বাজনা শুরু করে।
রাজা গান শুরু করেন।

রাজা আছো হেথা যত
আমির ও ওমরা।

মন্ত্রী নাচতে নাচতে পিছিয়ে যায়। রাজা তাকে দেখতে পায়।

রাজা গাইছ না কেন ?

মন্ত্রী চমকে এগিয়ে এসে রাজার সঙ্গে গান গাইতে শুরু করে।

মন্ত্রী আছো হেথা যত
আমির ও ওমরা।
রাজা আর যত ব্যাটা
হোমরা চোমরা
মন্ত্রী আর যত হুঁ হুঁ
হোমরা চোমরা।
রাজা বার্তা ভীষণ,
শোনো হে তোমরা
মন্ত্রী শোনো হে, শোনো হে,
শোনো হে তোমরা।
রাজা হাল্লা চলেছে যুদ্ধে।
মন্ত্রী হাল্লা চলেছে যুদ্ধে !

রাজা চিৎকার ক'রে ওঠে

রাজা গাও !

সভাসদরা একসঙ্গে গেয়ে ওঠে।

সভাসদরা হাল্লা চলেছে যুদ্ধে !
হাল্লা চলেছে যুদ্ধে !
হাল্লা–হাল্লা–হাল্লা !
মহারাজা হাল্লা !
নবাব হাল্লা !
ভালো রাজা হাল্লা !
চীনা রাজা হাল্লা !

রাজা এগিয়ে এসে সভাসদদের লক্ষ ক'রে গান। মন্ত্রী তাঁর পিছন পিছন চলে।

রাজা গুণ্ডির দেবো পিণ্ডি চট্‌কে।
মন্ত্রী গুণ্ডির দিও পিণ্ডি চট্‌কে।
রাজা শত্রু নাশিব স্কন্ধ মট্‌কে !

রাজা একজন সভাসদের গলা টিপে ধরেন।

মন্ত্রী শত্রু নাশিও স্কন্ধ মট্‌কে।
রাজা নিস্তারও নাহি কাহারও সট্‌কে
মন্ত্রী নিস্তারও নাহি
আমারও সট্‌কে।
রাজা হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
সভাসদগণ হাল্লা চলেছে যুদ্ধে!
সাহেব যুদ্ধে!
নবাব যুদ্ধে!
রাজা যুদ্ধে!
পোর্তুগীজ সাহেব যুদ্ধে!
আদিবাসী রাজা যুদ্ধে!
মহারাজা যুদ্ধে!
বাদশা যুদ্ধে!

অনেকেই উচ্চারণ করতে বেশ কষ্ট পায়। তবুও তারা বলে যায়।

২৯

হাল্লার জেলখানা। গুপী-বাঘা একদৃষ্টে প্রহরীকে দেখছে।

বাঘা একটুও কি দয়া মায়া নাই তোমার মনে?
গুপী আমাদের দশা দেখেও কি বুঝতে পার না?
বাঘা শোকের পর শোক! আঘাতের পর আঘাত!

প্রহরী একদৃষ্টে গুপী-বাঘার দিকে তাকিয়ে থাকে।

গুপী অদৃষ্টের কী পরিহাস!
বাঘা ঢোল গেল, জুতা গেল, রাজকন্যা গেল—ও!
গুপী কি ফরসা!
বাঘা কি ফরসা-বুক ফেটে যায়, ও হো!

প্রহরী বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

বাঘা জানোয়ার!
গুপী ভূত!
বাঘা পাজি!
গুপী শয়তান!

প্রহরী তাকিয়ে থাকে।

বাঘা গাধা!
গুপী গরু!
বাঘা শুয়োর!
গুপী ছু—!

প্রহরী হাত দিয়ে দেখায়—গর্দান নেবে। গুপী-বাঘার কথা থেমে যায়।

বাঘা গর্দান নেবে—
গুপী গর্দান!

৩০

হাল্লা রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ ও নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত। রাজা নাচ আরম্ভ করেন।

রাজা ধিন্ তাক্। ধিন্ তাক্। ধিন্ তাক্।

রাজার সঙ্গে সবাইকে নাচতে দেখা যায়। মন্ত্রীও সেই দলে আছে।

রাজা জল্লাদ!

খড়্গ হাতে জল্লাদ এসেও নাচতে আরম্ভ করে।
মন্ত্রী পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

রাজা এই উজিরকে বাচ্চে!

মন্ত্রী থমকে থেমে যায়। রাজা সবাইকে ঘিরে নাচতে থাকে।

রাজা নাচো!

৩১

জেলখানায় গুপী-বাঘা।

গুপী তোমরা কয়েদিদের খেতে দাও না ?
বাঘা কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নাই।

প্রহরী চুপ ক'রে বসে আছে। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

গুপী একটু ঘুরে বস না। আমরা চারটি খেয়ে নিই। এরা না খাইয়ে মারবে, তারপর গর্দান নেবে।
বাঘা উঃ! কি শয়তান!

রাজসভা। রাত্রি। সবাই নেচে চলেছে।

মন্ত্রী বরফি! বরফি! কি ওষুধ দিলে বাবা বরফি ?

সবাই বিভোর হয়ে নাচে।

৩২

জেলখানা। রাত্রি। গুপী-বাঘা গান শুরু করে। প্রহরী চুপচাপ বসে আছে। গুপী বেশ মৃদু গলায় গান গায়। বাঘা তাকে সঙ্গ দেয়।

গুপী এক যে ছিল রাজা –
বাঘা [বাঃ! এই ভাবেই গাও। চেঁচায়ও না।]
গুপী এক যে ছিল রাজা –
তার ভারি দুখ্।
বাঘা [রাজার বড় দুঃখ হে
আমিও বুঝেছি।]
গুপী ছাখো রাজা, কাঁদে রাজা, আহা রাজা,
বেচারা রাজার ভারি দুখ্!
বাঘা [বাঃ! বড় ভালো বেঁধেছো তো গানখানা!]
গুপী দুঃখ কিসে হয় ?

বাঘা [কিসে হয় বল তো ?]
গুপী অভাগার অভাবে জেনো
শুধু নয়।

রাজার বাড়ির বাইরেটা দেখা যায়। একই সঙ্গে গান শোন যায়।

গুপী যার ভাণ্ডারে রাশি রাশি
সোনা দানা ঠাসা ঠাসি
তারও ভয়।
বাঘা [তারই বেশি ভয় !]

রাজসভায় নাচ বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝা যায় রাজসভা থেকেও গুপী-বাঘার গান শোনা গেছে। গুপীর গান ভেসে আসে।

গুপী জেনো সেও সুখী নয়
সুখী নয়।

জেলখানা।

বাঘা [ডাকাতের ভয় তো,রেতে ঘুম নাই !]
গুপী দুঃখ যাবে কী ?
দুঃখ যাবে কী ?
বিরস বদনে রাজা ভাবে কী ?
বলি যারে তারে
দিয়ে শাস্তি
রাজা কখনো শোয়াস্তি পাবে কী ?
দুঃখ যাবে কী ?
বাঘা [এই গান শুনলে পরে রাজা আমাদের ছেড়ে দিত হে !]
গুপী দুঃখ কিসে যায় ?
দুঃখ কিসে যায় ?

রাজপ্রাসাদ দেখা যায়। গান শোনা যায়।

গুপী প্রাসাদেতে বন্দী রওয়া
বড় দায়।

একবার ত্যাজিয়া সোনার গদি
রাজা মাঠে নেমে যদি
হাওয়া খায় !

রাজসভা। রাজার মুখ বিষন্ন। গান শোনা যায়।

গুপী তবে রাজা শান্তি পায়।
রাজা শান্তি পায়
শান্তি পায়।

৩৩

রাজসভা। গান শেষ হওয়া মাত্র রাজার সম্বিত ফিরে আসে। মন্ত্রী এগিয়ে গিয়ে রাজাকে ধরে।

রাজা আমার কি ছুটি হবে না ?
মন্ত্রী হ্যাঁ বাবা, হবে বই কি ! আগে যুদ্ধটা ক'রে নাও—তারপর ছুটি।

জেলখানা। গুপী-বাঘা বসে আছে।
গরাদের ফাঁক দিয়ে দু'টো বাটি ওদের দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়।

বাঘা কে খাবে গো ?

গুপী-বাঘা বসে আছে।

গুপী পোষা ইঁদুর-টিঁদুর আছে নাকি তোমাদের ?

গুপী হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। বাটিটা একবার শুঁকে রেখে দেয়। দূরে সিঁড়ি দিয়ে মন্ত্রীকে জেলখানার দিকে আসতে দেখা যায়।
প্রহরী দাঁড়িয়ে ওঠে।

মন্ত্রী সব শয়তানি বার করছি।

প্রহরী জেলখানার তালা খুলে দেয়। মন্ত্রী প্রবেশ করে। গুপী-বাঘা সজাগ হয়।

মন্ত্রী হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ !

প্রহরী হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ!
মন্ত্রী ভালো তো বাবাজীরা!
প্রহরী উঁ!
মন্ত্রী আঃ! রাজা মশাইয়ের জন্য বড্ড দরদ, না বড্ড দরদ?

মন্ত্রী গুপীর থুতনিটা নেড়ে দেয়।

মন্ত্রী বলি গর্দানটা গেলে, গানটা কোত্থেকে বেরুবে শুনি?

মন্ত্রী সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী বলি, তোমাদের জন্যে খাবার দিয়ে গেছে, খাও নি কেন? হ্যাঁ?
গুপী আমাদের খিদে নাই, মন্ত্রীমশাই।
মন্ত্রী খিদে নাই, না খাবার পছন্দ হয় নাই, হ্যাঁ?
বাঘা খিদা নাই।
মন্ত্রী খিদা নাই। কিন্তু তোমাদের যে এই খাবারই খেতে হবে।
গুপী-বাঘা খেতেই হবে?
মন্ত্রী আলবাৎ খেতে হবে, খাও!
প্রহরী উঁ!

গুপী-বাঘা থালা দু'টোর দিকে এগিয়ে যায়।

মন্ত্রী তোলো, এগুলো তোলো! রাজ্যি শুদ্ধু লোক এ খাবার খাচ্ছে, আর এনারা কোথাকার নবাব বাদশা এলেন! তোলো—তোলো!
প্রহরী উঁ!

গুপী-বাঘা খাবার খেতে বসে। খাবার আগে বাঘার হাত ধোওয়া অভ্যেস।

বাঘা একটু জল। হাতটা—
মন্ত্রী কী?
বাঘা না, কিছু না।
মন্ত্রী শুনে রাখ, এইবার তোমাদের রেহাই দিলাম। এরপর যদি আমার হুকুম ছাড়া আবার কখনো গান শুনি, তবে সেই গান হবে তোমাদের শেষ গাওয়া। বুঝেছ?

মন্ত্রী বেরিয়ে যায় জেলখানা থেকে।

গুপী-বাঘা খেতে আরম্ভ করে।

৩৪

গুপ্তি রাজার দরবার। রাজা একা বসে আছেন। নায়েব মশাই প্রবেশ ক'রে রাজার হাতে একটি চিঠি তুলে দেন।

রাজা কিছু বলিবে?

রাজা চিঠিখানি নিয়ে খুলে দেখে। চিঠিতে লেখা আছে, 'দূত প্রেরণ করিব কি?'

রাজা উহারা দুইজনে গেল। আমি কিছুতেই আশা ছাড়িতে পারিতেছি না।

৩৫

জেলখানা। গুপী-বাঘা প্রচুর খাবার নিয়ে খেতে বসেছে। প্রহরী ঘুমোচ্ছে।

গুপী কুম্ভকর্ণ?

প্রহরী ঘুমোচ্ছে। ঘুমোতে ঘুমোতেই হাত দিয়ে মশা মারে। গুপী-বাঘা আওয়াজ শুনে তাকায়।

প্রহরীর নাকে খাবারের গন্ধ লাগে। চোখ মেলতেই গুপী-বাঘাকে খেতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। গুপী-বাঘার পিছনে গরাদ ধরে নাড়তে থাকে।

প্রহরী এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ!
বাঘা এটা কি জিজ্ঞেস করছো?

বাঘা বাটি থেকে এক একটা খাদ্য সামগ্রী তুলে বলতে থাকে –

বাঘা এটা হল মাংস। এটা হল পোনা মাছ! এটা হল ইলিশ মাছ!
গুপী এটা পটলের দোরমা
প্রহরী আ আ আ –
বাঘা তুমি খাবে?

প্রহরী এঁ্যা—
গুপী তোমার হজম হবে না।
বাঘা অভ্যেস নাই তো!
প্রহরী এঁ্যা এঁ্যা—

প্রহরী গরাদ ধরে লাফাতে আরম্ভ করে।

বাঘা তা বেশ! ভেতরে এসো।

প্রহরী দরজা খুলে ভেতরে এসে খেতে আরম্ভ করে। গুপী-বাঘা পালিয়ে যায়।

৩৬

যুদ্ধক্ষেত্র। হাল্লা-সেনাপতি তদারক করছে।
দুর্গের বাইরে গুপী-বাঘা ছুটছে জুতো আর ঢোলের সন্ধানে।

গুপী আগে ঢোল আর জুতা।

দুর্গের অন্য দিক। গুপী-বাঘা লাফিয়ে ছুটে যায়।

দুর্গের একদিকে শিঙা বাজানো হচ্ছে।

যুদ্ধক্ষেত্র। সেনাপতি সৈন্যদের আদেশ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো সৈন্যই তার কথা শুনছে না।
সেনাপতি হাতের ইশারায় সৈন্যদের উঠতে বলছে, কিন্তু সৈন্যরা বসেই থাকে।

হাল্লা-মন্ত্রীর ঘর। বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করে। মন্ত্রী পোশাক পরছিল। ঘুরে তাকায়।

সেনাপতি সর্বনাশ হয়ে গেছে মন্ত্রীমশাই!
মন্ত্রী মানে?
সেনাপতি সৈন্যরা কোনো কথা শুনছে না।
মন্ত্রী কথা শুনছে না?
সেনাপতি হুকুম মানছে না। উঠতে বললে উঠছে না। সব হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে।

মন্ত্রী সর্বনাশ হয়েছে! এই ভয়টাই করছিলাম।
সেনাপতি একটা কথা বলবো, মন্ত্রীমশাই?
মন্ত্রী কী?
সেনাপতি সৈন্য কি না পাঠালেই নয়?
মন্ত্রী এ্যাঁ?
সেনাপতি যুদ্ধের কি খুব প্রয়োজন আছে?
মন্ত্রী উঃ! বাপরে বাপরে বাপরে বাপরে বাপ! তোমাকে কি বেশি খেতে দিয়ে বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পাইয়ে দিলাম! বলি একটা রাজ্য দখল করতে যাওয়া হচ্ছে আর সৈন্য যাবে না? যাবো তুমি আমি আর রাজামশাই! শুণ্ডিরাজা এসে আমাদের হাতে রাজ্য তুলে দেবে?
সেনাপতি কিন্তু আমি—

বরফিকে গান গাইতে গাইতে আসতে দেখা যায়। মন্ত্রী দরজার দিকে লক্ষ করে। বরফি এসে দাঁড়ায়।

মন্ত্রী তুমিই একমাত্র ভরসা বরফি। তোমার শেষ খেল একটু দেখিয়ে দাও। সৈন্যরা কেউ যুদ্ধে যাচ্ছে না। তাদের একটু চালান ক'রে দাও, নইলে মান-ইজ্জত, শুণ্ডি সব গেল।

বরফি যাদু-লাঠি ঘুরিয়ে প্রহরী ও সেনাপতিকে নাচায়। মন্ত্রী বিস্ফারিত চোখে ছাখে। মন্ত্রী লাফিয়ে ওঠে।

মন্ত্রী পারবে তুমি? শুণ্ডির দেবো পিণ্ডি চটকে! শুণ্ডির দেবো পিণ্ডি চটকে! সেনাপতি তুমি যাও, বরফি আসছে।

সেনাপতি চলে যায়।

মন্ত্রী রাজার ওষুধ?
বরফি গুররর্ ওঁশ।
মন্ত্রী তবে চলো, রাজকর্মটা সারি।

৩৭

হাল্লারাজার ঘর। মন্ত্রী ও বরফি ঢোকে। বরফি গান গাইছে।

মন্ত্রী শুণ্ডি চলো রাজামশাই, শুণ্ডি চলো।

রাজা কেন?

মন্ত্রী এ আবার কী কথা? সে কী, কাল যে বললে যুদ্ধ করবে, শুণ্ডির পিণ্ডি চটকাবে!

রাজা না—শুণ্ডিতে আমার ভাই আছে। আমার মনে পড়েছে।

মন্ত্রী ও বরফি পরস্পরের দিকে তাকায়।

রাজা একজন দস্যু—আমায়—

মন্ত্রী আমি—

রাজা আমি যুদ্ধ করবো না। আমি ওষুধ খাবো না।

রাজা নিমেষের মধ্যে দু'জনের মাঝখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

মন্ত্রী বরফি?

বরফি খামোশ!

রাজা পিছন দৌড়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

মন্ত্রী একি, মরে গেল না কি?

বরফি মিরুশতি।

মন্ত্রী ক'দিন ঘুমোবে?

বরফি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

মন্ত্রী তিন দিন?

বরফি ওঁশ।

মন্ত্রী এর মধ্যে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ সেরে ফেলতে পারবো, বাঃ বাঃ! বরফি এবার শেষ কাজটা সেরে নাও। যাও।

রাজাকে ঘুমোতে দেখা যায়। বরফি গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে যায়।

মন্ত্রী রাজাবাবু! তোমার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল।

যুদ্ধক্ষেত্র। সৈন্যরা সব বসে আছে। সেনাপতি তদারক করছে।
দূরে পাহাড়ের উপর বরফিকে আসতে দেখা যায়।
সৈন্যরা তেমনই বসে আছে।
বরফি এসে লাঠি ঘুরিয়ে সৈন্যদের দিকে তাক করে। অমনি সৈন্যরা উঠতে শুরু করে। বরফি অদৃশ্য হয়ে যায়। সৈন্যরা সব সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে শুরু করে। দামামা আর শিঙা বেজে ওঠে।

সেনাপতি গুণ্ডি চলো!

সৈন্যরা এগোতে শুরু করে।

পুকুর ধারে গুপী-বাঘা দৌড়ে আসে। ওদের জুতো আর ঢোল পড়ে থাকতে দেখা যায়।

বাঘা আছে আছে।

গুপী জুতো হু'টো তুলে নিয়ে একটা বাঘার দিকে এগিয়ে দেয়।

গুপী এই যে, এই নাও তোমারটা।

গুপী-বাঘাকে দেখা যায়। ঢোল নিয়ে তারা সৈন্যদের কাছাকাছি এসে পড়ে। তারা গাইতে শুরু করে। বাঘার ঢোলের র‍্যালার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা দাঁড়িয়ে যায়।

গুপী ওরে বাবা দেখ চেয়ে
কত সেনা চলেছে সমরে!

গুপী-বাঘা গাইতে গাইতে সৈন্যদের সামনে এগিয়ে আসে।

গুপী ওরে বাবা দেখ চেয়ে
কত সেনা চলেছে সমরে!
কত সেনা! কত সেনা!
হাজারে হাজারে
হাতিয়ার বুঝি
কাটাকুটি করে!

সৈন্যরা উটের ওপর নিথর হয়ে বসে আছে।

গুপী কাটাকুটি কাটাকুটি
হাজারে হাজারে
হাতিয়ার বুঝি
কাটাকুটি করে
আহা রে, আহা রে!
আহা রে!
পেটে খেলে পিঠে সয়
এ ত কভু মিছে নয়—

সেনাপতি আর মন্ত্রীকে দেখা যায়।

গুপী পেটে খেলে পিঠে সয়
এ ত কভু মিছে নয়
সেনা দেখে লাগে ভয়
লাগে ভয়—

সেনাদের দেখা যায়।

গুপী লাগে ভয়!
আধ পেটা খেয়ে
বুঝি মরে! মরে।
যত ব্যাটা চলেছে সমরে—

গুপী-বাঘার সামনে সৈন্যদের দেখা যায়।

গুপী যত ব্যাটা চলেছে সমরে।
ওরে হাল্লা রাজার সেনা
তোরা যুদ্ধ ক'রে করবি
কি তা বল—
মিছে অস্ত্র শস্ত্র ধরে
প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে,

সৈন্যরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গুপী-বাঘা গান গাইতে গাইতে ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

গুপী মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে

প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে।
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে
দ্বন্দ্বে অমঙ্গল,
ওরে রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে
দ্বন্দ্বে অমঙ্গল—
তোরা যুদ্ধ ক'রে করবি কি তা বল!

হাল্লা রাজার ঘর।

রাজার ঘর থেকে গান শোনা যায়।

সৈন্যরা দাঁড়িয়ে আছে।

গুপী রাজা করেন তম্বি তম্বা
মন্ত্রীমশাই কিসে কম বা?
প্রজা পেয়ে অষ্টরম্ভা
হল হীনবল—
ওরে প্রজা পেয়ে অষ্টরম্ভা
হল হীনবল
তোরা যুদ্ধ ক'রে করবি
কি তা বল!
আয় আয় আয় রে আয়!
আয় রে আয়! আয় রে আয়!
আয় রে বোঝাই হাঁড়ি হাঁড়ি
মণ্ডা মিঠাই কাঁড়ি কাঁড়ি, আয়!
মিহিদানা পুলি পিঠে
জিবেগজা মিঠে মিঠে
আছে যত সেরা মিষ্টি
আছে যত এল মিষ্টি
এল বৃষ্টি এল বৃষ্টি
ওরে—

আকাশ থেকে হাঁড়ি নেমে আসতে দেখা যায়।

সৈন্যরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখে।
সেনাপতিও আকাশের দিকে দেখে।

দুর্গের রাজাপ্রাসাদের বাইরে। রাজা ছুটে আসেন।

রাজা ছুটি! ছুটি! ছুটি!

রাজা অন্য রাস্তা দিয়ে ছুটে আসেন।

রাজা ছুটি! ছুটি! ছুটি!

দুর্গের সদর দরজা দিয়ে রাজা ছুটে বেরিয়ে আসে।

রাজা ছুটি! ছুটি! ছুটি!

যুদ্ধক্ষেত্র। সৈন্যরা 'মিঠাই, মিঠাই' ক'রে ছুটছে।
মাটিতে হাঁড়িগুলো একে একে নেমে আসে।

সৈন্য মিঠাই!
মন্ত্রী সেনাপতি!

উট থেকে নেমে সৈন্যরা ছুটে যায়।
সেনাপতি হতভম্ব।
মন্ত্রীর সম্বিত ফিরে আসে।
সৈন্যরা হাঁড়ির দিকে ছুটে যায়।
হাঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সৈন্যরা।
মন্ত্রী ভিড়ের মধ্যে পড়ে আছে। তার ওপর দিয়ে সৈন্য ছুটে যায়।
গুপী-বাঘা হাঁড়ি নিয়ে ছুটে যায়। পিছনে সৈন্যদের ছোটাছুটি করতে দেখা যায়।
রাজা বাইরের মাঠে ছুটে আসেন।

রাজা ছুটি! ছুটি!

মন্ত্রী একটা হাঁড়ি কোনোক্রমে ধরে ফেলে, হামাগুড়ি দিয়ে পাশে সরে আসতে চায়।

সৈন্যরা হাঁড়ি নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে।
মন্ত্রীর হাঁড়ি সৈন্যদের পায়ের চাপে ভেঙে যায়।
রাজা দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে আসেন।

গুপী-বাঘা রাজার দিকে এগিয়ে এসে তাঁর হাতে মিষ্টির হাঁড়িটা তুলে দেয়। রাজা মিষ্টি হাতে নিয়ে মুখে পোরেন।

গুপী-বাঘা পরস্পরের দিকে তাকায়। বাঘা রাজার বাঁদিকে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। রাজাকে জড়িয়ে ধরে গুপী-বাঘা 'শুণ্ডি' বলে তালি মারে। সঙ্গে সঙ্গেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

৩৯

শুণ্ডি রাজার দরবার। রাজা বিষণ্ণভাবে সিংহাসনে বসে আছেন। হাল্লার রাজাকে নিয়ে গুপী-বাঘার আর্বিভাব হয়।

বাঘা ধরে এনেছি রাজামশাই, হাল্লার রাজা।

শুণ্ডি-রাজা অবাক হয়ে দেখেন, তারপর উঠে দাঁড়ান। হাল্লার রাজা আপনমনে মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎই তাঁর দৃষ্টি পড়ে শুণ্ডি রাজার দিকে। তাঁর হাত থেকে মিষ্টির হাঁড়ি পড়ে ভেঙে যায়। দু'জনেই অবাক চোখে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। হাল্লা রাজা মাথা চুলকোয়।

শুণ্ডি রাজা ভাই রে! তুই বদলাস নি!

দুই রাজা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন।

হাল্লা রাজা ভাই রে!

বাঘা গুপীর হাত ধরে।

শুণ্ডি রাজা তুই হাল্লার রাজা? তুই বেঁচে আছিস?

হাল্লা রাজা আর বলিস না, সেই দস্যু ব্যাটা আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে যাদুকরকে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে আমাকে দিয়ে কি না করিয়েছে!

শুণ্ডি রাজা শুণ্ডির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত!

হাল্লা রাজা আরে সে এক জঘন্য ব্যাপার।

শুণ্ডি রাজা তোকে যে কোনোদিন ফিরে পাব, এ আমি ভাবতেই পারি নি।

হাল্লা-রাজা আমিও কি কোনোদিন এই বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি পাব—

শুণ্ডি শহরের কোনো এক জায়গায় গুপী-বাঘা আগুনে ওষুধ-পাউডার ঢেলে দেয়।

শুণ্ডি রাজার ঘর। শুণ্ডি ও হাল্লার রাজা পাশাপাশি বসে আছেন।

হাল্লা রাজা কত বছর হবে বল তো?

শুণ্ডি রাজা তা বছর কুড়ি তো বটেই!

পিছনের দরজা দিয়ে গুপী-বাঘা প্রবেশ করে।

হাল্লা রাজা ভাবতে পারিস, আমি আসছিলাম তোর রাজ্য দখল করতে!

শুণ্ডি রাজা আমার রাজ্য মানে, এ তো তোরও রাজ্য!

গুপী-বাঘা রাজাদের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বাঘা রাজামশাই! রাজকন্যার ব্যাপারটা সেরে ফেললে হয় না!

রাজা ও!

গুপী বাঘা ঐ যে আপনি বললেন।

বাঘা রাজকন্যা! রাজকন্যা!

রাজা উঠে দাঁড়ান।

শুণ্ডি রাজা এই ছ্যাখো, আমি তোমাদের কথা ভুলিতেই বসিয়াছিলাম। এই, কে আছো, একবার মণিমালাকে লইয়া আসো তো।

কর্মচারী আজ্ঞা বহন করতে চলে যায়।

শুণ্ডি রাজা তা বাবা গোপীনাথ, তোমার অমত নাই তো?

বাঘা মানে? গোপীনাথ?

শুণ্ডি রাজা হ্যাঁ, মানে আমি তো উহার কথাই চিন্তা করিয়াছিলাম। কারণ, আমার কন্যা দীর্ঘাঙ্গী। তাই—

[৬]

বাঘা এ আপনি কী বল্লেন, রাজামশাই ? গোপীনাথের মাথায় তো রাজকন্যার চিন্তা আসেই নাই। এ চিন্তা তো আমার ! এ আমার অনেক দিনের সাধ। ছেলেবেলার সাধ।

শুণ্ডি রাজা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না, কন্যা তো আমার একটি বই দুইটি নাই !

বাঘা ঠিক আছে, তাহলে সে কন্যা আমারে দেন। আমি ওর চাইতে কম কিসে ?

গুপী নিজের সঙ্গে বাঘার উচ্চতার তফাত দেখিয়ে বলে—

গুপী অ্যাই এতটা।

বাঘা তুমি চুপ কর। তোমার বড় বাড় বেড়েছে।

হাল্লা রাজা রাজকন্যা কি কম পড়িতেছে ? রাজকন্যা ? কম পড়িতেছে ?

শুণ্ডি রাজা হ্যাঁ, আমার তো শুধু মণিমালাই আছে !

হাল্লা রাজা আর আমার মুক্তামালা।

বাঘা মুক্তমালা ?

শুণ্ডি রাজা মুক্তমালা ?

হাল্লা রাজা আমার একমাত্র কন্যা।

বাঘা সে কোথায় ?

হাল্লা রাজা হাল্লায়।

বাঘা চলো গোপীনাথ। আসুন হাল্লা-রাজ।

শুণ্ডিরাজা হতভম্ব।

শুণ্ডি রাজবাড়ির ছাদ। রাজা বারান্দায় এসে দাঁড়ান।

শুণ্ডি শহরের উপর সাদা ধোঁয়া। শহরের লোকেরা চিৎকার করছে।

শুণ্ডি রাজা এ কাহাদের কণ্ঠস্বর ? একি আমার প্রজাদের কণ্ঠস্বর ? কী আনন্দ ! কী আনন্দ !

শুণ্ডি রাজসভা। রাজা ছুটে আসেন। ইতিমধ্যে মণিমালাকে সঙ্গে নিয়ে কর্মচারী রাজসভায় উপস্থিত।

শুণ্ডি রাজা কী আনন্দ! কী আনন্দ মণি মা! আজ কি আনন্দের দিন, আমার প্রজারা—

গুপী, বাঘা, হাল্লা রাজা আর মুক্তামালার আবির্ভাব হয়।

হাল্লা রাজা এই আমার মুক্তামালা।
শুণ্ডি রাজা কী আনন্দ! মা, তোমার খুড়াকে প্রণাম করো।
হাল্লা রাজা তোমার খুড়াকে প্রণাম করো মা!

মুক্তামালা শুণ্ডি রাজাকে প্রণাম করে।

শুণ্ডি রাজা থাক মা, সুখী হও।

মণিমালা হাল্লা রাজাকে প্রণাম করে।

হাল্লা রাজা রাজরানী হও।

গুপী-বাঘা তাকিয়ে থাকে।

শুণ্ডি রাজা সত্যিই আজ বড় আনন্দের দিন। তোমাদিগের পাত্রী পছন্দ হইয়াছে তো?
বাঘা পছন্দ হবে কি? এখন পর্যন্ত মুখইতো দেখতে পারলাম না!
গুপী ভালো ক'রে দেখেশুনে নিতে হবে তো রাজামশাই!
বাঘা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলে চলবে কেন?

শুণ্ডি রাজা মেয়েদের মুখ তোলে।

শুণ্ডি রাজা বড় লাজুক তো। মুখ তোলো মা, মুখ তোলো।

গুপী-বাঘা নিজেদের মধ্যে ফিস্-ফিস্ ক'রে কি বলে।

গুপী বাঘা রাজপোশাক!

দু'জনে হাতে তালি দেয়।

রঙিন রাজপোশাকে দেখা যায় গুপী-বাঘাকে।

মুক্তামালা অবাক হয়ে চেয়ে ছাখে। বাঘাও তার দিকে অবাক চোখে ছাখে।

মণিমালা অবাক হয়ে ছাখে। গুপী অবাক হয়ে মণিমালাকে ছাখে।

গুপী-বাঘা পরস্পর নিজেদের দিকে ছ্যাখে। তারপর রাজার দিকে তাকায়।

বাঘা ঠিক আছে রাজামশাই।
গুপী জবর হয়েছে।
বাঘা চলবে।
গুপী আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে।
বাঘা এবারে দিন-টিন সব ঠিক ক'রে ফেলুন। যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভালো!

ঘরের মেঝেতে একটা রঙিন প্রজাপতি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়।

—

স্বীকৃতি

সেন্সর স্ক্রিপ্‌ট ও ছবিটি দেখে মুদ্রণযোগ্য পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যকার প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। —স. এ.।

পরিচালকের কথা

সত্যজিৎ রায়

গুপী গাইন ছবি করি আমি আজ থেকে বিশ বছর আগে। ছোটদের জন্য ছবি বাংলায় প্রায় হয় না বললেই চলে, সেই অভাব দূর করার ইচ্ছা আমার মনে অনেক দিন থেকেই উঁকি দিচ্ছিল। তা ছাড়া আমার নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয় পুত্র সন্দীপও এই ছবি করার একটা কারণ। তখন অবধি ওর উপযোগী কোনো ছবি আমি করি নি।

উপেন্দ্রকিশোরের গুপী গাইন গল্প আমার ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রিয়। বিশেষ ক'রে গুপী ও বাঘার চরিত্র। গুপী গান করে, বাঘা ঢোল বাজায়। দু'জনেই অপটু, কিন্তু শখের অন্ত নেই। ভূতের বর পেয়ে তারা গীতবাদ্যের দ্বারা লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষমতা পেল। তারপর আছে দুই রাজ্য শুণ্ডি ও হাল্লার দুই রাজা। এদের মধ্যে শত্রুতা, এরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়, গুপী-বাঘা তাদের গান-বাজনার জোরে এই যুদ্ধ হতে দেয় না।

এই কাঠামো থেকেই চিত্রনাট্য রচনা হয়েছিল। অনেক নতুন চরিত্র ও ঘটনার অবতারণা করতে হয়েছিল। রাজস্থানের দু'টি বিখ্যাত কেল্লা দুই রাজার প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি বুঁদিতে, অন্যটি জয়সলমিরে। এ ছাড়া গান রচনা করতে হয়েছিল খান আষ্টেক।

ছবিটি দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করেছিল এতে শান্তির বাণী প্রচার করা হয়েছে। আমি যখন ছবিটি করি তখন আমার মনে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। আমি কেবল একটি মজাদার গল্পই বলতে চেয়েছিলাম।

গুপী গাইন ছবি ছোটরা সাদরে গ্রহণ করে, এবং এখনো ছবিটি দেখানো হলেই ছেলেমেয়েরা দল ভিড় ক'রে দেখতে যায়॥

৩০. ৮. ৮৮

প্রসঙ্গ : গুপী গাইন বাঘা বাইন

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

১৯৬৩-তে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শতবার্ষিকী বছরে সত্যজিৎ রায় প্রথম 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবি করার কথা ভাবেন। ছোটদের জন্যে ছবি করার প্রথম অনুরোধটা আসে ১০ বছরের পুত্র সন্দীপের কাছ থেকে। সেই অনুরোধের বীজ ধরেই 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর আগমন। ঠাকুর্দা উপেন্দ্রকিশোরের লেখা 'গুপী গাইন' সত্যজিতেরও ছোটবেলার এক অতি প্রিয় গল্প ছিল। নানা-কারণে ১৯৬৭ পর্যন্ত গুপী গাইন-এর চিত্রনাট্য তিনি লিখে উঠতে পারেন নি। গুপী গাইন-এর গল্প নিয়ে চিত্রনাট্য বিষয়ে ভাবতে বসে ঠিক ক'রে নিয়েছিলেন 'মিউজিক্যাল' ছবি করার কথা। চিত্রনাট্য শুরু করার আগেই লিখে ফেলে-ছিলেন ৬টি গান। পরে গল্পটিকে সিনেমার মতো ক'রে সাজিয়ে নিয়ে এবং গানগুলিকে উপযুক্ত জায়গায় সংলগ্ন করার কথা মনে রেখেই তিনি চিত্রনাট্য রচনা করেন। তবে উপেন্দ্রকিশোরের 'গুপী গাইন'-এর সঙ্গে বিস্তর ফারাক সত্যজিতের 'গুপী গাইন'-এর। উপেন্দ্রকিশোরের শিশু ফ্যাণ্টাসির সঙ্গে সত্যজিৎ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন বাস্তবতার। ফলে, চিত্রনাট্যে এসেছিল নতুন চরিত্র।

কথা ছিল প্রযোজনা করবেন আর. ডি. বনশল। সেই সময়ের রাজনীতির ডামাডোলে বনশল তাঁর প্রস্তাব বাতিল ক'রে দেন। চেষ্টা করা হয় ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনে। সে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে যায়। জনান্তিকে শুনে, সত্যজিৎ রায়কে দিয়ে ছবি করাবার জন্যে এগিয়ে আসেন বোম্বের বিখ্যাত এক অভিনেতা-প্রযোজক। রাজি হন টাকাটা দিতে, তবে শর্ত একটা – ছবির মুখ্য দুই ভূমিকায় অভিনয় করবেন চিত্রতারকার ভাই এবং পিতা। প্রস্তাব বাতিল হয় সেই মুহূর্তেই। অবশেষে যোগাযোগ করেন নেপাল দত্ত। ঠিক হয়ে যায় ছবির বাজেট চার লক্ষ টাকা দেবেন নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত। শুরু হয়ে যায় ছবির শুটিং। ১৯৬৮-র জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত একটানা শুটিংয়ে শেষ হয় ছবির কাজ। ইনডোর ছাড়াও ছবির শুটিংয়ের কাজে তাঁকে যেতে হয়েছিল বীরভূম, সিমলা, জয়সালমির-এ। ১৯৬৮-র সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবার কথা থাকলেও ছবির কাজ শেষ না হওয়ায় পিছিয়ে যায় ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরেও মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় নি। ততদিনে বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে ঘনিয়ে ওঠে রাজনীতির মেঘ। বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্যে চলচ্চিত্র কলাকুশলী মিলে গঠিত হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি'। প্রথম থেকেই সত্যজিৎ রায় এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যেই সমিতির আন্দোলন এমন দিকে যেতে শুরু করে যে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ প্রমুখ বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা

পরিচালক ও প্রযোজক বেরিয়ে আসেন সমিতি থেকে, ত্যাগ করেন সম্পর্ক। ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে পরিচালকবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য জানান সাংবাদিকদের। এর পরেও ২ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে প্রকাশিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় এক চিঠিতে তাঁরা জানান :

২৬.১২.৬৮ তারিখে আমাদের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনের যে বিবরণ আপনার পত্রিকায় ২৭.১২.৬৮-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে তারই মধ্যে নিম্নলিখিত যে ক'টি বিষয় উক্ত বিবরণে আরও একটু গুরুত্ব পেলে আমরা খুশি হতাম, তারই পুনরাবৃত্তি করছি :

১। সংরক্ষণ সমিতি যে মূল চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে তার আন্দোলন শুরু করেছিল, তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন সেদিনও ছিল, আজও আছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে পথে সেই আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে – তার সঙ্গে সর্বতঃ আমরা একমত নই।

২। প্রমোদকরের একটা অংশ এই চলচ্চিত্র শিল্পেই ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ সমিতির যে বিঘোষিত নীতি একদা ছিল, অথচ আজ বিস্মৃতপ্রায়, সেই নীতিকে বাস্তব রূপদানের আন্দোলনকে আমরা আশু ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করি।

৩। সংরক্ষণ সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদের নীতিগত বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রদর্শকরা যদি মনে করেন আমরা তাঁদের অন্যায় কার্যকলাপের পক্ষে, তাহলে আমরা ঘোষণা করতে চাই, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমরা মনে করি, ছায়াছবি নির্মাণের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমানে কিছু না কিছু জঞ্জাল জমে আছে। সব জঞ্জালই পরিষ্কার হওয়া উচিত। কিছুটা আত্মসমীক্ষা, কিছুটা শুভেচ্ছার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে সবাই যদি এগিয়ে আসেন – তাহলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব। নতুবা একপক্ষের চাপের ফলে অন্যপক্ষের সাময়িক নতিস্বীকার – এতে শুধু নতুন সমস্যারই সৃষ্টি হয়।

৪। একটি সংগঠিত আন্দোলনে বিভেদ ঘটানোর উদ্দেশ্য আমাদের নয়। বরং বিভেদপন্থী নেতৃত্বকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে চলবার অনুরোধ করেই আমাদের পদত্যাগ। বিভেদের বীজ বোনা হয়েছে অনেক আগেই, যেদিন শিল্পীদের সংগঠন ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল এবং পুরনো সংস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নবগঠিত একটি শিল্পী সংস্থা সংরক্ষণ সমিতির আশীর্বাদ লাভ করল। যদি ঐক্যের কথাই ওঠে, ঐক্য গোড়া থেকে শুরু হওয়া উচিত। তখনও আমরাও পেছিয়ে থাকব না।

– সত্যজিৎ রায়, হরিদাস ভট্টাচার্য, বিভূতি লাহা, তপন সিংহ,
তরুণ মজুমদার, অজয় কর, অরুন্ধতী দেবী।

ইতিমধ্যে সেন্সর-এর ছাড়পত্র পেয়ে যায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। এবং বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি থেকে অনুরোধ আসে ছবিটি সেখানে পাঠাবার জন্য। উৎসবের পরিচালক ডক্টর এ· বাওয়ের প্রযোজক অসীম দত্তকে এক চিঠিতে লেখেন : 'সমগ্র জারমানিতে এবং বিশেষ ক'রে বার্লিন শহরে সত্যজিৎ রায়ের গুণমুগ্ধের সংখ্যা অগণিত। আমাদের আসন্ন উৎসব ভারতের সুখ্যাত পরিচালকের এই চিত্রটির জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে।'

কিন্তু এদিকে সত্যজিৎ রায় সংরক্ষণ সমিতির বিপক্ষে মত পোষণ করায় গুপী গাইন-এর মুক্তিলাভের ব্যাপারে গণ্ডগোল দেখা দেয়। ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত শান্তিকুমার চক্রবর্তীর এক চিঠিতে সেই সময়ের ডামাডোলের দৃশ্যটি ধরা পড়ে। শ্রী চক্রবর্তী লেখেন :

> সিনেমা স্টুডিও মহলের খবর, শ্রী সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্রটির মুক্তির ব্যাপার নিয়ে এক নতুন অশান্তি ঘনিয়ে উঠেছে। প্রকাশ, একটি পুরনো চুক্তি অনুযায়ী 'আপনজন' ছবিটির পর মিনার-বিজলী-ছবিঘরে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মুক্তি পাওয়ার কথা। চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির সঙ্গে পরে ওই রিলিজ চেনের যে চুক্তি হয়, তদনুযায়ী অবশ্য 'আপনজন'-এর পরের ছবি 'আরোগ্য নিকেতন'। সম্প্রতি উক্ত রিলিজ-চেনের কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন, তাঁরা আগের চুক্তিটিই মেনে চলবেন। পরবর্তী চুক্তি সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য, সেটিতে জোর-জুলুমের চাপে পড়ে তাঁরা সই করেছিলেন। 'তথাকথিত সেই চুক্তি' তাঁরা এখন স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। অর্থাৎ 'আপনজন'-এর পর 'গুপী গাইন' ছবির মুক্তির ব্যবস্থার জন্য ওই রিলিজ চেনের কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।
>
> এই পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষণ সমিতির সিদ্ধান্ত, শোনা গেল, তাঁরা 'গুপী গাইন' ছবির মুক্তি পথ বন্ধ ক'রে দেবেন। ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিতে ওই ছবির প্রিণ্ট সংরক্ষিত, সমিতির সদস্যরা সেখান থেকে প্রিণ্টগুলিকে বার ক'রে আনতে দেবেন না। সমিতির এক নেতা নাকি বলেছেন, এছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ।
>
> সংরক্ষণ সমিতির গত বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা আমাদের মনে আছে। প্রায় দুই মাস ধরে তখন বাংলা সিনেমা হলগুলির প্রদর্শনী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। আবার কি অনুরূপ সংগ্রামের পালা চলবে? যদি চলে তবে এবার তার চেহারাটা, আশংকা হচ্ছে, কুশ্রীতর হয়ে দাঁড়াতে পারে। দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারের সৃষ্টি আর দর্শকদের মাঝখানে সংরক্ষণ সমিতি এক প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবেন, এ-কথাটা ভাবতে খুবই খারাপ লাগছে।

শান্তিকুমার চক্রবর্তী/কলকাতা—২৭

বাধা আসতে থাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে। ছবির নেগেটিভ ছিল ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিতে। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে ল্যাবরেটারির পক্ষ থেকে একটি চিঠিতে অসীম দত্তকে জানানো হয় :'বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির জন্য উক্ত চিত্রের প্রিণ্ট তৈরির কাজে দেরি হতে পারে, অতএব আপাতত প্রিণ্টের ডেলিভারির জন্য প্রযোজক যেন পীড়াপীড়ি না করেন।' অসীম দত্ত চিঠি পেয়েই ছবির নেগেটিভ ফেরত নিয়ে বোম্বাই-এর ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের দফতরে পাঠিয়ে দেন। যথাসময়ে ছবির প্রিণ্টও চলে আসে। ১১ এপ্রিল ১৯৬৯ তারিখে ঘোষিত হয় 'আপনজন'-এর পরই মুক্তি পাচ্ছে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। ঐ একই দিনে সংবাদে জানা যায়, বার্লিন ছাড়াও ছবিটি মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে। ২০ এপ্রিল ১৯৬৯, রবিবারের কাগজে প্রকাশিত হয় 'গুপী গাইন' ছবির নতুন বিজ্ঞাপন। এক কলম, ২৮ সে.মি. মাপের বিজ্ঞাপনটির উপরের অংশে লেখা : 'হুঁ হুঁ বাবা! / গুপী গাইন বাঘা বাইন / এল বলে! / পঁচিশে বৈশাখ (৮ই মে / মিনার বিজলী ছবিঘর / গ্লোব (ইংরেজী সবটাইটেলসহ) / মাত্র এক সপ্তাহের জন্য।' নিচে গুপীর মুখের কাট আউট ছবি।

বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হবার পর, ২৫ এপ্রিল তারিখে বিকেলে একটি মিছিল রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে আসে। 'প্রধানত বাংলা ছায়াছবির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন এবং মিনার-বিজলী-ছবিঘরে শ্রী সত্যজিৎ রায়-কৃত গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির প্রদর্শনী বন্ধ রাখার দাবি' নিয়েই মিছিলটি আসে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন উত্তমকুমার। প্রতিনিধি দল দেখা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে এবং তাঁর হাতে তুলে দেন স্মারকলিপি। এই ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে চণ্ডী লাহিড়ী-র আঁকা কার্টুন দেখা যায় 'তির্যক'-এ : দু হাত ছড়িয়ে ডোরা কাটা শার্ট গায়ে সত্যজিৎ, তাঁর নিচে উত্তমকুমার, চোখে কালো চশমা, গলায় ঢোল। কার্টুনের ক্যাপশন 'গায়েন বায়েন লড়াই'।

১ মে আবার বিজ্ঞাপন। এবারে গুপী-বাঘার কাট আউট ছবি। উপর দিকে লেখা : 'আসছে! / ৮ই মে'। সংবাদপত্রে যথারীতি প্রকাশিত হয়ে চলেছে সংরক্ষণ সমিতিকে কেন্দ্র ক'রে দুই পক্ষেরই চিঠি চালাচালি। সমাধানের পথ খুঁজতে বৈঠকের পর বৈঠক। ৩ মে বেঙ্গল মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে কমিটি-বৈঠক হয়। শিল্পী, টেকনিসিয়ান, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। ৫ মে-র বৈঠকে মোটামুটি পথও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু ৭ মে তারিখেই সংবাদ পাওয়া গেল : 'চিত্রমুক্তি নিয়ে আবার বিরোধ / 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবং 'আরোগ্য নিকেতন' ছবি দু'টির মুক্তির ব্যাপারে সোমবার (৫. ৫. ৬৯) যে মীমাংসা হয়েছিল মঙ্গলবার (৬. ৫. ৬৯) তা ভেঙে গিয়েছে। কারণ, 'আরোগ্য নিকেতন' ছবি রিলিজের উপযোগী চিত্রগৃহ নিয়ে সংরক্ষণ সমিতির প্রতিনিধিগণ একমত

হতে পারেন নি। তবে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটি ৮ই মে মুক্তি পাচ্ছে এবং আজ বুধবার সকাল থেকে অগ্রিম বুকিং শুরু হচ্ছে।'

৪ মে থেকে সংবাদপত্রে প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়েছিল 'গুপী গাইন …'এর বিজ্ঞাপন। সত্যজিৎ ঘরানার সেই সব বিজ্ঞাপনে যথারীতি নিজস্ব শৈলির ছাপ, সঙ্গে কৌতুকের ছোঁয়া। ৪ মে ১৯৬৯ তারিখের বিজ্ঞাপনে গুপী বাঘার ছবি, সঙ্গে লেখা – 'এস / বাবা / এস!' ৫ মে ১৯৬৯ তারিখে একই বিজ্ঞাপন, বাড়তি কেবল তিন শব্দ – বুকিং / শুরু / কাল!' ৬ মে ১৯৬৯ তারিখের বিজ্ঞাপনটি মাপে বড়। ছন্দে মিল দেখা গেল আদি অন্তে। বিজ্ঞাপনের মাথায়: 'বুক / ধুক্ – পুক!' গুপী বাঘার ছবির নিচে অন্যান্য তথ্য – 'পূর্ণিমা পিকচার্স নিবেদিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন / সত্যজিৎ রায়ের ছবি।' নিচে 'আজ থেকে বুক!'

তবে ৬ মে নয়, বুকিং শুরু হবার কথা ছিল ৭ মে থেকে। একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ৭ মে তারিখেও। বিজ্ঞাপন বেরোলেও টিকিট বিক্রি নিয়ে গোলো-যোগ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তিনটি মূল প্রেক্ষাগৃহের সামনে বুকিং শুরু হবার আগে থেকেই সংরক্ষণ সমিতি বিক্ষোভ শুরু করে। কিন্তু ঐ বিক্ষোভের মধ্যেই সমস্ত টিকিট অগ্রিম বিক্রি হয়ে যায়। কথা ছিল পরের দিন ছবির মুক্তি পাওয়ার সময় আবার বিক্ষোভ শুরু হবে। যদিও ৮ মে দুপুরের শো আরম্ভ হবার আগেই জানা যায় সংরক্ষণ সমিতি মিনার-বিজলী-ছবিঘর-এর সামনে থেকে পূর্বনির্দিষ্ট পিকেটিং প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছে।

৮ মে ১৯৬৯, বৃহস্পতিবার, পূর্বোল্লেখ মতো যথারীতি মুক্তি পায় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। বিজ্ঞাপনটি আগের মতোই এক কলম জুড়ে। সত্যজিৎ রায়ের ক্যালিগ্রাফিক সজীবতা ছবির নামে, সঙ্গে ছন্দ-বদ্ধ রাজার তালিকা: 'আজ থেকে / সত্যজিৎ রায়ের ছবি / আমলকীর রাজা / হাল্লার রাজা / শুণ্ডীর রাজা / ভূতের রাজা / আর ছবির রাজা / গুপী গাইন বাঘা চাইন / প্রত্যহ ৩ ৬ ৯ / গ্লোব ইংরেজী সাব টাইটেল সহ / মিনার-বিজলী-ছবিঘর / পদ্মশ্রী অশোকা পার্বতী মায়াপুরী / মায়া গৌরী মানসী লীলা জয়শ্রী মীনা কল্যাণী / বিশ্ব পরিবেশনা পিয়ালী ফিল্মস।'

ছবিটি মুক্তি পাওয়ায় এবং নির্বিঘ্নে প্রথম দিনটি কেটে যাওয়ার পর ৯ মে ছবির বিজ্ঞাপনের নিচে বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল অভিনন্দন বার্তা: 'আমরা যুব ছাত্র, জনসাধারণ, অভিনেতৃ সংঘ, বি এম পি ই ইউ, সি টি ডব্লিউ ইউ ও যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। নমস্কারান্তে ইতি – পূর্ণিমা পিকচারস।'

১১ মে তারিখের বিজ্ঞাপনটিও দেখা গেল ছন্দে। এবারে বিষয়-বৈচিত্র্য: 'নাচ আছে / গান আছে / ভূত আছে / জাদু আছে / রাজা আছে / বাঘ আছে / উট আছে / আরো কত / কী যে আছে / ছেলে বুড়ো / দলে বলে /

দেখে এস ! /পূর্ণিমা পিকচার্স নিবেদিত / সত্যজিৎ রায়ের ছবি / গুপী গাইন বাঘা বাইন।'

সত্যজিৎ রায়ের অন্য ছবির মতো দর্শকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার পরিবর্তে এবারে যেন মুগ্ধতার দৃষ্টিই বেশি চোখে পড়ে। তবে অনেকেই ফ্যাণ্টাসির মোড়কে দেখতে পায় রূঢ় বাস্তব। চিত্র-সমালোচকদের আলোচনাতেও ধরা পড়ে সেই কথা। প্রতিটি সংবাদপত্র ১৬ মে তারিখে প্রকাশ করে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির সমালোচনা। তবে বাড়তি পাওয়া যায় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়, সত্যজিৎ রায়ের আঁকা গুপী-বাঘার ভৌতিক জুতো আর হাল্লা-রাজার বল্লম প্র্যাকটিসের ডামির স্কেচ।

গুপী-বাঘা নিয়ে সংরক্ষণ সমিতির গণ্ডগোলটা মিটে গেলেও, ১৭ মে আবার শুরু হয় 'শুকসারী' ও 'তীরভূমি' ছবির মুক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। আবার পিকেটিং বসে সিনেমা হলের সামনে। এই বিষয়ে সত্যজিৎ রায়, হরিদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ পরিচালক-প্রযোজকদের লেখা আর একটি চিঠি প্রকাশিত হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় ২১ মে ১৯৬৯ তারিখে।

ইতিমধ্যে গুপী গাইনের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। বাংলার বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকার তৎকালীন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটিকে প্রমোদকর মুক্ত করার অনুরোধ করেন। একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাঁরা বলেন : 'কিশোর মনের অপরূপ কল্পনার ছবি হিসেবেই শুধু নয়, নির্মল আনন্দের এবং শিক্ষামূলক ছবি হিসেবেও গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর আবেদন সর্বজনীন। এই রকম একটি ছবির বহুল প্রচার সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলে তাঁরা মনে করেন।'

বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, মন্মথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় ৬ জুন ১৯৬৯ তারিখে। 'গুপী গাইন' প্রমোদকর মুক্ত হয়েছিল ঠিকই, তবে সেই সময় নয়, বেশ কয়েক বছর পর। ততদিনে 'গুপী গাইন' পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এককালীন ১০২ সপ্তাহ চলার সুবাদে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপন করে ; যে রেকর্ড আজও অম্লান।

গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর পুরস্কার

পূর্বে উল্লেখমতো, গুপী গাইন ছবির প্রিণ্ট ঠিক সময়ে পৌঁছে যায় বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে। ১৯৬৯-এর ২৬ জুন বার্লিন উৎসবে প্রতিযোগিতামূলক বিভাগের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় 'গুপী গাইন' দিয়ে। সেই উৎসবে যোগ দিতে বার্লিনে

উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায়, পুত্র সন্দীপ, মুখ্য দুই শিল্পী তপেন চট্টোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ এবং ছবির প্রযোজক নেপাল দত্ত, অসীম দত্ত ও পূর্ণিমা দত্ত। পুরস্কার না পেলেও, প্রশংসা অর্জন করেছিল 'গুপী গাইন'। যদিও অকল্যাণ্ড, অ্যাডিলেড, এবং পরের বছর টোকিও ও মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এবং ভারতের জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়। পুরস্কারের তালিকা :

১। ভারত	রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক	১৯৬৯
২। ভারত	শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক	১৯৬৯
৩। অ্যাডিলেড	অসাধারণ গুণসম্পন্ন কাহিনী-চিত্র এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার—সিলভার সাদার্ন ক্রশ	১৯৬৯
৪। অকল্যাণ্ড	শ্রেষ্ঠ মৌলিক ছবি শ্রেষ্ঠ পরিচালক	১৯৬৯
৫। টোকিও	মেরিট পুরস্কার	১৯৭০
৬। মেলবোর্ন	শ্রেষ্ঠ ছবি	১৯৭০

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ

'গুপী গাইন' ছবির শুটিং-এর ঘটনা নিয়ে সত্যজিৎ রায় তিনটি বাংলা ও একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা লেখা তিনটি প্রকাশিত হয় 'সন্দেশ' পত্রিকায়।

১। হাল্লা রাজার সেনা	সন্দেশ	জানুয়ারি, ১৯৭৬
২। বাঘের খেলা	„	মার্চ, ১৯৭৬
৩। হুণ্ডী-ঝুণ্ডী-গুণ্ডী	„	ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

১৯৭৯-তে 'নিউস্ক্রিপ্ট' প্রকাশিত 'একেই বলে শুটিং' গ্রন্থে অন্যান্য লেখার সঙ্গে এই তিনটি লেখাও সংকলিত হয়। ইংরেজি লেখাটির বিষয় ছিল জয়সালমির শুটিংয়ের জন্যে সেখানকার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 'Meeting with a Maharaja' নামে লেখাটি বেরিয়েছিল 'Film World' পত্রিকার এপ্রিল-জুন, ১৯৬৮ সংখ্যায়। পরে 'Our Films Their Films' ১৯৭৬) গ্রন্থে সংকলিত।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর ডিস্ক ও ক্যাসেট

'গুপী গাইন' মুক্তি পাবার কয়েকমাস পর দ্য গ্রামাফোন কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া থেকে প্রকাশিত হয় এর গানের রেকর্ড বা ডিস্ক। প্রথমে বেরোয় একটি '45 R. P. M. Extended Play Records'। Angel লেবেলে প্রকাশিত ডিস্কটির 'কাপলিং' নম্বর TAE 4029'। একদিকে দু'টি ক'রে রেকর্ডটিতে স্থান পায়

মোট চারটি গান। একদিকে ছিল—১। মহারাজা, তোমারে সেলাম (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ)। ওরে বাঘারে, ওরে গুপীরে (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ)। অপর দিকে—৩। ওরে বাবা দেখ চেয়ে (অনুপ ঘোষাল)। ৪। এক যে ছিল রাজা (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ)।

১৯৭০-এ প্রকাশিত হয় '$33\frac{1}{2}$ R. P. M. Long Play Records'। Angel লেবেলের রেকর্ডটির নম্বর' 3 AE X 4007'। পরবর্তী কালে এই রেকর্ডটি বেরিয়েছিল Regal লেবেলে, নম্বর ছিল 'ELR X 46'। রেকর্ডটির সূচি :

SIDE ONE

টাইটেল মিউজিক ; গুপী থিম ; ড্যানস অফ দি ঘোস্টস ; কিং অফ ঘোস্টস গিভ্‌স্‌ থ্রি বুন্‌স্‌ ; ভাখরে নয়ন মেলে (অনুপ ঘোষাল) ; ভূতের রাজা দিল বর (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ) ; গুপী অ্যাণ্ড বাঘা ল্যাণ্ড অন্‌ স্নো ; দি ফ্লুটিস্ট ইন দি শুণ্ডি ফেয়ার (রাজস্থান ফ্লুট); মহারাজা তোমারে সেলাম (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ)।

SIDE TWO

গুপী অ্যাণ্ড বাঘা ইন দেয়ার প্যালেস রুম ; এনট্রি অফ দি হাল্লা কিং ; ওরে বাঘারে (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ) ; দি প্রিজ্‌ নার্স ; ও মন্ত্রীমশাই (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ) ; বরফি থিম্‌ ; সার্চ ফর অ্যাণ্ড ক্যাপচার অফ গুপী অ্যাণ্ড বাঘা ; এক যে ছিল রাজা (অনুপ ঘোষাল ও রবি ঘোষ) ; হাল্লা চলেছে যুদ্ধে (কামু মুখোপাধ্যায়, জহর রায় ও অন্যান্য) ; ক্যামেল মার্চ ; ওরে বাবা দেখ চেয়ে (অনুপ ঘোষাল) ; গুপী অ্যাণ্ড বাঘা অ্যাপ্রুভ অফদি প্রিন্সেসেস।

রেকর্ডটির 'কভার' ছাড়াও সত্যজিৎ রায় 'গুপী গাইন' ছবি ও তার সংগীত বিষয়ে একটি পরিচিতি লেখেন ; ইংরেজি লেখাটি শেষে দেওয়া হল।

১৯৮২-তে গ্রামোফোন কোম্পানি একটি ক্যাসেট বার করে, যার একদিকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এবং অপরদিকে ছিল 'হীরক রাজার দেশে' ছবির গান। ক্যাসেটটির নম্বর ODEON / 4 TWO 22806'।

প্রসঙ্গত, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর 'ভূতের রাজা দিল বর' গানটি 'গুপীর গান' নামে প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার ১৯৬৭-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় এবং 'ভূতের রাজা দিল বর' ও 'ওরে বাঘারে' গান দু'টি সহকারী সংগীত পরিচালক অলোক দে-কৃত স্বরলিপিসহ প্রকাশিত হয়েছিল 'ঘরোয়া' ৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যায় (৩০ এপ্রিল, ১৯৭১)।

TBE STORY

Goopy Gyne was originally a 20-page short story which

my grandfather wrote for the children's magazine which he founded just before the outbreak of the first world war. I knew and love the story as a child, and when, in 1960, we decided to revive the magazine, one of the first stories we reprinted from the early issues was Goopy Gyne.

The story describes the adventures of two village youngsters. Goopy and Bagha, who are given three boons by a benign King of Ghosts. One of them gives them the power to hold people spellbound with their singing and drumming (Goopy is the singer, and Bagha the drummer). Another provides them with magic shoes, by means of which they transport themselves to the kingdom of Shundi where the good king appoints them court musicians. Soon the king of Halla declares war on Shundi. Anxious for the safety of their peace-loving patron, Goopy and Bagha journey to Halla as spies and, largely with the aid of their music, prevent the war, bring the two kings together, and marry their two daughters.

THE MUSIC

The film is freely adapted from the original, keeping the main lines of the plot, but adding new turns and twists mainly to provide Goopy and Bagha with opportunities for singing and drumming. 4 out of the 7 songs sung by Goopy (with occasional vocal embelishments by Bagha) have more than a tinge of Bengali folk music in their rhythm and melody (Song Nos. 6 and 9 of Side I ; 8 and 9 of Side II). Of the others, No. 5 of Side I is based on the classical morning raga Bhairavi. The accompaniment here consists of tanpura, two sitars, and a bamboo flute. Song No. 3 of Side II, parodies the South Indian Carnatic style of singing, and uses, along with a

trumpet and violins the classical south Indian string instrument called Veena.

Most of the orchestral pieces use a combination of eastern and western instruments : violins, cellos, electric guitar, trumpet, trombone, xylophone and vibraphone, as well as sitar, sarod, Indian flute and Indian percussion.

There are two items on this disc which were not composed by me. The first is the music that goes with the Dance of the Ghosts. This is a straight reproduction of a form of percussion quartet popular in South India. The four instruments are the classical Mridanga, the popular Ganjira, the sharp-sounding Ghattam – which is nothing more than a claypot, and the quint, twangy Mursring, a tiny instrument which is held between the teeth and plucked with the forefinger. The other item is the beautiful flute melody on Side II. This I heard being played by a camel driver in Rajasthan : two flutes played simultaneously from the two corners of the mouth, one holding the drone and the other weaving the melody around it.

—

সাক্ষাৎকার

১

করুণাশঙ্কর রায়

'কলকাতা' পত্রিকা ২ মে ১৯৭০ (দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ যুগ্ম সংকলন) তারিখ-চিহ্নিত হয়ে 'সত্যজিৎ রায় বিশেষ সংখ্যা'-রূপে প্রকাশিত হয়। এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদনার মূল দায়িত্ব নিয়েছিলেন করুণাশঙ্কর রায়। পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নাম ছিল অমিয় দেব, জ্যোতির্ময় দত্ত ও শুদ্ধশীল বসু-র। অনেকগুলি চিত্র-সংবলিত এই বিশেষ সংখ্যার প্রধান অংশ জুড়েই থাকে করুণাশঙ্কর রায়-গৃহীত সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘসাক্ষাৎকারটি। এতে নানা প্রসঙ্গ থাকলেও এখানে শুধু 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটির প্রাসঙ্গিক অংশ 'কলকাতা' কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে পুনর্মুদ্রণ করা হল। —সম্পাদক, এক্ষণ।

[সূত্র : ক=করুণাশঙ্কর রায় ; স=সত্যজিৎ রায়]

ক. 'গুপী গাইন' নিয়ে আরো দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি বোধহয় লক্ষ ক'রে থাকবেন যে সাধারণত আমাদের দেশের চিত্রসমালোচনায় আপনার ছবির মধ্যে গল্পটাকে গল্প হিশেবে না নিয়ে তার গূঢ় তাৎপর্য অন্বেষণে সবাই ব্যস্ত।

স. সেটা প্রায় গা সওয়া হ'য়ে গেছে, তবে এটাতে একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে।

ক. এই যে ধরুন দুটি দেশ, একটা যুদ্ধবাদী একটা শান্তিপ্রিয় — চ্যাপলিন যেমন 'গ্রেট ডিক্টেটর'-এ স্পষ্টই একটা ডায়াট্রাইব লক্ষ করেছিলেন, আপনি এখানে 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে' গানটির সঙ্গে ক্যামেরা পাস ক'রে দিয়ে কমিক্যাল প্রোপোরশনে দেখালেন, তার সঙ্গে কোনো অ্যান্টি-নাটসি ফীলিং আছে কিনা, এ-নিয়ে নানা কথাবার্তা হয়েছে।

স. হ্যাঁ জানি। কিন্তু একটা কথা তো মনে রাখতে হবে যে যখন ১৯১৫-তে গপ্পোটা বেরিয়েছিলো, তখনো তাতে দুটো রাজ্য ছিলো — একটা শান্তিপ্রিয়,

একটা যুদ্ধপ্রিয় রাজ্য। তাদের মধ্যে সেই যুদ্ধটা থামানো হ'লো, তারপর শান্তি এলো, তারপর দুই রাজার মিলন হ'লো। মূল গল্পটাই তা-ই। এখন আজকের দিনে সে-গল্প পড়লে স্বভাবতই সাধারণ লোকের মনে অনেক রাজ্যের সঙ্গে আইডেন্টিফাইড হ'য়ে যেতে পারে। আমি কিন্তু এসব কিছু ভেবে করিনি।

ক. 'গু গা বা বা' বিষয়ে অনেকে অভিযোগ করেন যে এর শুরু ফ্যাণ্টাসিতে, শেষ ফেব্‌লে। প্রথমে আজগুবি গল্পের লজিকে চলেছে, কিন্তু মাঝখানে বক্তব্য বা নীতিকথা এসে পড়ায় কাহিনীটি দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেছে। গুপী-বাঘার গানগুলিও তার প্রমাণ।

স. গুপী-বাঘা যখন কথা বলছে, তখন তাদের মধ্যে কোনো বক্তব্য আছে বলা যায় না। শুধু ফংশন্যাল কথাবার্তা ব'লে গেছে। শুধু যখন গান গেয়েছে, গুপী তখন প্রায় ক্রবাতুরের একটা ফংশন মেনে চলেছে আর কী! কমেণ্ট করেছে সিচুয়েশনের ওপর। [আর ফ্যাণ্টাসি এবং ফেব্‌লের কথা যদি বলেন] দুটোতে খুব একটা ডিমারকেশন করা হয় কিনা আমি ঠিক জানি না। আমার মনে হয় সব চাইতে ভালো···কোনো ক্যাটিগরিতে না ফেলা — জজ ইট অ্যাজ ইট ইজ। সেটাই আমার মনে হয় সব চাইতে ভালো। ফ্যাণ্টাসি, মানে ফেব্‌লের মধ্যেও যদি অলৌকিক ঘটনা, ম্যাজিক ইত্যাদি থাকে, তাহ'লে দুটো জিনিশই আবার — মানে — ন্যাচারালি — আমাকে গল্পটার মূল কাঠামোটা গ'ড়ে তারপর তো এগোতে হয়েছে। সেখানে গুপী একটা গায়ক চরিত্র হচ্ছে — তার গানগুলো আমাকে লিখতে হচ্ছে এবং তাহ'লে গানগুলো লিখলে তার বক্তব্য কী হবে সেটা স্বভাবতই এসে যাচ্ছে। এখন, একটা যুদ্ধে একটা সৈন্যদল অগ্রসর হচ্ছিলো, সেখানে তারা এসে গান গেয়ে থামাচ্ছে। এখন, সেখানে তো 'দেখো রে নয়ন মেলে জগতের কী বাহার' সে-গান দিতে পারি না। কাজেই সেখানে স্বভাবতই একটা অ্যাপ্ট, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট গান দিতে হয়েছে। এখন, সেখানে আস্তে-আস্তে ঐ জিনিশটা ইভল্‌ভ করেছে। তাহ'লে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা কমেণ্ট করুক না।··· জিনিশটাকে আরো নাটকীয়, আরো রেলেভ্যাণ্ট, করবার জন্য, আরো পয়েণ্টেড করবার জন্য — যেমন মন্ত্রী যখন তাদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলো — তখন, যখন মন্ত্রীকে 'ওরে থাম, থাম মন্ত্রীমশাই, ষড়যন্ত্রী মশাই' ব'লে গান গাইলো, তখন সেখানে মন্ত্রী সম্পর্কে একটা কমেণ্ট তাকে করতেই হয়েছে — মানে, সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী তাকে গান করতে হয়েছে। স্বভাবতই সেটা কমেণ্টের পর্যায়ে এসে পড়েছে।···কিন্তু গানটা যখন আসছে, জিনিশটা স্টাইলাইজেশনের পর্যায়ে উঠে যাচ্ছে — যখনই সেখানে অপেরাটিক ফর্ম এসে যাচ্ছে বা যাত্রার ফর্ম এসে যাচ্ছে, ক্রবাদুরের ট্রেডিশনটা চ'লে আসছে,

ইউনিভার্স্যাল। সেটা হচ্ছে গানের ভাষা। এইটে এস্টাবলিশ করতেই আমি বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটা এনেছি।

ক. এর সঙ্গে আপনি কি ঐ গুণ্ডিতে যে কথা বলতে পারে না, তার কোনো যোগ মনে-মনে ভেবেছিলেন ? যে, এরা এই ভাষায় গানটা করছে এবং বলছে যে আরেকটা ভাষা আছে উঁচুস্তরের

স. নিশ্চয়ই, একশোবার। তারা তো জানে না যে এখানে লোকেরা কী ভাষা বুঝবে, কাজেই কথা বলার ব্যাপারে তাদের এমনি একটা মুশকিল আছে। কিন্তু গান, গান জিনিশটার এমন একটা এপীল আছে, সেটা দেশোত্তর, কালোত্তর।…সব সময় যে-প্রব্লেমটা হয় : এই যে সভায় গান গাইবে সেটা কী বিষয়ে গাইবে। এটা একটা ভীষণ প্রব্লেম। গল্পে তো সেটা বলা হয় নি। সেটা তৈরি করতে হবে। না, এই ধরনের – প্রথমে একটা হিউমিলিটির ফীলিং – আমরা বাংলা দেশ থেকে এলাম, আমরা শাদাসিধে মানুষ। আমরা দেশে-দেশে যাই, আমাদের ভাষা তো তোমরা বুঝবে না। কিন্তু কথা যখন বলবো তখন হয়তো না-ও বুঝতে [পারো], কিন্তু আশা করি আমরা গান যখন গাইবো তখন না-বুঝলেও তোমাদের কান দিয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করবে। এইটুকু। এইজন্য প্রথমে গানের থীমটাকে বের ক'রে নিতে হয় সব সময়। এই যে গান গাইবে – কী বিষয়ে গান গাইবে ? ওটা তো ভীষণ একটা প্রব্লেম মিউজিক্যালে। অপেরাতে সুবিধে আছে। অপেরাতে গানের মধ্যেই প্লটটাকে এগুতে হচ্ছে। এখানে তো তা নয়। এখানে প্লট কিন্তু গান গেয়ে হচ্ছে না। ইনডিপেণ্ডেন্টলি এগোচ্ছে।…এইটেই হচ্ছে প্রব্লেম। এটা আমাকে আর কখনো ফেস করতে হয় নি। এটা এখানেই হ'লো এবং এইভাবেই আমার মনে হ'লো অনেক ভেবে-ভেবে। কেননা কোনো মডেল সত্যি ক'রে পাওয়া যায় না। এক আমেরিকান, সত্যি বলতে আমেরিকান মিউজিক্যাল কমেডি ছাড়া কোনো মডেল নেই।

ক. 'রেড শূজ' জাতীয় কিছু ?

স. এনিথিং। এমন কি 'সাউণ্ড অব মিউজিক'-ও অনেক ভালো।

ক. আচ্ছা, আপনি দেমি-র 'লে পারাপ্লুয়ি দ্য শেরবুর্গ' ছবিটা দেখেছেন ?

স. আমি দেখি নি ওটা। আমার একটা রেজিসট্যান্স আছে। আমি নিশ্চয়ই – আমি স্বীকার করছি, আমি না-দেখেই বলছি নিশ্চয়ই খুব স্ট্রাইকিং ছবি হবে। কিন্তু একেবারে পুরো গল্পটা গানে বলা…আমি সেজন্য সুযোগ পেলেও দেখি নি আর কী।

ক. আমারও গোড়াতে রেজিসট্যান্স ছিলো…ইন ফ্যাক্ট দেখেছিলাম অনেক পরে। সেটা হয়েছিলো ঐ পুচ্চিনির 'মাদাম বাটারফ্লাই' শুনে এবং প্রথম দেখে অপেরাকে আমি নিতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিলো

স. অপেরা আমি [নিতে] পারি, স্টেজে পারি – নিশ্চয়ই পারি। অপেরা

বা ফিল্মে গিয়ে কোনো—তবে [এখানে]…ভয়ানক মুনশিয়ানা থাকলে তবে এ-জিনিশটা উৎরোয়। সেই পরিমাণে আছে কিনা জানি না। হয়তো আছে— থাকতে পারে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী হ'তে হবে।…

ক. আচ্ছা আপনার যে 'গু গা বা বা'-র ভূতের বর দেবার দৃশ্য—তাতে যে-নাচটা রয়েছে, এটা সম্পর্কে দু-একজনের বক্তব্য যে

স. লম্বা হয়েছে।

ক. না—টু কালচারস, তার একটা সর্ট অব সারটোরিয়্যাল—দেখালেন—ক্ল্যাশেস অব টু কালচারস—টিকিওয়ালা ভূতেরা এবং সেই প্রসঙ্গে ভূশণ্ডির মাঠের ভূতেরা। তারা মিলে লড়াই করছে

স. না, তারা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে না, এটা ভুল ধারণা। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে।…

ক. হ্যাঁ, নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে—না, আমি সেই আসপেক্টটা বলছি না। আমি বলছি যে, এই যে এই যে লড়াই করছে—তার মানে একটা বিশেষ সময়ে চিহ্নিত করা হ'লো। অথচ সময় হিশেবে ১৯১৫-তে লেখা হ'তে পারে। আপনার ছবির জেনারেল ডমিন্যান্ট ইম্প্রেশন হচ্ছে ইট ইজ অ্যাবাউট এ টাইমলেস ইউনিভার্স অ্যাণ্ড ইট ক্যান বি এনজয়েড অ্যাট দ্য সেম লেভেল, সে বাই এ ট্যাসিটর্ন জ্যাপানীজ অ্যাণ্ড এ ভোল্যাটাইল ওয়েস্টার্নার ইন দ্য সেম মেজার অ্যাজ ইট ইজ এনজয়েড বাই অস।…আর সেই মুহূর্তে যখন আপনি একটা বিশেষ সময়ের কতকগুলি জিনিশ ইমপ্লাই করলেন—বিরাট কোনো বক্তব্য নয়—একটা বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করলেন—পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরির একটা সময়ের বাংলা দেশের বা ভারতবর্ষের একটা কনটেক্সটে, তখন ইউনি-ভার্সেলিটিটা একটু

স. পোস্ট নাইনটিন্থ সেনচুরি কী ক'রে বলছেন জানি না—সাহেব সকলেই তো এইটিন্থ সেনচুরির

ক. মানে পোস্ট এইটিন্থ সেনচুরির

স. হ্যাঁ, এখন, আমার মনে হয়েছিলো যে ভূত—আবার ঐ প্রশ্নটা আসে —গল্পে আছে ভূতেরা এসে নাচলো—সেটাকে যে কনক্রিটাইজ করতে হবে—এখন ভূতেদের এ-রকম কনভেনশন আছে যে…ভূতের কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, কিসের মতো পিঠ যেন আছে না? এখন সেটা আমার কাছে—সেটা খুব বেশিক্ষণ টানা যাবে ব'লে আমার মনে হয় নি। কেননা তাদের নাচের কোনো কনভেশন আছে ব'লে আমি জানি না। একরকম ভূতের নৃত্য হয় সেটা নিয়ে খুব একটা আর্টিস্টিক কিছু করা যাবে ব'লে আমার মনে হয় নি। তখন আমি ভূতটা নিয়ে অন্যরকমভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম। আমি বললাম যে যারা মরেছে অ্যাকচুয়ালি, তাদের যদি ভূত হয়—অ্যাক-

চুয়ালি কতকগুলি ক্লাস অব পিপ্‌ল যারা অবভিয়াসলি বাংলা দেশে ছিলো—রাজা-রাজড়া তো ছিলোই একেবারে বৌদ্ধ আমল থেকে এবং তারপর চাষা-ভূষোও ছিলো—আর সাহেবরা তো প্রচুর আছে—বীরভূমে যেখানে আমরা শুটিং করেছিলাম তার মাইল দশেকের মধ্যেই কবরখানা এবং তারা বহু মরেছে অল্প বয়েসে আর কী—এবং আরেকটা জস্ট ফর এ ভিজুয়াল কন্‌ট্রাস্ট যদি একটা মোটাদের দল করা যায়। সেখানে কারা-কারা থাকবেন? না, এ-রকম ওয়েল-ফেড পিপ্‌ল—বানিয়া-টানিয়া, ফলারের বামুন-টামুন হ'লো, কিছু পাদ্রি—এ-রকম নিয়ে একটা যদি গ্রুপ করা যায়। তখন চারটে ক্লাসে পরিণত হ'লো জিনিশটা—একটা হচ্ছে রাজাদের, একটা হচ্ছে চাষাদের, একটা হচ্ছে সাহেব-দের, একটা হচ্ছে মোটাদের মানে হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিদের ভূত। চারটে যখন হ'লো, তখন ইমিডিয়েটলি আমার একটা ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক্যাল ফর্মের কথা মনে হ'লো যেটা আমি বার দুই শুনেছি এমনিতে—রেডিওতেও শুনেছি। চাক্ষুষ দেখেছি যখন দিল্লিতে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, তখন ডেলিগটদের জন্য একটা পারফর্ম্যান্স দিয়েছিলো—কর্ণাটিক, সাউথ ইণ্ডিয়ান পারকাশন ইনস্ট্রুমেণ্ট 'চাল-বাদ্যকাচেরি' বলে একে—চার রকম পারকাশন—মৃদঙ্গ, ঘট্টম মানে হাঁড়ি, খঞ্জিরা আর মুড়শৃং, মানে একটা ছোটো যন্ত্র মেঁয়াও-মেঁয়াও ক'রে বাজে। এই চারটে নিয়ে অসাধারণ একটা জিনিশ ওরা করে, যেটা পৃথিবীর কোনো মিউজিকে আছে ব'লে আমার মনে হয় না—একেবারে ইউনিক। শুধু পারকাশন নিয়ে গান ছাড়া এ-রকম কোয়ার্টেট আর নেই। তখন আমি ভাবলাম, এই চারটে শ্রেণীর ভূতকে এই চারটে যন্ত্রের সঙ্গে যদি আইডেণ্টিফাই করা যায়। মৃদঙ্গ হ'লো রাজার, যেহেতু মৃদঙ্গটা রীয়্যালি ক্লাসিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্ট। তাই নাচের ফর্মটা একেবারে ক্ল্যাসিক্যাল রাখা হ'লো। খঞ্জিরা হ'লো চাষাভুষোর—একেবারে চাষা-ভুষো এবং তাদের একটু সেমি-ফোক ধরনের করা হ'লো। সাহেবদের জন্য ঘট্টম রাখা হ'লো, একটু কটকটে আওয়াজ—একটু রিজিড আওয়াজ। সেইজন্য সাহেবদের অণ্ডার-ক্র্যাঙ্ক করে তোলা হ'লো, অর্থাৎ সিক্সটিন ফ্রেম্‌সে তোলা হ'লো যাতে সমস্ত জিনিশটা একটু উডেন অ্যাণ্ড মেকানিক্যাল হ'য়ে যায়। আর মোটাদের জন্য ঐ মুড়শৃং রাখা হ'লো যেটা একটা ফোক ইনস্ট্রুমেণ্ট একেবারে। সে অদ্ভুত—লাস্ট যেটা মোটাদের ভূত—টোয়াং টোয়াং—এ-রকম ধরনের জিনিশ—পারকাশন যন্ত্র—দাঁতে চিপে বাজায়। আচ্ছা, এই ক'রে তার-পর ঠিক হ'লো তাদের ফর্মটা কী হবে। তাদের ফর্মটা হচ্ছে ধীরে ঢিমে থেকে আরম্ভ ক'রে, চারটে যন্ত্রই সে-ঢিমে লয়ে বাজলো, আস্তে-আস্তে তারপর মধ্য লয়ে বাজলো—এই করতে-করতে তারা পাঁচটা মুভমেণ্টে লয় বাড়িয়ে একেবারে জলদে পৌঁছে যাবে। তারপর ঠিক হ'লো এই যে পাঁচটা মুভমেণ্টের মধ্য দিয়ে এরা যাবে—এরা করবেটা কী? মানে মুভমেণ্টটা বাড়ছে কেন? কেন লয়টা

বাড়বে ?···তখন ঠিক হ'লো যে এরা [ভূতেরা] আস্থক, এরা নাচুক, এদের দ্বন্দ্ব লাগুক, পরে ভীষণ যুদ্ধ হ'য়ে ম'রে যাক। অটোমেটিক্যালি একটা ফ্রেনজিতে চ'লে যাচ্ছে জিনিশটা—এই গপ্পো তৈরি হ'য়ে গেলো আমার। ফাইন্যালি আমার মনে হ'লো একটা কোডা মতো দরকার, যেটাতে দে মস্ট অল বি ইন হারমনি উইথ ইচ আদার—কেননা ভূতেদের ইণ্টারন্যাল দ্বন্দ্ব ব'লে তো কিছু থাকতে পারে না, একটা অবস্থা আসবে যখন, তখন মিলনটা সহজেই [ঘটবে], যেটা মানুষের মধ্যে কিছুতেই সহজে হচ্ছে না—সেটা ভূতেদের মধ্যে একটা গানের মধ্য দিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে। এই ভাবে পুরো জিনিশটা এমার্জ করলো।

ক. এই সিকোয়েন্সটা [প্রসঙ্গে] আমাদের মনে হয়েছে যে ইউ হ্যাড কভারড নিউ টেরিটরি···চারটে সারিতে ভূতেরা নাচছে···একদিকে শাদা-কালোর ব্যাপার—দ্বিতীয় দিকে চারটে সারিতে তারা নাচছে, তৃতীয় বলা যায় যখন জ্বলছে-নিবছে আলো···ভূতের রাজার চোখ দুটো এবং গলার শব্দ।

স. আমি নিজে বলতে পারি আমি কোনো ছবিতে কখনো নিজে এ-জিনিশ দেখি নি। কমপ্লীটলি আমার নিজের মাথা থেকে বের করতে হয়েছে।···আমার একটা ভীষণভাবে, প্রচণ্ডভাবে ইচ্ছে এবং চেষ্টা ছিলো একটা নতুন কিছু করবো—কেননা ভূতের ব্যাপারটা ওদের দেশে নেই। ভূত বলতে আমরা যে-জিনিশটা বুঝি, ইন ফ্যাক্ট গোস্ট আর ভূত এক জিনিস নয় কিন্তু। স্পিরিট্স—কোনোটাই না।···[তার ওপর] ভূতের রাজা তো হয়ই না ওদের। কাজেই আই কুড নট ফল ব্যাক অন প্রিসিডেণ্টস—কোনো মডেল বা কিছু [ছিলো না]—মানে একেবারে নতুন জিনিশ এবং তারপর যেমন-যেমন মাথায় এসেছে সেগুলি একজিকিউট করতে যা-যা টেকনিক্যাল ইনজেনুয়িটি দরকার সেটা খাটাতে হয়েছে। অনেক সময় প্রত্যেকটির কোনো প্রিসিডেণ্ট নেই ব'লে ভেবে বার করতে হয়েছে—যেমন চার সারির ভূত—আমি কথার কথা বলছি—চার সারির ভূত যদি সত্যি ক'রে মানুষকে সাজাতে হ'তো, তাহ'লে আমার একটা তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু শটের দরকার হতো—যে-রকম ফ্লোর এখানে নেই, ওদের দেশে হয়তো আছে। অর্থাৎ আমাকে করতে হয়েছে—একবার দু-সারির ফোটোগ্রাফ নিতে হয়েছে—ওপরটাকে মাস্ক ক'রে নিয়েছি। তারপর ক্যামেরার ফিল্মটাকে রিভার্স ক'রে নিয়ে তলাটাকে মাস্ক ক'রে আবার দু-সারির—ঐ একই পজিশনে ওরা দাঁড়িয়ে নাচছে, কিন্তু ঐ টপ হাফ অব দ্য ফ্রেম—ওদের অকুপাই ক'রে আবার প্রিসাইজ মোমেণ্ট ইন দ্য মিউজিকে আবার জুম ব্যাক ক'রে যেতে হয়েছে। দু-বার—সেটা আমি নিজে গান-বাজনা করি, জানি, অনেকটা বুঝি ব'লে এবং নিজে ক্যামেরা অপারেট করি ব'লে [সম্ভব হয়েছে।]···একটা মিউজিকের একটা জায়গায় দেখবেন শটটা—প্রথমে ক্লোজ আপ যেতে আছে—

তারপর বাঁই-বাঁই ক'রে পিছিয়ে দেখা যায় যে চার সারির ভূত দাঁড়িয়ে আছে—এখন সেখানে মজা হচ্ছে যে আমি যখন পিছিয়ে এসেছি - দু-বার, দু-বারই তো পেছোতে হয়েছে আমাকে—দু-বারই ক্লোজ আপ থেকে আরম্ভ করতে হয়েছে আমাকে—দু-বারই পিছোতে হয়েছে। পিছোনোটা পরে যখন সুপারইম্পোজ করেছি সেটা ঠিক অ্যাবসোলিউটলি কোয়েনসাইড না-করলে একটা বিশ্রী কনফিউশন হ'তো – একটা আগে পিছিয়ে যেতো, একটা পরে পিছোতো। এখন, সে-মিউজিকের মাত্রা গুনে-গুনে একটা বিশেষ জায়গায় এসে জুমটাকে পৌঁছোতে হয়েছে।

ক. হ্যাণ্ড-হেল্ড ক্যামেরা তো?

স. হ্যাণ্ড-হেল্ড নয়। ক্যামেরা ক্রেনে ছিলো—তবে জুমটা তো হাতে অপারেট করে। জুম লেন্স-এর একটা রড থাকে। সেটা ঘোরাতে হয় আর কি! যা-ই হোক সেটা তো এভাবে হ'লো।

ক. আর ভূতের রাজার যে-বর দেওয়ার সিকোয়েন্সটা?

স. রাজার ব্যাপারটা অ্যাবসোলিউটলি স্ট্রেট – এক্সট্রীমলি সিম্পল ডিভাইস ইউজ করা হয়েছে - কিন্তু এতোরকম সিমপ্লিসিটি আছে যে সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে যে একটা দারুণ কমপ্লেক্স।...এক হচ্ছে ভূতের রাজার মুখের ওপর চকমক করছে অদ্ভুত আলোর মতো—সেটা কিছুই নয়, সেটা চুমকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাগিয়ে একটা সফ্ট লাইট সামনে রাখা হয়েছিলো। মুখটা নাড়লে ওগুলো চকমক করে, এবং ক্যামেরার লেন্সের সামনে একটা গজ দেওয়া হয়েছিলো ডিফিউশন গোছের—যাতে চকমকিটা আরেকটু হাইটেন্ড হয়। তারপর দুটো দাঁত, দুটো শোলার টুকরো আর ভুরুটাকে একেবারে শাদা ক'রে দেওয়া হয়েছিলো। সর্বাঙ্গে কালো রঙ মাখানো হয়েছিলো। তার ওপর মোটা সাদা পৈতে। ব্রহ্মদৈত্য আর কি!

ক. আচ্ছা ঐ ট্রিক শটগুলির কথা...যে রকম হাতে তালি দেবার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা চ'লে গেলো – চোঁ ক'রে একটা শব্দ হ'লো

স. শব্দ...আমি বলছি—প্রিসাইসলি কী-কী এলিমেণ্ট ওতে গেছে। যেই তালি দিলো তখখুনি একটা শট—মোমেণ্টারি একটা শট মাটি থেকে তড়াক ক'রে আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। ছোট্টো একটা শট আছে। সেটা কিছুই নয় - একটা মাচা করা হয়েছিলো—ক্যামেরাটা মাচার তলায় ছিলো—ওরা ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছে।

ক. সেটা রিভার্সে করা হয়েছে?

স. হ্যাঁ। রিভার্স ক্যামেরায় তোলা হয়েছে। কাজেই দ্য বিগিনিং অব দ্য এসেণ্ট আপনি পাবেন—তারপর একটা অপটিক্যাল এফেক্ট আছে, যেটা কিছুই নয়—একটা ডার্ক স্টুডিও ফ্লোরের মধ্যে একটা লাইট রাখা হয়েছিলো।

একদিকে জুমটা এগিয়ে নিয়ে গেছি, পিছিয়ে নিয়ে গেছি। ঐ স্ট্রীপ অফ ফিল্মটা জুড়ে দেওয়া আছে। ফলে একটা এফেক্ট হচ্ছে যে আমি কোথায় চ'লে গেলাম, আবার কোথায় নেবে গেলাম। কিছুই না—একটা হোয়াইট স্পট ছোট্টো হ'য়ে গেলো, তারপর বড়ো হ'য়ে গেলো। আর আওয়াজটা তো উড়ন তুবড়ি [থেকে] পাওয়া যায়—আজকাল যে রকেট 'উশ' ক'রে যায়—সেটা রেকর্ড ক'রে নিয়ে একবার সোজা লাগানো হয়েছে, একবার সাউণ্ডটাকে উল্টে লাগানো হয়েছে। আর…অবশ্য বরফ-টরফে কোনো ফাঁকি নেই। অ্যাকচুয়ালি ছ-ফুট ডীপ স্নো-তে গিয়ে তোলা হয়েছিলো।

ক· কোথায় গিয়েছিলেন?

স· কুফরি—সিমলায়, যেখানে স্কীইং করতে যায়। তা সেই সেখানে তাদের (গুপী আর বাঘাকে) [নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো] নাইলনের মোজা পরিয়ে, কিন্তু জামা ছিলো ঐ গ্রামের জামা—ভেতরে বোধহয় একটা গরম জামা প'রে নিয়েছিলো। এত্তো স্পোর্টিং ছেলে দুটো না! তার মধ্যে লুটোপাটি গড়াগড়ি কত কী!…তার পরেই ভুল ক'রে দ্বিতীয় জায়গায় যেটা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা রন্। রন্ কাকে বলে জানেন তো? সেই কচ্ছের রন্। জয়সলমির থেকেও পঁয়তাল্লিশ মাইল ইণ্টেরিয়রে একেবারে টোট্যালি ফ্ল্যাট ডেজার্ট—টোট্যালি ফ্ল্যাট মানে…স্যাণ্ডটা ব'সে গেছে। জমা স্যাণ্ড, ওগুলোকেই রন্ বলে। এখানে একটা প্রায় একশো আশি ডিগ্রি ব্যাপি মিরাজ ছিলো—মরীচিকা। আমি এ-রকম মরীচিকা জীবনে দেখি নি। ঠিক মনে হচ্ছিলো একটা, মানে, একটা লিমিটলেস ওশেন প'ড়ে আছে।…এবং ওখানে পালে-পালে হরিণ জল খেতে গিয়ে মরে। আমি তো প্রথমে দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম—প্রথম যখন আগে একটা গাড়ি চ'লে গেলো, আমি দেখছি দূর থেকে ওরা ওই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ইলিউশন হচ্ছে। যতো কাছে যাচ্ছি, ততো দেখছি জলটা রিসীড ক'রে যাচ্ছে। তারপর গিয়ে দেখলাম, না, বালি। ফ্যানটাস্টিক। সেখানে ঐ সেকেণ্ড ডিসেণ্টটা—ভুলটা…ঘুণ্ডির যেটা হ'লো। কাজেই দুটি ক'রে শটের জন্য আমাকে একবার সিমলাতে যেতে হয়েছে—জাস্ট ফর টু শট্‌স দেয়ার।…

ক. ক্যামেল প্লেটুন-এর কথা কিছু বলুন।

স. ক্যামেল প্লেটুন—তিনদিনের জন্য তিনশো ক্যামেল আমরা অ্যাফোর্ড করতে পেরেছিলাম। এবং তার মধ্যে আমাদের কাজ হ'তো। ক্যামেলের দল আসতো, দূর থেকে আসতো। দশটা নাগাদ এসে পৌছাতো। ঐ রোদে তো কাজ করা যায় না গরমে—টপ সন যাকে বলে, ভীষণ খারাপ। দুটোর থেকে ওরা রেডি হ'তে আরম্ভ করতো, প্রত্যেকটি কস্টিউম—তিনশো লোকের অনেককে দাড়ি, সকলকেই পাগড়ি, জুতো এবং অস্ত্রশস্ত্র। এই সব ক'রে ওরা রেডি হ'তো অ্যাবাউট চারটে নাগাদ। চারটে থেকে সাড়ে ছ-টা পর্যন্ত আমরা

তিনদিন শুটিং করেছি···ফর দ্যাট এণ্টায়ার ক্যামেল সিকোয়েন্স ইনক্লুডিং গুপীর ঐ গান। বুঝতে পারছেন—মানে, সে কী বলবো—এরকম স্পীডি শুটিং কেউ কোনোদিন করেছেন কিনা জানি না। তবে উই হ্যাড দি অ্যাডভানটেজ অফ থ্রি ক্যামেরাজও। অবশ্য থ্রি ক্যামেরাজও সবসময়ে চালাই নি—কেননা আমি তো শুধু একটাতেই থাকতে পারবো। আমি কোনোদিন ভরসা পাই না অন্যদের ক্যামেরায়, কী আসছে না আসছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য মাত্র একটা সীনে একটা শটের জন্য তিনটে ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। অদারওয়াইজ একটা ক্যামেরাতেই কাজ করেছি। এবং আমার যদি এক হাজার ক্যামেল [থাকতো] একা সাত দিন সময় পেতাম অনেক ভালো হ'তো ছবিটা। একটা রীয়েল, একটা ম্যাসিভ ফরওয়ার্ড মুভমেণ্ট—এটা ভীষণ মিস করি আমি নিজে···

ক· ডেনসিটি যেটা তিনশো ক্যামেলে আসতে পারে, হাজার ক্যামেলে কি তার চেয়ে বেশি আসতে পারে ?

স· হ্যাঁ, ডাইমেনশনটা বেশি হ'লে ক্যামেরাটা আমি হাইটে তুলতে পারতাম। এখানে আমি সেটা অ্যাভয়েড করেছিলাম। কাছেই একটা উঁচু কনভিনিয়েণ্ট পাহাড় ছিলো। আমি ইচ্ছে করলে সেখানে ক্যামেরাটা রাখতে পারতাম, কিন্তু এ ভাস্ট ল্যাণ্ডস্কেপে তিনশো মানে কিছুই নয়। আমার মনে হয় হাজার ক্যামেল হ'লেও কিছু হ'তো না ; কিন্তু এর চেয়ে তবু বেশি হ'তো। ···আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তাতে আমার এখন মনে হয় দশ হাজার মতো লোক হ'লে বেশ একটা ভালো ম্যাস দেখানো যেতে পারে। তবে এখানে আমার একটা ডায়লোগ—সেটা আমি লাস্ট মোমেণ্টে কেন বাদ দিলাম জানি না। আমার ইচ্ছে ছিলো, মন্ত্রীকে যখন সেনাপতি এসে বলছে, 'সৈন্যরা কথা শুনলে না', তখন যদি ব'লে দিতো, 'আর কেউ আসে নি, মাত্র দুশো-তিনশো লোক। আর কেউ আসেই নি, তা যুদ্ধ করবে !' এটা ব'লে দিলেই হ'য়ে যেতো। ওটা ওরিজিন্যাল ডায়ালোগে ছিলো না। পরে আমি অ্যাড করেছিলাম, কিন্তু অ্যাট দি টাইম অব শুটিং সামহাউ—এ শুটিংটা কলকাতায় হয়েছে—তখন আর এ জিনিশটা মাথায় নেই, মনে ছিলো না।

ক· এই যে বলছিলেন যে তিনটে ক্যামেরা একসঙ্গে চালাতে পারতেন ইচ্ছে হ'লে—এক সঙ্গে চালানো মানে কী ?

স. একসঙ্গে চালানো মানে একটাতে লং শট নিচ্ছি, একটাতে ক্লোজ আপ নিচ্ছি, একটাতে মিড শট নিচ্ছি।···'শুণ্ডি চলো' [ব'লে] আমি যেই মার্চ করতে আরম্ভ করলো—তখন ন্যাচারালি নর্মাল মেথড অব শুটিং ইজ আমি ক্যামেলের ডিটেল দেখাচ্ছি, লং শট থেকে দেখাচ্ছি, পায়ের তলা থেকে দেখাচ্ছি। তার মানে কী ? একটা ক্যামেরা থাকলে বার বার তো সেটা করতে হবে। আবার পিছিয়ে আনতে হবে।···

২

গুরুদাস ভট্টাচার্য

'দর্পণ' সাপ্তাহিক পত্রিকার ৯. ৫. ৬৯ তারিখের সংখ্যায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারটি 'চিত্রভাষ' পত্রিকার ১৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। আমরা কেবল এখানে প্রাসঙ্গিক অংশ পুনর্মুদ্রণ করছি।

—সম্পাদক, এক্ষণ।

[সূত্র : আমি = গুরুদাস ; রায় = সত্যজিৎ]

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' গ্রন্থের প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন সত্যজিৎ রায় ; ছবিরও মলাটে অর্থাৎ আরম্ভে স্কেচ, অক্ষর-লিপিতে শৈশবী প্রচ্ছায়া। মূল গল্পে পাই 'একটা কোমল সার্বজনীন ভাব' (প্রকাশকের ভূমিকা)। শ্রী রায় তাকে পরিবর্ধিত প্রসারিত করেছেন নানাভাবে। কেন ? কাহিনীকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য ?

রায় : অবশ্যই। কথা-নির্ভর রূপকথাকে নিয়ে আসতে হয়েছে দৃশ্য-নির্ভর ফ্যাণ্টাসিতে। তার জন্যে অদল-বদল অপরিহার্য। উপেন্দ্রকিশোরের কথাবার্তার মধ্যে একটা সহজ আকর্ষণীয় ভঙ্গি আছে, কিন্তু ছবিতে সংঘাত, নাটকীয়তা না আনলে জমবে কেন ? তাই গল্পকে ঘোরাতে হয়েছে।

আমি : ছবিটি যুদ্ধবিরোধী। শুনে মনে পড়ছিল কারেল জেমানের 'এ জেসটার্স টেল'-এর কথা। কিন্তু দেখে মনে হল দু'টো ছবির স্বরলিপি ও স্বাদ আলাদা।

রায় : একই বক্তব্য আমি রাখতে চেয়েছি অন্যভাবে, আমার মতো ক'রে। ভালো রাজার দেশে সুখ শান্তি অথচ বিষাদ ; খারাপ রাজার দেশে অত্যাচার, যুদ্ধোন্মাদনা—খাদ্যাভাব ; অথচ রাজা-উজীররা প্রচুর খাচ্ছে, অযাচিত খাবার পেয়ে সৈন্যরা যুদ্ধ ভুলে যাচ্ছে ; একই শিল্পীকে দিয়ে দুই রাজার ভূমিকাভিনয় ; লড়াই-অনাচার-হিংস্রতার বিরুদ্ধে শিল্পের সংস্কৃতির অভিযান ও চূড়ান্ত জয়—এইভাবে আমি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি।

আমি : চিত্রনাট্য এমনভাবে তৈরি, আপনি যেন ছবি দিয়ে গল্প বলে যাচ্ছেন রূপকথার ভঙ্গিতে। মাঝে-মাঝে জমে উঠছে নাটকীয় মুহূর্ত। শেষ পরিণতিটাও রূপকথার মতো—রাজপুত্র পেল রাজকন্যাকে। কিন্তু—

রায় : বাঘার কনে যাচাইয়ের কথা বলছেন তো ? রূপকথার রাজপুত্র ওভাবে যাচাই করে না। ওটা আধুনিক কালের রীতি। আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছি। লক্ষ করলে দেখতে পাবেন—ছবির আরম্ভে গুপীর কাহিনী হাজির হয়েছে বাস্তব

রীতিতে। ভূতের নাচের পরেই ফ্যান্টাসির জগৎ—

আমি : তারপর বাস্তব এসেছে ফ্যান্টাসিকে সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে—

রায় : হ্যাঁ, তাকেই টেনে নিয়ে গেছি শেষ দৃশ্য পর্যন্ত।

আমি : এই যাচাই—সফিসটিকেশনের ব্যাপারটা দু'বার দেখেও ধরতে পারিনি।···আচ্ছা, চরিত্রও তো বদলে দিয়েছেন। বইয়ে বাঘা ভীতু, গুপী সাহসী; ছবিতে গুপী সরল, বাঘা চতুর।

রায় : গাইয়ে মানুষ একটু আধটু সরল হয় না! তাছাড়া আর্টিস্টের কথা আমার মনে ছিল। দু'জনের মিলিত অভিনয় একঘেয়ে হবে না, জমে উঠবে।

আমি : বৈপরীত্যের এই খাত—রাজা দু'জনের মধ্যেও। একজন সহজ সরল হাসিখুশি মিতবাক্; অন্যজন হিংসুটে কুচক্রী—এই তড়পাচ্ছে, এই মূর্ছা যাচ্ছে, পরক্ষণেই হাবাগোবা বাচ্চা খোকা।

রায় : দু'টো দেশও দু'জাতের। ভালো রাজার ঘরের রং সাদা, আয়তনে নিটোলতা, সোজা-সোজা পথ, স্বচ্ছ স্নিগ্ধ কারুকাজ। খারাপ রাজার ঘরে আলো কম, কালো বেশি, ভারি পাথর, প্যাঁচালো থাম, হরিণের সিং. মোষের মাথা, ভালুকের মুখ, বাঘের ছাল—

আমি : সব মিলিয়ে জটিল, ভয়ংকর হিংস্র। ভালো রাজার পোশাকে মেক-আপেও আপনি দিয়েছেন শুচিশুভ্র পবিত্রতা, আর খারাপ রাজার ইউনিফর্ম, মিলিটারি বেল্ট, কালো ভারি পোশাক—

রায় : ওগুলো তৈরি আপহোলসট্রি মোটরের সীট ঢাকার কাপড় দিয়ে। ওটা একদিন হঠাৎই মনে হল।

অমি : বাগ্‌ভঙ্গিও তো অদ্ভুত—বোবাদেশের মানুষদের সুরেলা ভাবভঙ্গি, বদমাইশ রাজার চিৎকার, ভূতরাজার ছড়া, জাদুকরের ইশারা—প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা তারে বাঁধা; সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের আশ্চর্য মেলা!

রায় : ওটাও পরের। প্রথমে অন্যরকম ভেবেছিলাম। এখানে দেখতে পাবেন, আপনি যাকে বলেছেন বাস্তব ও ফ্যান্টাসির সমন্বয়।

আমি : সেই পরিকল্পনাতেও বোধহয় এর ক্লু রয়েছে।

রায় : হ্যাঁ! শুটিং করেছি দু'ধরনের সেটে। একটা ইণ্ডোরে তৈরি; এটা কল্পনা। আর আউটডোর শুটিং বীরভূম-যোধপুর-যয়শলমির-বুন্দি-কুফরি—এগুলো বাস্তব। কিন্তু যাঁরা দেখেন নি এসব দেশ তাঁদের কাছে কল্পনা মনে হবে না কি?

আমি : অর্থাৎ বাস্তব-ভিত্তিক কল্পনা! যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছেও অপরিচিত মনে হবে—ক্যামেরা এমনভাবে তুলেছে দৃশ্যগুলো।—একটা কথা—ইনডোর সেটের স্থাপত্য দেখে তো কোনো দেশের মনে হয় না, আবার কোনো অরূপ জগতের ডিসটর্টেড অলংকরণও নয়।

রায় : ঠিকই বলেছেন, আমি কোনো বিশেষ স্কুল বা রীতি অনুসরণ করি নি। রাজস্থানী, মোগলাই, পারসিক, চৈনিক, ইয়োরোপীয়—নানান শিল্প থেকে উপকরণ ও কৌশল নিয়ে, তাদের মিলিয়ে-মিশিয়ে ফ্যাণ্টাসির জগৎ তৈরি করতে চেয়েছি।

আমি : সাজ-পোশাকের মধ্যেও তার পরিচয় আছে।

রায় : চার বামনের মধ্যেও। ভারতীয় রূপকথায় ওরা থাকে না। তাছাড়া সায়েন্স ফিকশনের প্রভাবও আছে।

আমি : ভূতরাজার ইলেকট্রিক চালচিত্র? আর সেই তালে ছড়া কাটা?

রায় : অন্যত্রও আছে।

আমি : জাতুকরের মেক-আপটা সবচেয়ে মজার। আচ্ছা, ওর মাথায় ঐ যে শিংএর মতো—লম্বা তু'টো শিং, শেষ প্রান্তে বল—

রায় : ওটা নিয়েছি পিকিং অপেরা থেকে। মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিং তুলতে থাকে, আমার অদ্ভুত লেগেছিল।

আমি : ছবিতে অজস্র ট্রিক শট এবং ল্যাবরেটরির কারুকাজ আছে। ফ্যাণ্টাসির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আমাকে অবাক করেছে ক্যামেরার ব্যবহার, যেন সে যুগের সন্দেশের পাতায় পাতায় ছবি। আপনার ক্যামেরা ব্যবহারের একটা বিশিষ্ট স্টাইল বা ঘরানা আছে, কিন্তু এ-ছবিতে সে ঘরানা ভেঙে ফেলে ক্যামেরা যে কী করেছে আর কী যে করে নি—

রায় : ফ্যাণ্টাসির প্রয়োজনে। শব্দ নিয়েও এক্সপেরিমেণ্ট আছে।

আমি : আমার মনে পড়ছে ভূত রাজার ছড়া বলার কর্কশ ভঙ্গিটা শুনেছি—

রায় : হ্যাঁ, ওটা আমারই কণ্ঠস্বর একটা স্পিডে টেপে তুলেছি, তারপর স্পিড বাড়িয়ে…

আমি : আর ঐ যে ভূতদের মুখ বেঁকে যাচ্ছে, গলে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—

রায় : ওটা বোম্বের একটি ছেলেকে দিয়ে ল্যাবরেটরিতে করিয়েছি।

আমি : উপেন্দ্রকিশোরের ভূত ছিল রূপকথার জীব : চোখগুলো জ্বলছে, যেন আগুনের ভাঁটা, দাঁতগুলো বেরোচ্ছে যেন মুলোর সার। কিন্তু আপনার ছবিতে—

রায় : বদলে দিয়েছি। চেনা ভূত এনে লাভ কি? বাস্তবকে আনা যাক না! ভেবে ভেবে চার জাতের ভূত তৈরি করলাম—রাজা-ভূত, প্রজা-ভূত, বেনে-ভূত আর সাহেব-ভূত। এদের দিয়ে একটি ছোটখাটো নাটকও তোলা হয়েছে।…

—